ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য

ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য ● মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

বলাকা

ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

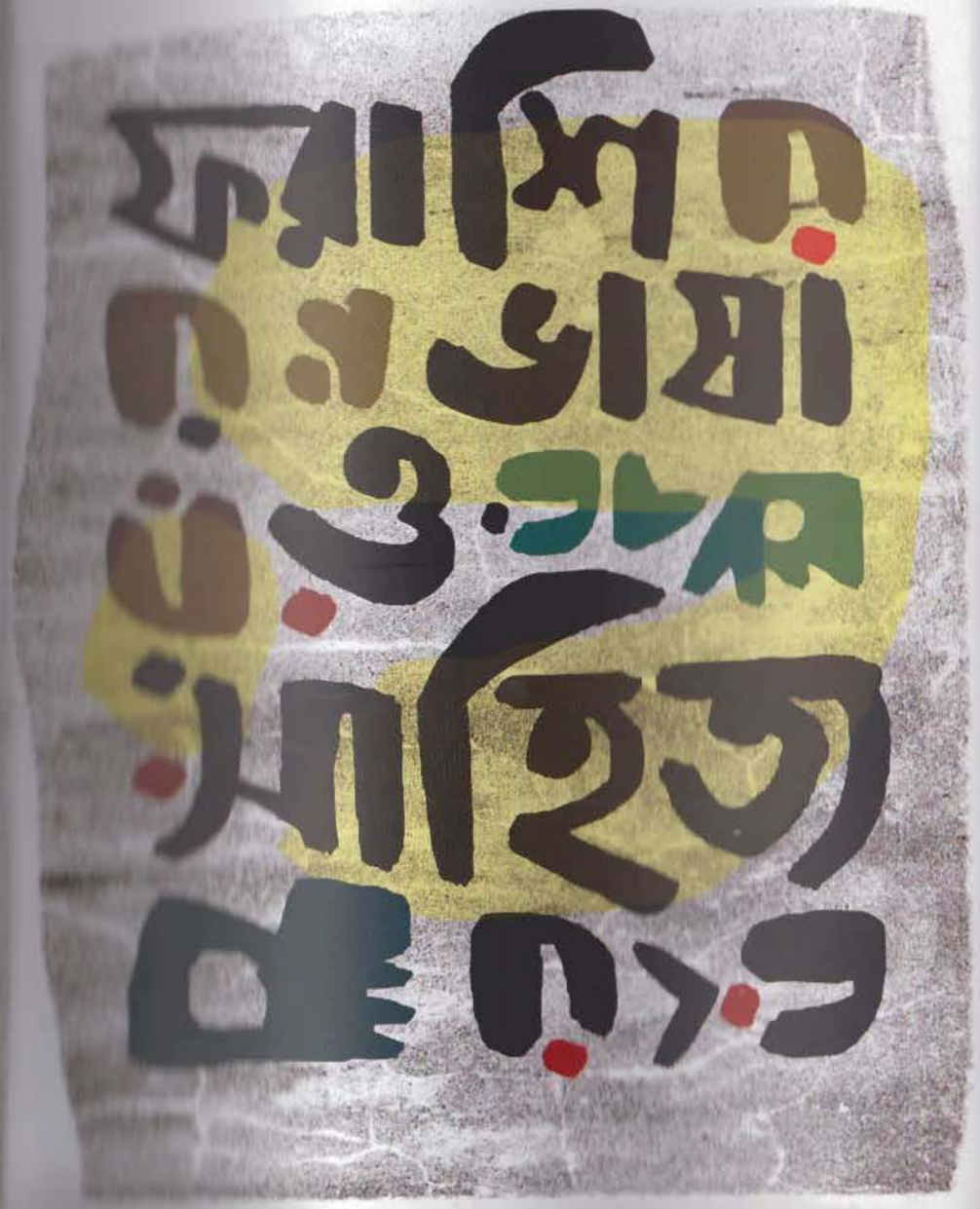

শিল্প-সাহিত্যের তীর্থভূমি ফ্রান্স। আর বিশ্বের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের মিলনমেলা প্যারিস। দিদ্‌রো, ভিক্তর উ্যগো, র‍্যাঁবো, স্যাঁ-জন পের্স, অঁদ্রে মাল্‌রো, আল্‌বের্ কাম্যু, সার্ত্র, সিমন দ্য বোভোয়ার, ক্লোদ্ সিমোঁ, ল্য ক্লেজিও, রম্যাঁ রলাঁ, লুই দ্যুমোঁর মতো কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের হাত ধরে ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য শিখরে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি উচ্চ কূটনৈতিক কারণে ফরাশি ভাষা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মার্কিন প্রভাবেই ফরাশিকে আসতে হয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। তবে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক গুরুত্বের ফলে ফরাশি ভাষার অবস্থান বিশ্বে অতিউচ্চ আসনে। বিশ্বখ্যাতদের হাত ধরেই ফরাশি সাহিত্যের এই স্বর্ণালীযুগ। সেই স্বর্ণালীযুগ উন্মোচন করা হয়েছে 'ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে।

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য

ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

বর্ণাক্ষর

ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য
মাহমুদ শাহ্ কোরেশী
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৮
প্রকাশক
শরীফা বুলবুল
বলাকা প্রকাশন
প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর
স্বত্ব
লেখক

Forashi Bhasha O Sahito by Mahmud Shah Qureshi
Published by Balaka Prokashon in 2018
40, Momin Road, Chittagong - 4000
Concord Emporium Shopping Complex Shop-8, 253-254
Elephant Road, Kantabon, Dhaka 1205. Cell : 01754204449

ওয়েব সাইট : www.balakaprokashon.com

ISBN 978-984-93137-8-6

৩০০ টাকা

উৎসর্গ

১৯৬৮ থেকে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাশি ভাষার কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং অল্পবিস্তর ফরাশি-চর্চায় অগ্রণী আমার স্ত্রী নাসরীন (সৈয়দা কমর জাবীন), বড় ছেলে পূষন্ (নাবিল শাহ্) ও তার দুই ছেলে, বর্তমানে টোরন্টো নিবাসী নুমায়ের ও নুসায়ের, মেয়ে প্রসন্না (নুসরাত কমর) ও তার দুই সন্তান প্রমা ও প্রত্যয়, ছোট ছেলে পার্শ্ব (শাজেল শাহ্) ও তার দুই বিলেতবাসী ছেলে রাদ ও সাদ কে শুভ কামনা।

ম.শ.ক.

মুখবন্ধ

ছোট বড়, নতুন-পুরাতন ছাব্বিশটি প্রবন্ধ নিয়ে এই বই। বিষয় ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তবে মূলত ফরাশি ভাষাকে কেন্দ্র করে লেখা। আমাদের দেশে অনেকেই এর অনুরাগী। তাছাড়া সম্প্রতি ফরাশি পাঠের দিকে ঝোঁক পড়েছে কিছু তরুণ-তরুণীর। এই গ্রন্থ তাদের কাজে আসবে। প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবে।

আমার দীর্ঘদিনের ফরাশি চর্চার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে যেটি অবগত আছেন আমার স্ত্রী নাসরীন। তাঁর বিশেষ উৎসাহে এই গ্রন্থ তৈরি হতে পারলো। তাঁর সঙ্গে অবশ্য আমার সম্পর্ক ধন্যবাদের নয়। বরং বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র আমার প্রকাশক মাদাম শরীফা বুলবুল। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা উপেক্ষা করে তিনি এই ধরণের বই প্রকাশে সৎসাহস প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রকাশনা-ধন্য আমার ছাত্র বঙ্গ রাখাল ওরফে আলী নূর আমাদের যোগাযোগের হেতু।

আল জারিফাহ্ ওভারসীজের মালিক ইয়াসিন মানিক এবং তাঁর নির্দেশে আকাশ, সুমন ও নাঈম বিগত ক'মাস ধরে ফটোকপি ও কম্পিউটার কম্পোজ ইত্যাদিতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী
০২ ডিসেম্বর, ২০১৭

সূচি

ফরাশি ভাষা	৯
ফরাশি-বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ	১৩
রোমান্টিসিজমের ফরাশি ভাষ্য	১৯
দার্শনিক দিদ্‌রো ও তাঁর সাহিত্য কীর্তি	২৫
ভিক্তর উ্যগো : বিশ্ব সাহিত্যের অগ্রদূত	৩৩
বিশ্বসাহিত্যে র‍্যাঁবোর প্রভাব	৩৭
আপলিনের, বিশ শতকের বিশ্বপথিক	৪১
উৎসবের কবি স্যাঁ-জন পের্স	৪৫
রজে কাইওয়া: পাঠযোগ্য পাথর	৫০
স্যাঁতেগ্‌জুপেরি : জীবন ও জগতের রহস্যশিকারি	৫৯
অঁদ্রে মাল্‌রো : সাংহাইয়ে ঝড়	৬৩
আল্‌বের্ কাম্যু- শতবর্ষে স্মরণ ও মূল্যায়ন	৬৯
সার্ত্রকে দেখা সার্ত্রকে শোনা	৮১
সিমন দ্য বোভোয়ার : নারীমুক্তির পথিকৃত	৮৩
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্লোদ্ সিমোঁ ও তাঁর উপন্যাসরীতি	৯৩
ল্য ক্লেজিও : নতুন গন্তব্যের অভিযাত্রী	৯৬
মহিলা কবি আনা দ্য নোয়াই	১০১
রম্যাঁ রলঁ	১০৫
জাক প্রেভের	১০৬
আলজেরীয় কবি ও কথাশিল্পী মোহাম্মেদ দিব	১১৭
এওজেন গিল্‌ভিক	১২০
ফ্রান্সে ইসলাম চর্চা	১২২
ইভোলজির শেষ সেরা পুরোহিত: লুই রনু	১২৭
লুই দ্যুমোঁ : বাংলাদেশের বন্ধু	১৩১
ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি	১৩৮

ফরাশি ভাষা

ফরাশি ভাষার মাহাত্ম্য নিয়ে বহু মূল্যবান উক্তি রয়েছে বড় মাপের ব্যক্তিত্বদের। একবার দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করেছিলাম আমার একটি ইংরেজি রচনায়। এখানে সে দু'টি দিয়ে প্রসঙ্গের আলোকপাত করা যাক। হিস্পানের রাজা চার্লস কুইন্ট (১৫০০-১৫৫৮) একটি বৈশ্বিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী ছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন: 'আমি ইটালিয়ান শিখেছিলাম পোপের সঙ্গে কথা বলার জন্য, হিস্পানী শিখেছিলাম আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে, ইংরেজি শিখেছিলাম আমার চাচীর সঙ্গে কথা বলব বলে, জর্মন শিখেছিলাম আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার কারণে আর ফরাশি শিখেছিলাম আমার নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্য।'

পোপ পল-৬ জাতিসংঘে ফরাশিতে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: 'প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের অনুমোদন কেবল ফরাশি ভাষাতেই মেলে।'

বিশ্বে ক'টা ভাষা চালু রয়েছে, কোন ভাষা কী অবস্থানে রয়েছে সেটি আজ বড় কথা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি উচ্চ কূটনৈতিক কারণে সমগ্র বিশ্বে ফরাশি ছিল সবচে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা- এটা এক সর্বজনবিদিত তথ্য। মূলত মার্কিন প্রভাবে ফরাশিকে সরে আসতে হলো সম্মানজনক দ্বিতীয় স্থানে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে অবস্থানও অটুট থাকবে কিনা বলা যায় না, তবে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের ফলে ফরাশি ভাষা অতি উচ্চ আসনে অবশ্যই আসীন থাকবে। ফরাশি শুধু ফ্রান্সের রাষ্ট্রভাষা নয়, কানাডার অন্যতম সরকারি ভাষা। তাছাড়া বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিশিয়া, মালি, সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো প্রভৃতি ২৫টির বেশি দেশে সরকারি ভাষারূপে চালু এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের বাহনরূপে আন্তর্জাতিক মহলে সমাদৃত ও সক্রিয়। তাছাড়া এককালে ইউরোপের প্রতিটি দেশে বেশির ভাগ শিক্ষিত লোকের দ্বিতীয় ভাষা ছিল ফরাশি। এখন অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সে স্থান দখল করেছে ইংরেজি। এমন কি ফ্রান্সেও। এই ষাটের দশকেও ছিল না এই অবস্থা। তখন ফরাশি নাগরিকদের বেশির ভাগ ইতালীয়, হিস্পানী, জর্মন ইত্যাদির পরই স্থান দিতো ইংরেজিকে। কিন্তু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ক্রমশ পরিস্থিতি বদলে যায়।

আমাদের দেশের অনেক পর্যটকের ধারণা : ফরাশিরা ইংরেজি জানে অথচ বলে না, কারণ তারা 'গর্বিত' জাতি আর ইংরেজিকে ঘৃণা করে। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আসলে ইংরেজি ও ফরাশির বর্ণমালা রোমান এবং একই। কিন্তু উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধি ভিন্ন। অতীতে ফরাশিদের বিদেশি ভাষা শেখার, বিশেষ করে ইংরেজি অধ্যয়নের ব্যাপারে বেশ অনীহা ছিল যা বর্তমানে তিরোহিত হয়েছে। তাছাড়া ভাষার সৌকর্যময় ব্যবহারের ব্যাপারে ফরাশিদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ফরাশি হচ্ছে ইন্দো-য়ুরোপীয় তাতে বাংলার সঙ্গে এর একটা দূরান্বয়ী সম্পর্ক রয়েছে। একই সূত্রে ইংরেজির সঙ্গে রয়েছে ভিন্নতা। এখানে আমরা ফরাশি বর্ণমালাকে প্রথমে উপস্থাপন করি :

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J						
আ	বে	সে	দে	অ	এফ	জে	আশ্
ই	জি						
K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T						
কা	এল	এম	এন	ও	পে	ক্যু	এর্
এস্	তে						
U	V	W	X	Y	Z		
উ্য	ভে	দুব্লভে	ইক্স	ই-গ্রেক	জেদ্		

অল্প কয়েকটি ছাড়া ফরাশি অক্ষর মোটামুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক। বহু যুগ ধরে বহু পরিবর্তনের ফলে ফরাশি উচ্চারণ বিবর্তিত হয়েছে। স্বরধ্বনির জন্য কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক চিহ্ন রয়েছে, যথা é è ê ë ; তাছাড়া রয়েছে নাসিক্য ভবন যেমন France ফ্রঁস্, André Gide অঁদ্রে জিদ্, Romain Rolland রম্যাঁ রলঁ। ইংরেজির অনুকরণে আমরা প্রায় ভুল উচ্চারণ করে থাকি কয়েকটি স্থান নাম যার শুদ্ধরূপ: Paris পারি, Versailles ভের্সাই, Marseilles মারসেই। এখানে সাবধান হতে হবে ফরাশি R উচ্চারণ নিয়ে। এটি উচ্চারিত হয় আলজিহবার সঙ্গে উপর-তালুর সামান্য ঘর্ষণের ফলে। আয়ত্ব করা একটু শক্ত। সহজভাবে অনেকে মনে করেন 'খ'। আসলে তা নয়। চর্চা করে আয়ত্ব করতে হয়। তা না হলে নিজের ভাষার 'র' উচ্চারণ করাই শ্রেয় যা জিহ্বা উপরের তালুর সঙ্গে ঘর্ষণে উৎপন্ন করে। H- এর কোনো ধ্বনি নেই। O তে 'ও' অথবা 'অ' উচ্চারিত হতে পারে। S- এর আগে পরে স্বরধ্বনি থাকলে 'জ' উচ্চারণ অনিবার্য। নচেৎ 'স' এর আওয়াজ বেরুবে। Ch 'শ' হবে যথা Chat 'শা' অর্থ বিড়াল। কিছু শব্দে শেষাংশ

অনুচ্চারিত থাকে। J খুবই নরম 'জ' অনেকটা 'শ' এর মতো। D- 'দে' এবং T 'তে'। তাই ফরাশিরা এখনও 'ঢাকা' কে বলে 'দাক্কা' এবং 'টাকা' কে বলে 'তাকা'। ভাষা ব্যবহারের আরো অনেক ব্যতিক্রম বা বিচিত্র বিধি লক্ষ্যযোগ্য হবে। সেগুলো অনতিক্রমনীয় নয় আদৌ।

সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজকের ফরাশি ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। জনগণের অর্থাৎ প্রাকৃত লাতিন (Popular Latin)- এর সঙ্গে সেল্টিক (Celtic) উপাদান মিশে এই ভাষার আবির্ভাব। একই সঙ্গে ফ্রান্সের অনেক উপভাষাকে ডিঙ্গিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাকাপোক্ত হয়ে বসল আধুনিক ফরাশি ভাষা। রাজসিক কায়দায় মধ্যযুগ থেকে আরবী, ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইতালীয়, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে হিস্পানী এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইংরেজির কিছু প্রভাব ফরাশি গ্রহণ করল, চিন্তাধারায় শক্তভাবে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হল এবং জনগন প্রবুদ্ধ হল প্রকাশভঙ্গীতে সুনির্দিষ্ট এবং সহজভাব এনে ভাষার সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে। উল্লেখ্য যে, সতের শতক থেকেই ফরাশির প্রাধান্য ঘটল পশ্চিমা জগতে - ফ্রান্সের কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও তার ক্লাসিক সাহিত্যস্রষ্টাগণের প্রতিভার স্বীকৃতিতে।

পণ্ডিত রিভারল দুটি প্রবাদসিদ্ধ সদুক্তি করেছেন :

Ce qui n'est pas clair n'est pas français যা পরিষ্কার (অর্থগ্রাহ্য) নয় তা ফরাশি নয়;

Sûre. sociale, raisonnable, ce n'est plus la langue française, c'est la langue humaine.

'নিশ্চিত, সামাজিক, যৌক্তিক এটা আর ফরাশি ভাষা রইল না, এটা হয়ে গেল মানব ভাষা।'

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এক সময়ে ফরাশিরা বিদেশি ভাষা চর্চা খুব বেশি করতো না, এমনকি বিদেশেও খুব বেশি যেত না কেননা তাদের নিজেদের দেশটাই তো অপরূপ ও বৈচিত্রময়! কিছু কিছু শংকর বা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল যারা ইতালী, স্পেন কিংবা জর্মনীর অনুরাগী। তবে বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু হয়েছে। সত্তরের দশকের মধ্য ভাগেই আমরা একটি ফরাশি সরকারি বিবরণীতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ধাপ লক্ষ্য করতে পারি : In the teaching of modern languages, where a literary and theroretical approach once prevailed, the accent has been put on the student actually speaking the tongue. The student can choose a second modern language from the Fourth class onwards (Marc Dandelot and Francoisd Froment- Maurice, *La Documentation Francaise* 1975)

সেজন্য গ্রীষ্মাবকাশে ব্যাপকভাবে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা হয়েছে ছাত্রদের জন্য। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে Language Laboratory ও অন্যান্য আধুনিক উচ্চারণের ব্যবহারও দেখা দিয়েছে

অনিবার্যভাবে।

ফরাশি ভাষার বহু বহু প্রভাব ইংরেজির ওপর বর্তালেও মধ্যযুগ থেকে ইংরেজিরও বেশ কিছু শব্দ ফরাশিতে চলে এসেছে। এই যে একটা অতি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দ 'বাজেট' এটাও ফরাশিতে এসেছে ইংরেজি থেকে। মূল অর্থ 'কোষাধ্যক্ষের থলে' ফরাশি উচ্চারণ 'ব্যুদ্‌জে'। ইংরেজির মাধ্যমে ভারতীয় শব্দ 'কুলি', ভেরান্দাও (বারান্দা) ঢুকে গেছে ফরাশিতে ফার্সি থেকে 'পিজামা' (পায়জামা), আরবী থেকে বেশ কিছু শব্দ 'কালিফ' (খলিফা), 'জুপ' 'গাজেল' 'এলিক্সির', 'জুলেপ', 'সিরপ', 'আলজেবর', 'শিফ্‌র', 'জেনিথ', 'জেরো' প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ফরাশিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকছে।

সবচে' স্মরণীয় যে, এক বিস্ময়কর উন্নতমানের সাহিত্য রয়েছে ফরাশি ভাষায়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ফরাশি গদ্য ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে রাবলে প্রমুখ পার হয়ে মোঁতেইন অবধি রনেসঁস-এর কাল যাবৎ বহু গদ্যশিল্পীর যুগ চলে। তবে দর্শনের জগতে দেকার্তের *দিসকুর দ্য লা মেথদ্* -ই প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তীকালে পাস্‌কাল প্রমুখ অনেকে ফরাশি গদ্যকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য যে, ফরাশি বিপ্লবের কারণে লাতিন প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সহজতর হয়ে পড়ে ফরাশি সাহিত্য ও জনবৈদগ্ধ্যের ভাষা। নাটকের ক্ষেত্রে কর্নেই ও রাসিনের অসামান্য সাফল্য অর্জন ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডি রচনা করে। পরবর্তীতে কমেডির স্রষ্টারূপে এলেন মলিয়ের যিনি আজও বিশ্বব্যাপী অনুকরণীয় রয়ে গেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বছরগুলো অতিবাহিত হয়েছে ব্যাকরণবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখিতে। মোঁতেসকিয় হলেন এ যুগের দর্পণ এবং ভাষার প্রয়োগকে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করালেন ভল্‌তের। জঁ-জাক রুসোর কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। পরবর্তী রোম্যান্টিক পর্বের রাজা হলেন শাতোব্রিয়ঁ। কবি লামারতিন, ইতিহাসবিদ মিশলে প্রমুখও ছিলেন যথার্থ যুগ-প্রতিনিধি। উ্যগো, গোতিয়ে, স্তঁদাল, বালজাক্, ফ্লোবের্, বোদ্‌লের্, মালার্মে, জোলা, দোদে, অঁদ্রে জিদ্, রম্যাঁ রলঁ ও অন্যরা উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে ফরাশি সাহিত্যের বিশ্ব জয় সফল করে তুলল। কিন্তু পরবর্তীতে মার্সেল প্রুস্ত, জর্জ দুয়ামেল, মাদাম কলেৎ, ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক, অঁদ্রে মোরোয়া, জুল রোম্যাঁ, অঁরি বার্বুস্ সেলিন, অঁদ্রে মাল্‌রো, জঁ-পল সার্ত্র, সিমন দ্য বোভোয়ার, আল্‌বের কাম্যু, মিশেল বুতর, ক্লোদ সিমোঁ, আল্যাঁ রব গিয়ে, নাথালি সারোৎ, আপলিনের, এলুয়ার, আরাগোঁ, মার্গারেৎ দ্যুরাস প্রমুখ ফরাশি ভাষার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত।

উনিশ শতক থেকে বাঙালিদের মধ্যে তরু দত্ত, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী, অরুণ মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কিছু অবদান রেখে গেছেন, এটাও কম কথা নয়।

ফরাশি-বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ

বিদেশি ভাষা শেখা ও শেখানোর দুটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে অভিধান ও ব্যাকরণ। আজকাল অবশ্য পৃথিবীর সব উন্নত দেশে ভাষাপ্রবেশক পাঠ্যপুস্তকের ছড়াছড়ি দেখা যায়। মানবিক কৌতূহল থেকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান জাহিরের অভিলাষে এগুলো তৈরি হচ্ছে। যে-বই কয়েক বছর খুব বেশি চললো তাদের শিক্ষক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা মিলে ঠিক করেন যে- না, এটা আর চলতে পারে না; বড্ড সেকেলে। শুরু হলো নতুন প্রয়াস, নতুন বই। এগুলো আর যাই হোক খুবই চমকপ্রদ! বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভিন্ন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশি সাহায্যে বা এককভাবে দেশি বিশেষজ্ঞরা বই তৈরি করেছেন কিন্তু তাতে ভাষাবিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও সার্বিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। নেওয়া হলে পরিস্থিতি এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে আসতো না। যাহোক, প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলো মূলত ফরাশি- বাংলা অভিযান ও ব্যাকরণের কথা মনে করে। এবং তাও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। সম্প্রতি আমরা একটি প্রথম ফরাশি-বাংলা অভিধানের খোঁজ পেয়েছি। এটি অবশ্য প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো ভাষাচার্য ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন ফরাশি ভাষার শিক্ষক, শিশির ভট্টাচার্য তাঁর অনুসরণে এ বিষয়ে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র মাসিক 'দেল্‌তা'র পনের সংখ্যায় (জুলাই, ১৯৯১) ফরাশি ভাষায় প্রকাশিত।

উপরোক্ত সূত্রে আমরা জানতে পারছি যে, প্রথম ফরাশি-বাংলা অভিধান সংকলিত হয় ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে দুশো দশ বছর আগে। অভিধানটির রচয়িতা ওগ্যুস্ত্যা ওসঁ সে সময়ে চন্দননগরস্থ ফরাশি সরকারের দোভাষী রূপে কাজ করতেন। কোনো অজ্ঞাতকারণে সে বছর কলকাতায় এসে তাঁকে জেল খাটতে হয়। তবে এই জেল খাটা বৃথা যায়নি। জেলে অবস্থানের প্রথম দিন থেকে ছ'মাসের মধ্যে

তিনি ফরাশি-বাংলা অভিধান সমাপ্ত করেন। এটি বর্তমানে প্যারিসের 'বিবলিওথেক্ 'নাসিওনাল্'এর আর্কাইভে সংগৃহীত রয়েছে। সংগ্রহ সংখ্যা ৭৩০; ভারতীয় পাণ্ডুলিপির সংযোজন সংখ্যা ৮৪।

ওসঁ-র হাতে লেখা চারটি অভিধান রয়েছে ফরাশি জাতীয় গ্রন্থাগারটিতে। এগুলো কখনো প্রকাশিত হয়নি। যে প্রথম অভিধানটির কথা বলা হলো তার শব্দ সংখ্যা আনুমানিক বারো হাজার পাঁচশো। বাংলা প্রতিশব্দের সংখ্যা দু তিন গুণ বেশি। ওম্‌সঁ জেলখানায় ঢোকার দিন অর্থাৎ ১০ মার্চ ১৭৮১ কাজ শুরু করে সমাপ্ত করেছিলেন সে বছরের ৩১ শে আগস্ট। দু বছর পর তিনি অভিধানটি সংশোধন করে বাংলা কাগজে কপি করেন। উল্লেখ্য যে বাংলা শব্দগুলো রোমান হরফেই লেখা হয়েছে এবং অভিধানটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৩৬০।

এ ছাড়া ১৭৮২ সালে সংকলিত তাঁর আরকটি কাজ: একই সূত্র থেকে উদ্ভূত ফরাশি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা শব্দের তালিকা। এটি মাত্র ১২ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি (একই সংগ্রহে রয়েছে; নম্বর ৭২৭; ভারতীয় পাণ্ডুলিপি শাখার নম্বর ৮১)।

ভারতীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত ফরাশি, ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা ও পর্তুগীজ শব্দের একটি সংকলন গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর তৃতীয় কাজ। ৩,৭০০ কি ৩,৮০০ শব্দ রয়েছে এতে। ইংরেজি কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৬; ১৭৮২ সনে চন্দননগরে (ফরাশিরা যাকে বলেন 'শঁদের নাগর') ওম্‌সঁ এই কাজটি সমাপ্ত করেন।

চতুর্থ কাজটি হলো ফরাশি-বাংলা অভিধান যাতে রয়েছে প্রায় ১১ হাজার শব্দ এবং যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো প্রায় ৩০ হাজার। রোমান অক্ষরে। ইংরেজি কাগজে ১৭৮৩ সনে লিখিত এই অভিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪ পৃষ্ঠা। এটি সম্ভবত প্রথমটির সংশোধিত সংকলন।

১৯৬২ সনে পেনসিলভানিয়াতে এ্যামেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার গ্রন্থাগারে সম্ভবত ১৮৪২ সনে রচিত ইংরেজি- ফরাশি-বাংলা ত্রিভাষিক অভিধানের সন্ধান পেয়েছিলাম। এবছর চট্টগ্রামে প্রথম ফরাশি-বাংলা অভিধান তৈরি হচ্ছে। ফরাশি ভাষাবিজ্ঞানী গগেনেমের ফান্ডামেন্টাল (মৌলিক) অভিধানের ভিত্তিতে এটি তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের শিক্ষক গুরুপদ চক্রবর্তী। আমি এর ব্যাপক সংশোধন- সংযোজন করে দিয়েছি। বর্তমানে তা মুদ্রণের মধ্য-পর্যায়ে। ফরাশি বর্ণমালার কিছু চিহ্ন, আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক অক্ষর ব্যবহার এই অভিধান ছাপার কাজে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই অভিধান প্রকাশিত হলে একটি বড় কাজ সম্পন্ন হবে। এবং এরপর 'বাংলা-ফরাশি অভিধান' প্রস্তুত হলে ও প্রকাশ লাভ করলে আমরা বাংলাভাষীদের ফরাশি শেখানোর এবং ফরাশিদের বাংলা পড়ানোর প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করতে পারবো। দু'শো দশ বছর আগে যা শুরু হয়েছিলো তার সঙ্গত পরিণতি ঘটবে।

অভিধানের পর আসে ব্যাকরণের কথা। চন্দননগর বা অন্যত্র ফরাশিদের জন্য বাংলা ব্যাকরণ এবং একটি ছাড়া বাঙালিদের জন্য ফরাশি ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস

হয়েছে কিনা তা আমার জানা নাই। তবে ষাটের দশকে জিল্ ফিলিবের ও আমি যখন প্যারিসে প্রাচ্যভাষার স্কুলে, যা ছিলো E.N.L.O.V এবং যা পরে হলো I.N.L.O.V এবং বর্তমানে INALCO (Institut National des Langues orientales). বাংলা পড়াতাম তখন ফরাশি সাহেব ইংরেজ সাহেব সাটন পেজ-এর অনুকরণে বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা দাঁড় করানোর প্রয়াস পাচ্ছিলেন বলে জানতাম। পরে সেদেশে এ বিষয়ে কিছু হয়েছে কিনা জানি না। তবে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত বাংলায় রচিত একটি ফরাশি ভাষার ব্যাকরণ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। বইটির শিরোনাম একটু দীর্ঘ, ABREGE DE LA GRAMMAIRE FRANCAISE EN BENGAL AL'USAGE DE L'ECOLE GRATUITE DE CHANDERNAGOR। চন্দননগরীয় দাতব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহার ফরাসিস ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত। Calcutta: Imprimerie de P.S d'ROZARIO ET CIE (পিএসডি রোজারিও অ্যান্ড কোম্পানির প্রেস) ১৮৭১; গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে 'বিজ্ঞাপন' তথা ভূমিকা লেখকরূপে আমরা বার্থের নাম পাই। কিন্তু তিনিই প্রকৃত লেখক কিনা বোঝার উপায় নেই। কেননা 'বিজ্ঞাপনে'র ৫ম পঙক্তিতে লেখা রয়েছে নোয়েল ও যাপচশাল সাহেবের 'ফরাসিস সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ হতে সরল বঙ্গভাষায় পুস্তকটি সংকলিত। এতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন চন্দননগরের নন্দলাল বসু।

'বিজ্ঞাপনের' শেষ পঙক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে মহাত্মা ফেনেলন সাহেবের ফরাসিস ভাষায় সুললিত ও মনোহর রচনার প্রচারের কথা। তাহলে এই ফেনেলন-ই (হয়তো ফেনেলোঁ'-ই হবে যথার্থ উচ্চারণ) কি ব্যাকরণটির আসল রচয়িতা? বার্থে (আসলে হয়তো বের্থ) তাহলে কি প্রকাশক বা ভূমিকালেখক? বিষয়টির সুস্পষ্ট নিষ্পত্তি না হলেও ১২০ বছর আগের রচনা ব্যাকরণটি যথেষ্ট সুপাঠ্য ও প্রাঞ্জল। সময়ের ছাপ অবশ্যই আছে শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয়। ফরাশি উদাহরণের ক্ষেত্রেও। ১২ পৃষ্ঠা থেকে একটি নমুনা দেওয়া গেল নিচে:

Une fille sensible, modeste et obeissante sera une bonne mere et une épouse vertueuse এক অনভিমানিনী ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী বালিকা হইবে এক গুণবতী স্ত্রী ও ধার্ম্মিকা মাতা।

এতদসত্ত্বেও বৈয়াকরণিক অনেক জটিল বিষয় সরলভাবেই উপস্থাপন করেছেন যা এখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েরই কাজে আসতে পারে। কাল সম্পর্কে একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি:

বাঙ্গালা ভাষায় তিন কালের অধিক নাই, কিন্তু ফরাসি ভাষায় অতীত কাল পাঁচ প্রকারে ও ভবিষ্যৎকাল দুই প্রকারে লেখা যায়; এজন্য অনেক কাল ফরাসি ভাষায় আছে যাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হয় না; ফরাশি ভাষা পাঠ করিয়া ছাত্রেরা সকল কালের ভিন্নতা জানিতে পারিবেন। (পৃ ৩৩)।

এখানে লক্ষণীয় ফরাশি ভাষা 'ফরাসিস' নয় 'ফরাসি' হয়ে গেছে। ব্যাকরণটির একটি প্রতীক বৈশিষ্ট্য হলো সম্প্রতিকালের ভাষাবিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ব্যাকরণ সম্পর্কীয় যেসব অধ্যায় বা অংশ রয়েছে তাতে অনেক জটিল বিষয় বা মজার মজার শব্দ ও বাক্যাংশ পাওয়া যাবে না যা এগ্রন্থে মিলবে। অবশ্য এটা হয়তো পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন গ্রন্থাদিরই বৈশিষ্ট্য। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: 'সৃকার তৃতীয় পুরুষে সম্মানার্থ তিনি করেন' ইত্যাদির ব্যবহার করলেও দ্বিতীয় পুরুষে ব্যাপকভাবে তুই, তুমি, লিখেছেন (সূত্র ৮৩, ৯৪) Vous- র অনুবাদে 'আপনি, আপনারা' দেখা গেল না। একেবারে শেষদিকে এসে ৯১ পৃষ্ঠার ৩১২ সূত্রে একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে 'আপনি' দেখা গেল; যথা :

Madame, êtes vous la mére de cet enfant?

Je la Suis ঠাকুরাণী আপনি কি এই শিশুর মাতা? আমি হই।

বাংলাভাষী বা বাংলাজানা বিদেশিদের মধ্যে কি সেকালে 'আপনি' ব্যবহারে কিছু অনীহা ছিলো? ফরাশি ব্যাকরণটি ১১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সূত্র সংখ্যা ৩৭৮। স্বল্পপরিসরে এতো অধিক এবং এতো জটিল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্যরূপে পরিবেশন করতে খুব কম গ্রন্থেই দেখা যায়। আজকের কোনো ভাষা গবেষণা বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ব্যাকরণটির পুনর্মুদ্রণের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

ফরাসী-বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ

Boire, Sucer — Tchoumouq (চুমুক দিতে), chouchite (শুষিতে)

Bochtom, (বষ্টম) faquir;

Dervice (=দরবেশ) — Boechniob (বৈষ্ণব)

Depence aisee — Goudzerane (গুজরান)

Dejeuner, Gouster — Dzolpane corite (জলপান করিতে), adzeri qhaite (হাজেরি খাইতে)

Parente (আত্মীয়) — Coutoumbei (কুটুম্বী), gouchtie (গুষ্ঠী),

Pourouche (পুরুষ)

Pauvre diabie, Pouvre doriddro — Qhidarto (খিদার্ত্ত=ক্ষুধার্ত্ত), (দরিদ্র), cangal (কাঙাল)

deperi (কাঙাল)

Sans employ, Service — Nichtchenndy (নিশ্চিন্দি)

Trouce, cassee ce (ose) — Tchira (চিরা, ছিড়াঁ),

bhanga bost (ভাঙা বস্ত = বস্ত্র)

Tremblement de terre commpo — Bhouin chal (ভুঁই চাল), bhouin (ভুঁই কম্প)

Tranquille, quiet — Tchoupia (চুপিয়া), chamio (শাম্য),

nibbrode (নিবএব্রোদ = নির্বিরোধ)

Ocaddy (অখাদ্যি), heria (এড়া), mangcho

Viande de boucherie — (কসাইখানার মাংস) (মাংস), gocht (গোস্ত)

Villaine — couroupa (কুরুপা),

Coutchitta bost (কুচ্ছিতা বস্ত = কুৎসিত বস্তু)

বাহুল্যভয়ে আর অধিক দেওয়া গেল না।' শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(ওসঁর ব্যাকরণের সুনীতি চট্টোপাধ্যায় উদ্ধৃত অংশ)

ABREGE

DE LA

GRAMMAIRE FRANÇAISE

EN

B E N G A L I

A L'USAGE DE L'E'COLE GRATUITE

DE

C H A N D E R N A G O R.

চন্দ্রননগরীয় দাতব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ

ফরাসিস্ ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায়

প্রণীত।

CALCUTTA:

IMPRIMERIE DE P.S. D'ROZARIO ET CIE.

1871.

[১৯৬৭ সালে সিল্‌ভেস্ত্রাক নামে বহু ভাষাবিদ এক বয়স্ক পোলিশ ছাত্র আমাকে এই ব্যাকরণটি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে]

বিজ্ঞাপন।

ফরাসিস্ দাতব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যাকরণান্তর্গত কঠিনতা দূরীকরণ ও তদ্দারা ফরাসিস্ ভাষার উন্নতি সাধন এই অভিনব পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। ফরাসিস্ ভাষার ব্যাকরণ বালকদিগের পক্ষে সহজে বোধগম্য হওয়া অতি দুরূহ, অতএব ছাত্রবর্গের সহজে বোধগম্য করণার্থ মহাত্মা নোয়েল ও ষাপ্‌শাল সাহেবের ফরাসিস্ সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ হইতে সরল বঙ্গ ভাষায় এই পুস্তক সংগৃহীত হইল। যে সকল সূত্র অতি সুকঠিন এবং ফরাসিস্ ভাষায় বিশেষ অধিকার না জন্মইলে যাহা বুঝিতে পারা যায় না, এরূপ সূত্র সকল পরিত্যাগ করা হইল, এবং যাহাতে ছাত্রগণেরা কঠিন ও অস্পষ্ট নিয়ম সকল সহজে বুঝিতে পারে তাহাও এই পুস্তকে প্রকটন করা হইল।

এতদ্দেশীয় ফরাসিস্ ভাষা পাঠাভিলাষী জ্ঞানবান্ জনগণের উক্ত বিদ্যোপার্জনে বিশেষ উপকার জন্মে ইহা এই পুস্তকের অপর উদ্দেশ্য। ফরাসিস্ ভাষা এই অসীম ভূ-খণ্ডের প্রায় চতুঃপার্শ্বে ব্যাপ্ত, এবং ইউরোপীয় দেশের প্রায় সকল রাজসম্পর্কীয় বিষয়ে প্রচলিত। পুরাবৃত্ত, সুললিত ছন্দ মনোহর রচনা দ্বারা গদ্য পদ্য সম্বলিত সাহিত্য বিদ্যার প্রধান পুস্তক সকল, ও ন্যায় শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পুস্তক সকল ফরাসিস্ ভাষায় রচিত আছে।

জন সমাজে এই অভিনব পুস্তক প্রেরণ করা কেবল চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বসু মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা বশতঃ। তিনি দৃঢ়তর মনোনিবেশ করিয়া ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া এই অনুবাদে যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন।

আমরা যে সময়ে এই পুস্তক প্রকাশে কৃত সংকল্প হইলাম, সে সময় অতি দুরূহ, দেশের হিত সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। যাহাতে মহাত্মা ফেনেলন সাহেবের ফরাসিস্ ভাষার সুললিত ও মনোহর রচনা এই ধরণীমণ্ডলে প্রচার হয়, এবং যাহাতে ফরাসিস্ ভাষার সুললিত ও মনোহর রচনা এই ধরণীমণ্ডলে প্রচার হয়, এবং যাহাতে ফরাসিস্ দাতব্য বিদ্যালয়ের প্রিয়তম ছাত্রদিগের বিদ্যার উন্নতি হয় এই আমাদিগের নিতান্ত অভিপ্রায়।

১লা সেপটম্বর, ১৯৭১। বার্থে।

রোমান্টিসিজমের ফরাশি ভাষ্য

বাঙলা ভাষায়, বিশেষ করে, বাঙলা কবিতার আলোচনায়, একটি শব্দের ব্যবহার যত্রতত্র দেখা যায় : রোমান্টিসিজম! শব্দটি যেহেতু মূলত ফরাশি, তাই ফরাশি ভাষায় তার অভিধা ও আনুষঙ্গিক তাৎপর্য যেমন জানা দরকার, তেমনি ফরাশি কবিতায় রোমান্টিসিজমের অভিপ্রকাশ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। দুটি কাজই দুরূহ না হলেও জটিল এবং দীর্ঘসূত্রী হতে বাধ্য। উপযুক্ত ফরাশি নবীশ কাব্যরসিক কেউ একদা সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবেন (ফরাশিতে এ প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রন্থাদি রচিত হয়েছে এ খবরটা দিয়ে রাখি জনান্তিকে) এই আশা পোষণ করে, বর্তমানে সংক্ষিপ্তরূপে সংজ্ঞানির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পরিবেশনই নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলায় 'রম্যবাদ' 'দূরায়নী-বাসনা' ইত্যাদি নানা শব্দে ইংরেজি রোমান্টিসিজম বা তদ্ভব 'রোমান্টিকতা'র তর্জমা করবার প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। মূলের যৎসামান্য প্রতিভাস মাত্র এ শব্দগুলোতে পাওয়া যায়। মূল কথাটির ইতিহাসও অবশ্য বিচিত্র, শব্দার্থে'র মতোই রহস্যমন্ডিত। ইংরেজি Romantic 'রোম্যান্টিক' শব্দটি এসেছে প্রাচীন ফরাশি 'roman' 'রোমঁ' থেকে যার অর্থ হচ্ছে : বাস্তব বা অবাস্তব, গদ্য বা পদ্যে লেখা উপাখ্যান বা উপন্যাস যা অবশ্য লাতিন ভাষায় নয়, লাতিন দেশগুলোর কোনো একটিতে প্রচলিত কথ্য ভাষায় লেখা (এর নামও 'রোমঁ', স্ত্রীলিঙ্গে 'রোমান', আধুনিক উচ্চারণে রমঁ, রমান)। 'রোমঁ'-র আরেকটি অর্থ হল, অবিশ্বাস্য অভিযান বা এডভেঞ্চার।

ঘ. সাধারণভাবে, রোমঁতিকতায় অনুভূতির তীব্রতা, প্রগাঢ়তা এবং ব্যাপকতা বোঝায় ; যুক্তিসংগত নীতিকথায় সন্তুষ্ট থাকবার অসম্ভাব্যতা নির্ণীত করে। যেমন, তাস্‌সোর রোমঁতিকতা;

ঙ. সৌন্দর্যচেতনা ও প্রকৃতি বর্ণনে এ শব্দের ব্যবহার অবশ্য পরিহার্য, যদি না সে চেতনার অধিকারী বা সে বর্ণনাকারী স্বয়ং রোমঁতিক দলের কেউ না হয়ে থাকেন;

চ. তুচ্ছার্থে, রোমঁতিকতায় (যেমন, এমা বোভারীর রোমঁতিকতা; এমা ফ্লবের রচিত বিখ্যাত উপন্যাস **মাদাম বোভারী**-র নায়িকা) উচ্ছল জীবনযাত্রার দোষত্রুটি, ভারসাম্যহীনতা, কল্পনার বল্গাহীনতা, (সমাজ) জীবনে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াসে অপারগতা, ভাবাবেগের বাড়াবাড়ি এবং তা প্রদর্শনের মনোবৃত্তি বোঝানো হয়।

ফরাশি রোমঁতিসম শুধুমাত্র সাহিত্যে নয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস শাস্ত্রের বিকাশেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে, নতুন ইতিহাস-চিন্তার প্রবক্তা থিয়েররি,[৭] মিশলে[৮] প্রমুখ ছিলেন রোমঁতিক চিন্তাধারায় আপ্লুত। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য স্যাঁৎ-ব্যোভের সাহিত্য সমালোচনা সংক্রান্ত রচনাবলীও। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক স্তঁদাল ও বালজাক যথার্থভাবে রোম্যান্টিক স্কুল সঞ্জাত না হলেও রোমঁতিকতার প্রভাব তাঁদের ওপর যথেষ্ট। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যে লেখক দল 'রোমঁতিসমে'র বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তাঁরাও এর কাছে অনেকখানি ঋণী।

সাহিত্যে রোমঁতিক আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ফরাশিদের এক নতুন শিল্পান্দোলনও সেকালে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন, ক্লাসিক এবং দাভিদ প্রবর্তিত নব্য-ক্লাসিক শিল্পরীতির বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত। চিত্রকর গ্রো, জেরিকো, দলাক্রোয়া, দভরিয়া এবং ভাস্কর দাভিদ দ্যঁজের হলেন শিল্পে রোমঁতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। সমকালীন সংগীত সৃষ্টির ইতিহাসেও এক নতুন আন্দোলন, রোমঁতিক সঙ্গীতের উদ্গাতা-স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন ফরাশি বেরলিওয এবং জর্মন শুমান।

বহুকাল আগে মোহিতলাল মজুমদার একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন : "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবধারা" (১৩২৩) ১১ ; সে প্রবন্ধের একাংশে আছে : "য়ুরোপীয় মধ্যযুগের জীবনযাত্রায় (এই সকল) রোমান্টিক উপাদান একাধারে সুলভ বলিয়া অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি (এই) মধ্যযুগের কল্পনায় এমনি বিভোর যে, কোনো কোনো ইংরেজ সমালোচক 'রোমান্টিসিজম'-এর উপর নাম দিয়াছেন 'mediaevalism' এবং ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে স্কট, কোলরিজ, কীটস এই তিনটি মাত্র কবিকেই ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া প্রকৃত রোমান্টিক কবি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। এই নামকরণের সহিত অবশ্য আমাদের সাহিত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই।"

বাঙলার মতো, ফরাশি সাহিত্যেও রোমঁতিকতা আর মধ্যযুগীয়তার মধ্যে কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্কের কথা কল্পনা করা যায় না। নবমূল্যায়নে জাতীয় ঐতিহ্যের উপলব্ধি ও অনুভূতি রোমঁতিক ভাবানুসারীদের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অতীতের মোহ সর্বথা পরিত্যাজ্য। অবশ্য, ফরাশিমানস সর্বকালে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে নতুন, আনন্দাভিসারী, প্রগতিপন্থী জীবনবোধের নিকষে যাচাই করে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী।

তথ্য-নির্দেশ

1. এ সম্পর্কে বিস্তৃত কিন্তু নির্বাচিত, ভাব ও বিষয়ে বিভক্ত, বিশ্লেষিত গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যাবে Max MILNER রচিত *Le Romantisme-I, 1820-1843* বইয়ের ৩৬৩-৩৮১ পৃষ্ঠায় ; এটি Arthaud প্রকাশনীর ১৬ ভল্যুমের Claude PICHOIS সম্পাদিত "Littérature Française" সিরিজের ১২ নম্বর গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য যে, *Le Romantisme* এই শিরোনামায় কালানুক্রমিক তিনটি গ্রন্থ পরিকল্পিত। এটি প্রথম (পারী, ১৯৭৩)। দ্বিতীয় (যেটি মুল পরিকল্পনার ১৩ নম্বর) গ্রন্থ ১৮৪৩-১৮৬৯ (গ্রন্থকার স্বয়ং সম্পাদক) এবং তৃতীয় (১৪ নম্বর) গ্রন্থ ১৮৬৯-১৮৯৬ (গ্রন্থকার R. POUILLIART) আমরা দেখিনি। Milner-এর বইটিও আমাদের হস্তগত হয়েছে এই প্রবন্ধ রচনার পর। আমাদের ব্যবহৃত বইয়ের উল্লেখ পরবর্তী টীকা ও পরিশেষে সম্পূরক গ্রন্থপঞ্জীতে থাকবে।

2. Jean-Jacques Rousseau, *Rêveries, 5e promenade* (রেভরি-স্যোঁকিয়েম প্রমনাদ্, 'স্বপ্নদর্শন, পঞ্চম পরিভ্রমণ')।

3. এই চারজনের উক্তি ও রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দে'য়া এখানে প্রয়োজনীয় মনে করছি, যদিও স্মরণ রাখছি, বাছাই এবং অনুবাদের অপূর্ণতা :

আলফোঁস দ্য লামারতিন (Alphonse de Lamartine, 1790-1869) : 'হ্রদ' (Le Lac)।

শাশ্বত রাত্রির গভীরে-
যে রাত চলে যায়
আসে না ফিরে-
তুমিও তেমনি এগিয়ে যাও
নতুন জলধারার সন্ধানে
সময়ের সমুদ্রে
আমরা কি কখনো।
পারি না একদা নোঙর ফেলতে?
হে হ্রদ! বছর তার মেয়াদ কাটিয়ে গেল
প্রিয় জাহাজগুলোর পাশে সে আসবে ফিরে
দ্যাখো! আমি এসেছি একা, বসি এই পাথরের 'পর
যেখানে তুমিও তাকে বসতে দেখেছিলে

অথবা অন্য একটি বিখ্যাত বচন :

"লোকে যাকে বলে কাব্য স্বরস্বতী (la Muse) আমি দিয়েছি তাকে, গতানুগতিক সাতটি তারের বদলে মানবহৃদয়ের তন্ত্রী দিয়ে তৈরি এক বীণাযন্ত্র।"

ভিক্তরুগ্যো (Victor Hugo, 1802-1885)

তাঁর এক বহুল উদ্ধৃত উক্তি :

"শতবর্ষধরে শিল্প ছিল একটি সাহিত্য, এখন হল একটি কবিতা"

(Littérature et philosophie mêlée, 1834)।

তাঁর "Puisque j'ai mis ma lèvre,...." কবিতার পাঁচ স্তবকের মধ্যে তিন স্তবকের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল :

ক. যেহেতু আমার ওষ্ঠ্য রেখেছি তোমার সুবিন্যস্ত চুলে
যেহেতু আমার বিশীর্ণ কপাল এখনো রয়েছে তোমার হাতের চাপে
যেহেতু তোমার আত্মার নরোম প্রশ্বাস
লুক্কায়িত ছায়ার সুগন্ধ আমি নিয়েছি আমার নিশ্বাসে

খ. যেহেতু আমার সুযোগ হয়েছে তোমার কথা শোনবার,
তোমার হৃদয়ের রহস্য ঘেরা সৌন্দর্য যাতে বিচ্ছুরিত
যেহেতু আমি দেখেছি তোমার ওষ্ঠ্য ও তোমার চক্ষু-
আমার ওষ্ঠ্য ও আমার চক্ষুর সঙ্গে হাসতে ও কাঁদতে.....

গ. দ্রুত অপসৃয়মান বছরগুলোকে এখন আমি বলতে পারি-
যাও! যাও, যেমন খুশি! আমার আর বুড়িয়ে যাবার
ভয় নেই। তোমার বাসি ফুলগুলোও নিয়ে যাও।
কেউ যাকে পারবে না তুলতে এমন এক ফুল এখন
প্রোথিত আমার আত্মার গভীরে।-

দ্য ভিইনি (Alfred de Vigny, 1797-1863)।
কবি চিরদিনই অসুখী কেন না তার স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু
কখনো বাস্তবে মেলে না।...
কবিতা হচ্ছে একই সংগে বিজ্ঞান এবং প্যাশন (passion)।
আলফ্রেদ দ্য মুসসে (Alfred de Musset, 1810-1857)।
দ্য মুসসে-র একটি কবিতার নাম : 'কবিতা কী? -' তার গদ্যানুবাদ দেওয়া হলো নিচে :

'স্মৃতি সমস্তকে বিদায় দিয়ে চিন্তাকে একটি সুন্দর স্বর্ণ কুঠারের 'পর শক্তস্থিত ভাবে ধরে রাখা। তবু যা অনিশ্চিত, শংকাকুল, অনড়! মুহূর্তের স্বপ্নকে হয়তোবা শাশ্বত করা, সত্য-সুন্দরকে ভালোবাসা, তাদের সঙ্গতি খোঁজা, আপন অন্তরে স্ব স্ব প্রতিভার প্রতিধ্বনি শ্রবণ ; একা, আপন মনে, যখন খুশি উদ্দেশ্যহীন হাসা-কাঁদা-গাওয়া ; একটু হাসি, কিছু কথা, একটি দীর্ঘশ্বাস বা একটি দৃষ্টির বিনিময়ে কোনো অসাধ্য সাধন-যা ভাবিয়ে তুলবে এবং মন ভরাবে; এক ফোঁটা অশ্রুকে একটি মুক্তোয় রূপান্তরিত করা : কবির এইতো প্যাশন, এইতো তার সম্পদ, এইতো তাঁর জীবন, তাঁর উচ্চাশা।'

4. টীকা : ১ দ্রষ্টব্য। রোমঁতিকতার প্রভাবের ব্যাপকতায় ফরাশি রোমঁতিক আন্দোলনকে প্রতি দশকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার ও দেখাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। অধুনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিক (কেউ ১৮৭৬, কেউ ১৮৯৬) পর্যন্ত ফরাশি রোমঁতিসমের যুগ বলে গণ্য

করা হচ্ছে। অঁদ্রে মাল্‌রো-র মতো কর্মযোগী লেখক-চিন্তাবিদ-শিল্পরসিক সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, "ভুলে যাবেন না যে আমি একজন রোমঁতিক্।"

5. বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য A. GUERNE এর *Les romantiques allemands* এবং R. SCHWAB-এর *La renaissance orientale* (Paris, Payot, 1950) গ্রন্থ দুটি।

6. সংজ্ঞা নির্ণয়ে আমরা সহায়তা গ্রহণ করেছি মূলত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী থেকে:

ক. Petit Larousse — Dictionnaire Encyclopédique ... Paris, 1960, pp. 925-926

খ. Henri BENAC, *Vocabulaire de la dissertation : Hachette, Paris,* 1949; PP. 144-146

গ. A CHASSNG & CH. SENNINGER, *La dissertation Littéraire Générale; Hachette, Paris*, 1955; pp. 199-219

ঘ. *Dictionnaire du français vivant, Bordas, Paris, 1972; pp. 1060*

7. এ বিষয়ে তিন দেশে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত তিনটি বইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য:

B.G. REIZOV, *L' Historiographie romantique*, 1962, মস্কো, বিদেশি ভাষা প্রকাশন, ১৯৬২

S. MELLON, *The Political Uses of History. A Study of Historians in the French Restoration; London University Press, 1958*

L.SECHE, *Etudes d' histoire romantique*. Paris, Merc. de France, 1910

8. "চিত্তবৃত্তির উভয় লিঙ্গ নিয়ে আমি একজন পরিপূর্ণ মানুষ" এই উক্তি যাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, সেই মিশ্‌লে (১৭৯৪-১৮৭৪) ছিলেন সর্বন এবং কলেজ দ্য ফ্রঁসের অধ্যাপক। স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁকে দুবার চাকরি হারাতে হয়। তাঁর রচনা-সমগ্রের আয়তন বড় বড় চল্লিশ ভল্যুম। এই ঐতিহাসিকের নিজের জীবনও কম ইতিহাস নয়। সমালোচনা জগতে অধুনা আলোড়ন সৃষ্টিকারী Roland BARTHES-এর *Michelet par Lui-même* (Paris, Editions du Seuil, 1965) গ্রন্থটি এখানে প্রণিধানযোগ্য।

9. দ্র. ক. L. ROSENTHAL, *La Peinture romantique,* Paris, 1903;

খ. L. RUDRAUF, *Delacroix et le problème du romantisme, artistique*, Paris, 1942

10. দ্র. ক. A. EINSTEIN, *Music in the Romantic Era, New*

York, 1947

খ. J. BERZUN, *Berlioz and the Romantic Century,* Boston, 1950, 2 vol.

গ. L. GUICHARD, *La Musique et les lettres au temps du romantisme,* Paris, (P.U.F.), 1955.

11. *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, জেনারেল, ৩য় সং, ১৩৫৩, পৃ. ২৭৮।

12. ফরাশিরা কিন্তু এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে থাকত। অতি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা P. ROZENBERG-এর *Le romantisme anglais. Le défi des vulnerables* [Paris, Larousse, Collection dirigée par J. Demougin, 1973] গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সম্পূরক গ্রন্থপঞ্জী

1. H. PEYRE, *Qu'est-ce que le romantisme?* Paris, P.U.F (Collection sup), 1971

2. A.J. GEORGE, *The Development of French Romanticism.* The Impact of Industrial Revolution on Literature, Syracuse U.P., N.Y. 1955.

3. A.R. THORLBY *The Romantic Movement,* London, Longmans, 1966.

4. R. WELLEK, *Concepts of Criticism, Yale U.P., 1963 (for two articles, "The Meaning of Romanticism in Literary History" and "*Romanticism re-examined")

5. G. POULET "Timelessness and Romanticism" *Journal of the History of Ideas,* vol XV (Jan, 1954)

6. M.H. ABRAMS, *The Mirror and the Lamp* : Romantic *Theory and the Critical Tradition,* Oxford U.P., 1953.

7. J.L. TALMON, *Romanticism and Revolt : Europe 1815-1948.* London, 1967.

8. LUC DECAUNES *La poèsie romantique française; Paris,* SEGHERS 1973.

দার্শনিক দিদ্‌রো ও তাঁর সাহিত্য কীর্তি

'মনীষার প্রয়োগ-সাফল্য নির্ভরশীল চিত্তবৃত্তির জাগরণে'। দিদ্‌রো প্রসঙ্গে গ্যাটে বিশ্বের সুধীসমাজে সুখ্যাত হলেও বাংলাদেশে দিদ্‌রোর পরিচিতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, প্রায়-অজ্ঞাত। তাঁর একটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ আমরা পাচ্ছি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ, তাঁর রচনার উদ্ধৃতি আমরা দেখি না বললে ফুরিয়ে যায়। তাঁর বিখ্যাত *অদৃষ্টবাদী* বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে অক্টোবর, ১৯৮৬ সালে। অনুবাদক শ্রী নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ভূমিকা-শুরুতে লিখেছেন :

'আঠার শতকের ফরাসী ভাষায় 'ফিলজফ' শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। কথাটির অর্থ হলো : একজন লোক যে প্রকৃতি ও মনুষ্য সমাজের রীতি-নীতিগুলোকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে, মানুষের সর্বাঙ্গীন সুখ ও সমৃদ্ধির রাস্তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। দিদ্‌রো ছিলেন একজন 'ফিলজফ'। আঠার শতকের অপর দুই বিখ্যাত ফিলজফের নাম হচ্ছে ভলত্যার ও রুশো। বাংলাদেশে ভলত্যার ও রুশোর নাম সবাই জানেন কিন্তু দিদ্‌রো অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত।'

যা হোক, বহির্বিশ্বে এটা এখন সর্বজ্ঞাত যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাশিদেশে 'বিশ্বকোষ' আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, স্বাধীনচেতা দার্শনিক এবং শক্তিমান লেখক দিদ্‌রো মানব-ইতিহাসের খ্যাতিমান মনীষীদের অন্যতম। সমকালের তিন প্রধান ব্যক্তিত্ব-মোঁতেসকিয়, ভলতের, রুসোর মতো প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে তিনি হয়ত সমর্থ হন নি কিন্তু এক অনিন্দ্যমধুর চরিত্রের অধিকারী এবং অনন্যসাধারণ ভাবধারার স্রষ্টারূপে, ইতিহাসবেত্তাদের মতে, দিদ্‌রোর স্থান কখনো বা এঁদেরও ওপরে। বিষয়-ব্যাপ্তি, মানবিকতা ও ঔদার্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টি সমভাবে উদ্ভাসিত। তবু তুলনামূলক অধ্যয়নে বিতর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনই বা কোথায়? মৃত্যুর পর তাঁকে ফরাশিদের জাতীয় স্মরণমন্দির পঁথেওঁ (Pantheon)-তে প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। অনুরাগী ফরাশি বুদ্ধিজীবীর সে ক্ষোভ এখনো আছে। কিন্তু বিগত দুশো বছরের বেশি

সময় ধরে তাঁর বিস্মৃত বা নবাবিষ্কৃত নানা উজ্জ্বল রচনার প্রকাশ, সেগুলো সম্পর্কে অফুরান আলোচনা, এমনকি আন্দোলনের সূত্রপাত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত, যে-যুগকে ফরাশিরা বলেন 'লাজ দেল্যুমিয়ের'- আলোর যুগ, ইংরেজরা 'দ্যা এইজ অব এনলাইটেনমেন্ট'- জ্ঞান বিভাসিত যুগ, তারই প্রতিভূ এই দিদ্‌রো- ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং রুশ দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবধারার আদান-প্রদানে আশ্চর্য সচল, সৃষ্টিশীলতায় ঈর্ষাযোগ্যভাবে পারঙ্গম।

পূর্ব ফ্রান্সের লঁগর্‌ অঞ্চলে তাঁর জন্ম ১৭১৩ সালের ৫ই অক্টোবর। ছুরি তৈরির শিল্পে নিয়োজিত বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান দনি দিদ্‌রো (Denis Diderot)। অধ্যয়ন শুরু করেন দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে। ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্নাতক হন এবং এরপর আবাসিক প্যারিসিয়রূপে বোহেমীয় বুদ্ধিজীবীর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে থাকেন। নাট্যশালার সঙ্গেও ঘটলো কিছু যোগাযোগ। তিরিশ বছর বয়সে আমাদের চণ্ডীদাসের মতো 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম' জ্ঞান করলেন এবং পাণি গ্রহণ করলেন অঁতোয়ানেৎ শঁপিওঁ নাম্নী এক ধোবানীকে, পিতার অমতে। এর মধ্যে প্রকাশ করলেন ইংরেজি থেকে দুটো বইয়ের অনুবাদ- স্ট্যানিয়ানের 'গ্রীসের ইতিহাস' এবং একটি মেডিকেল অভিধান। চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্যতত্ত্বগত বিষয় নিয়ে অব্যাহত থাকে তাঁর আজীবন আগ্রহ। একই সঙ্গে প্রকাশিত 'দর্শন চিন্তা' স্বরচিত তবে বইতে লেখকের নাম থাকলো না। বইটি পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পার্লামেন্ট। এরপর লিখলেন 'সন্দেহবাদীর আনন্দ ভ্রমণ' কিন্তু বিরত থাকলেন গ্রন্থপ্রকাশে। তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে পুলিশ। ১৭৪৯ সালের জুলাই মাসে আচমকা তাঁকে আটক করা হলো। রাষ্ট্র, ধর্ম ও প্রচলিত নীতিবোধের বিরুদ্ধে লেখার জন্য তিনি তখন অভিযুক্ত। তাঁর তিনটি বই 'চিন্তা', 'রত্ন' 'অন্ধদের সম্পর্কে পত্র' নিয়েও অভিযোগ ওঠে। প্রকাশকের হস্তক্ষেপে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশের স্বার্থে (যার জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করেছেন অনেকে) এই 'সুন্দর কিন্তু ভয়ংকর বুদ্ধির অধিকারী' লোকটি মুক্তি পেলেন। কেউ কেউ বলেন, 'জেলখানার অভিজ্ঞতায় দিদ্‌রো সংযত হলেন একটু।' তাঁর সংসার জীবন খুব সুখের ছিল না। একটিমাত্র মেয়ে তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পর অবধি বেঁচেছিলেন। মেয়েকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। একাধিক বিদুষী মহিলার সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিল তাঁর পরবর্তী জীবন। এঁদের একজন সফি ভলঁর কাছে লেখা 'পত্রগুচ্ছ' ফরাশি সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখায় বিচরণে অভ্যস্ত দিদ্‌রো এক উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে গেলেন ইতোমধ্যে। প্রকাশক ল' ব্রঁতো (পরে তৎসৃষ্ট প্রকাশক সমিতি) দিদ্‌রো এবং দালঁবেরকে দায়িত্ব দিলেন 'বিশ্বকোষ' সম্পাদনার। কথা ছিল, ইংরেজি *চেম্বার্স সাইক্লোপেডিয়ার* অনুবাদ ও অনুসরণে তা রচিত হবে। যুগধর্মের প্রভাবে ও প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজনে প্রকল্পটি ব্যাপ্তি লাভ করলো অস্বাভাবিক। নানা মত ও পথের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এসে এর সাথে যুক্ত হলেন- ভল্‌তের, রুসো তো আছেনই। তবু কাজকর্মে বাধা এলো প্রচুর। কিন্তু দিদ্‌রোর পঁচিশ বছর নিবেদিতচিত্ত পরিশ্রমের

সুফল সতেরো খণ্ড 'বিশ্বকোষ', ফরাশিদের চিন্তার জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করলো যথার্থ 'ফরাশি বিপ্লবে'র কয়েক বছর আগে। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্ট, সম্রাটের পরামর্শ সভা এবং পোপ একযোগে 'বিশ্বকোষ' নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু দিদ্‌রো ও তাঁর প্রকাশক সুকৌশলে বাধা এড়িয়ে পরবর্তী এগারো খণ্ড প্রকাশ ও চিত্র সংযোজনের কাজ অব্যাহত রাখলেন। 'বিশ্বকোষের' বিক্রি ও প্রচার সংখ্যাও ছিল ঈর্ষাযোগ্য। ২০ মিলিয়ন শব্দের এই মহাগ্রন্থ শিগগির সমগ্র ইউরোপে এক ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি করলো।

রোলঁ বার্থ বলেছেন, "'বিশ্বকোষ' আমাদের এক ভয়শূন্য বিশ্বের বাসিন্দা বানিয়েছে।" বস্তুত, এই গ্রন্থে অতীতের চিন্তা, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট। আজকের দিনে এ-ধরনের কোষগ্রন্থ সম্পাদকের ভূমিকার সঙ্গে দিদরোর কাজের কোনো তুলনাই চলে না। কেননা, এক অকল্পনীয় দুঃসাহস ও পরিশ্রমের ফসল তো বটেই, তার ওপর 'বিশ্বকোষ' নির্মাণে নানা নিরীক্ষণ, বহু বিষয়ে নতুনতর পথ পরিক্রমার প্রয়াসই আসলে এর বড়ো সাফল্য। এই বিশাল গ্রন্থ থেকে দিদ্‌রোর রচনা ছেঁকে বের করা বেশ অসম্ভব কাজ, তাঁর সহযোগী দালঁবের-এর ক্ষেত্রে তা অনেকটা সহজ। এর প্রধান কারণ, নিজের লেখা ছাড়াও অনেক রচনায় সংশোধন, সংযোজন, কোনো ক্ষেত্রে একেবারে নতুন প্রবন্ধ তৈরি করতে হয়েছে দিদ্‌রোকে। তবু অনুমান করা হয় যে, ছোটো বড়ো মিলিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা এক হাজারের ওপর। তাঁর একটি ছোটো অভিধা অনুবাদে উদ্ধৃত করছি এখানে :

'কামলা (জুরনালিয়ে): স্বহস্তে কাজ করে যে-শ্রমিক এবং যাকে দিনেই দিনের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়... একটি সরকার প্রধানত এ ধরনের লোকের ভাগ্য উন্নয়নের কথা ভাববেন। কামলা যদি হতভাগ্য হয়, সমগ্র জাতিও হবে ভাগ্যহত।'

অগুনতি বিষয়াবলির মধ্যে 'বিশ্বকোষ' প্রসঙ্গেই দিদ্‌রোর রচিত বেশ দীর্ঘ এক প্রবন্ধ সর্বকালের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বর্তমানের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অতীত ও অনাগত কালের প্রতি সমান দৃষ্টিদানের কৃতিত্ব এই সব্যসাচী দার্শনিকের। বলা যায় এখানেই তাঁর চিন্তাধারায় সার্বজনীনতা ও প্রকাশ-প্রসন্নতার রহস্য।

'বিশ্বকোষ' সম্পাদনা-সমাপ্তির সঙ্গে দিদ্‌রোর মন ও মননে প্রগতিশীল বস্তুবাদী চিন্তাধারা পূর্ণতা লাভ করছিল। একই সময়ে রচিত হতে থাকে প্রচুর সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা। তাঁর একটি পরিচয় আজ আর কোনোক্রমেই পাওয়া সম্ভব নয়- তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম কথার রাজা। অবশ্য তাঁর রচনায়, এমনকি কট্টর দার্শনিক যুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রেও কথকের প্রসাদগুণ ধরা পড়ে বৈকি। প্রথমাবধি নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞান বিচারে তিনি আগ্রহী তবে যান্ত্রিক বস্তুবাদ তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। তাঁর মতে,স্বাভাবিক স্বচ্ছ নীতিবোধ যেমন ভোগ বা সুখ, শিক্ষা ও উচ্চাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এখানে রুসোর বিপরীত অবস্থানে থেকে তেমনি এমন এক সামাজিক নীতিনিষ্ঠার প্রতি তিনি অনুরাগী যেখানে ব্যক্তি সুখচিন্তা সাধারণ মানুষের মঙ্গলবোধের অংশীভূত। নিজের জন্য এবং মানবজাতির জন্য সত্য

সুন্দর শুভ আত্মপ্রকাশ করুক, এই তাঁর জীবন-স্বপ্ন। এখানে স্মরণযোগ্য যে, একদা নাস্তিক বস্তুবাদ প্রচারের কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং মানবতার অকল্যাণকর চিন্তা, গোঁড়ামি, কায়েমি স্বার্থ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল সর্বদা সক্রিয়। বাস্তবতা ও আদর্শের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক 'সাবলাইম' তথা পূত-পবিত্র পরিস্থিতি তাঁর কাম্য। 'ইমোশন'-কে উপেক্ষা না করে সরস, সুন্দর ও ঔদার্য তাঁর শিল্পচৈতন্যের অঙ্গীভূত হোক, এই তিনি চান; তাছাড়া, সৌভ্রাতৃবোধের এক নতুন রূপও তাঁর রেভ দালঁবের ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রচার করেছেন তিনি। দেকার্তের যৌক্তিক আশাবাদ, পাস্কালের সর্বগ্রাসী হতাশাবোধ প্রভৃতি বহুবিধ চিন্তার ভিতে দিদ্‌রো যে দার্শনিক প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত করেন তা যেমন স্বচ্ছ তেমনি পরিবর্তনযোগ্য। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার পুরনো ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে যে সমস্যা সৃষ্টি করছিল তারই এক ধরনের সমাধান দিদ্‌রো দিতে চেয়েছেন 'বিশ্বকোষ'- সংকলন ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনার মধ্যে। তাই তাঁর কাছে 'বিজ্ঞান আর বিশ্ববিধান নয় বরং বিচ্ছিন্ন ঘটনাপুঞ্জের তথ্যাহরণ। যতবেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদের সামগ্রিক সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে প্রধান কাজ। বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন 'দেইস্ত' অর্থাৎ এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ছাড়া ধর্মের স্বর্গীয় ও প্রত্যাদেশের দিককে অস্বীকার করতেন। ক্রমশ প্রাণিবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির রহস্য বিষয়ে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। চিন্তা তাঁর কাছে তখন বস্তুগত শক্তির লীলা, ব্যক্তি তার অভিপ্রায়ে কখনোই পুরোপুরি স্বাধীন নয়। 'অদৃষ্টবাদী জাক' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'কু' এবং 'সু'-র কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ তার আচরণ বিধি, সুখবোধকে আবিষ্কার করে, বৈরাগ্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সমাজ-চৈতন্যই মানুষকে আত্মমগ্নতা থেকে রেহাই দেয়, মানুষের মধ্যে সৎকর্মের প্রবণতা জাগায়। উত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সম্পদের ব্যবহারে মানুষ উদারতা প্রদর্শন ও আনন্দ লাভে সমর্থ।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, দিদ্‌রোর বস্তুবাদী দর্শন ডারউইনের বিকাশ তত্ত্বের পূর্বাভাষ সূচিত করে, বস্তুর কৌষিক কাঠামোর প্রথম আধুনিক থিয়োরি নির্মাণে সচেষ্ট হয়। এসব তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে তাঁর চিন্তা ও অনুমান নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, তবে এসবের দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা সত্যি তুলনারহিত। আপাত-অসম্ভব স্থান-কাল-পাত্রের পরিবেশে এদের উপস্থাপনা, মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত জটিল ও পরস্পরবিরোধী ধারার অনুধ্যান, সহজ-সরল সংলাপের আকারে তার প্রকাশে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য আধুনিক পাঠকের কাছেও বিস্ময়কর ঠেকে। তাঁর স্বপ্ন বিষয়ক তত্ত্ব পরবর্তীকালে ফ্রয়েডকে আকৃষ্ট করে। 'বোবা-কালাদের সম্পর্কে পত্র' গ্রন্থে তিনি ভাষার কাজ এবং নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেন।

এক অসামান্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দিদ্‌রোকে আচ্ছন্ন করে রাখত- যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যসৃষ্টির বেলায়ও। অদৃশ্য জীবনাবেগ ছিল তাঁর চালিকাশক্তি। গল্প-উপন্যাসরূপে চিহ্নিত তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে দার্শনিক সংলাপ আর কথা-সাহিত্যের সীমারেখা টানা মুশকিল। যথার্থ ঔপন্যাসিক হবার অভিপ্রায়ও হয়ত

তাঁর ছিল না। অনেকটা খেয়াল খুশিতে যেন পলাতক চিন্তাকে বন্দী করতে গিয়ে কিছু গল্প *কাহিনি* ফেঁদেছেন তিনি। অথচ এতেই প্রকাশিত এগুলির গভীরতা আর পূর্ণতা। এগুলোই হয়ে রইল উত্তরকালের এক সমৃদ্ধ সম্পদ। অধিকাংশ আবার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পড়ে থাকল লোকচক্ষুর অন্তরালে। জীবনোৎকণ্ঠা, ঔৎসুক্য ও অনুপ্রেরণা নির্ভরতার কারণে এবং প্রায়শ সময়াভাবে তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সংশোধিত আকারে আমাদের হাতে আসে নি। কিন্তু প্রথমত লক্ষণীয় তাঁর বাস্তবতাবোধ। তাছাড়া, ছোটোখাটো বিষয়াদি বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, চরিত্রের সার্বিক গঠন এবং জীবন্ত মানুষের প্রতিভূরূপে উপস্থাপনের ক্ষমতা তাঁর দুর্বলতার দিকগুলোকে আড়ালে রাখে প্রায়ই। প্রথমদিকের লেখায় *লে বিজু য়্যাঁদিসক্রে* (১৭৪৮) কিংবা পরিণত বয়সের রচনা *লা রলিজিয়েজ* (১৭৬০) 'রামোর ভাইপো' এবং 'অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব' (১৭৭৩ বাংলায় *অদৃষ্টবাদী*, ১৯৮৬) গল্পসমূহে রয়েছে মানব অস্তিত্বের বিবিধ সমস্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সরস রূপায়ণ। তাঁর হাতে ফরাশি গদ্য পরিণত হয়েছে এক চির- আধুনিকতার স্বাদযুক্ত শিল্পে।

লা রলিজিয়েজ (যার সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ আছে *দা নান্*, পেংগুইন ক্লাসিক্‌সে) পড়তে গিয়ে দিদ্‌রোর প্রথম জীবনে পাদ্রি হবার দুর্ভাগ্য কাঠিয়ে ওঠা, আপন বোনের কনভেন্টে পাগল হয়ে মারা যাবার ঘটনা মনে পড়বে পাঠকের। কিন্তু অনেকটা ঠাট্টাচ্ছলে যেন তিনি লেখা শুরু করেছিলেন এই বই- যা আজ সেই শতাব্দীর অন্যতম সেরা উপন্যাসরূপে বিবেচিত এবং নিঃসন্দেহে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত সেকালের নারী নির্যাতনের একটি দিকের সুস্পষ্ট দলিল এবং জোরালো প্রতিবাদ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় : দিদরোর অন্য অনেক বইয়ের মতো এই বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি।

দিদ্‌রো-দলের এক বন্ধু প্যারিস ছেড়ে চলে গেলে সবাই চাইলেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। দুস্থা মহিলাদের প্রতি দয়াপ্রবণতার কথা ভেবে এক কাল্পনিক কনভেন্টে আবদ্ধ কন্যা নিজের উদ্ধারের জন্য পত্রের মাধ্যমে তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছে এরকম একটা ফাঁদ পাতা হলো। দীর্ঘদিন চলে সেই মজার খেলা। পরে দিদ্‌রো পত্রোপন্যাসের ক্ষেত্রে রিচার্ডসন প্রবর্তিত পন্থায় স্যুজান সিমন্যাঁ-র *কাহিনি* রচনা করেন। নারী হৃদয়ের নানা অভিব্যক্তি, দেহজ অনুভূতি, অন্যায়, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতি তাঁর মনোভাব এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এতে সমুদ্ভাসিত।

'অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব' (লেখা ১৭৭৩, প্রকাশ ১৭৯৬ বাংলায় *অদৃষ্টবাদী*) বইটিকে কেউ কেউ 'পিকারেস্ক' বা 'বারোক' স্টাইলে রচিত এক দার্শনিক *কাহিনি* বলে চিহ্নিত করে থাকেন। আসলে তাঁর অন্য লেখার মতো এটিও কোনো বিশেষ আঙ্গিকের অঙ্গীভূত নয়। একজন আধুনিক সমালোচকের মতে, তাঁতাঁ *(Tintin)*-র মতো সাত থেকে সাতাত্তর বছরের ছেলে-বুড়ো সবার কাছে সমান আদরণীয় গ্রন্থ এটি। শেষ বয়সের দিকে দিদ্‌রো লিখেছিলেন বইটি। কিন্তু এতে রয়েছে অল্পবয়সী অভিযানের উন্মাদনা। *কাহিনি*- সূত্রটি এরকম : মোটামুটি অবস্থাপন্ন কৃষকের ছেলে জাক হঠাৎ করে যোগ দিল সেনাবাহিনীতে। বয়স

একুশ-বাইশ। ভীষণভাবে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রইল কয়েক বছর। পরে ভিন্ন ভিন্ন মনিবের কাছে চাকরি করল গৃহভৃত্যের। ওর বয়স যখন চল্লিশের দিকে এবং মনিবের আরেকটু বেশি- তখন ওরা প্যারিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। মনিবের সঙ্গে ভ্রমণে বেড়িয়ে জাক তার প্রেম ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিতে শুরু করে। কিন্তু অন্য কাহিনি বা ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহার বিলম্বিত হতে থাকে। দিদ্‌রোর গ্রামের বাড়ির কাছাকাছি এলে ওরা পড়ল ডাকাতের হাতে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ডাকাতের দলে নাম লিখিয়ে মনিব উদ্ধার ইত্যাদি সেরে জাক গ্রামে ফিরে বাল্যকালের প্রেমিকাকে বিয়ে করল। মনিবের আদর ও পত্নীর ভালোবাসা পেয়ে সে সুখে কালাতিপাত করতে থাকল। ... এই গ্রন্থে দিদ্‌রো ঔচিত্যবোধের স্বপক্ষে জোরালো দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন এবং বাস্তবসম্মত নীতিবোধ প্রচার করেছেন।

তাঁর 'রামোর ভাইপো' ফরাশি সাহিত্যের এক অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ। আমাদের জগতে ইংরেজি *কনফেশন্স অফ এন অপিয়াম-ইটার* বা বাংলা *কমলাকান্তের দপ্তর* কিংবা *মো'মেনের জবানবন্দীর* কোনো কোনো অংশের সঙ্গে হয়ত এর তুলনা চলে। বইটি লেখা হয় ১৭৬২-৬৮ সালে, সংশোধন সংযোজন চলে ১৭৭২-৭৯ পর্বে, কিন্তু এটির প্রথম আত্মপ্রকাশ জর্মন অনুবাদে, ১৮০৫ সালে, স্বয়ং গ্যটে এর ভাষান্তর করেন সপ্রংশস ভূমিকা সমেত। মূল গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া না গেলে ১৮২৩ সালে বইটি জর্মন থেকে ফরাশিতে অনূদিত হয়। পরে দিদ্‌রো-কন্যা এবং রুশদেশের রানীর কাছে হস্তান্তরিত দিদ্‌রোর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে দুটো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল। এদের একটিও স্বাক্ষরিত ছিল না। অবশেষে ১৮৯১ সালে মূল পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হলো প্যারিসের এক পুরোনো বইয়ের দোকানে। (এটি এখন সংরক্ষিত নুইয়র্কের পিয়েরগন্ট মরগ্যান লাইব্রেরিতে, অন্য কপিগুলো রয়েছে প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে)।

গ্রন্থের শুরুটি খুব চমৎকার: প্রতি বিকেলে রাজ-প্রাসাদের সামনের বাগানে বেড়াতে যান লেখক- দিনটি খারাপ ভালো যা হোক না কেন। প্রেম, রাজনীতি, রুচি, দর্শন- সবকিছু নিয়ে নিজের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি: 'ভাবনা-চিন্তাইতো আমার দুষ্টু প্রিয়ারা'। আবহাওয়া খুব খারাপ হলে, বৃষ্টি বা শীতের প্রকোপ বাড়লে তিনি আশ্রয় নেন কাফে দে রেজঁস্-এ বসে বসে দাবা খেলা দেখেন। একদিন সন্ধ্যায়, নৈশভোজের শেষে, তিনি বসেছিলেন সেই কাফেতে- এদিক ওদিক দেখছেন, কিছু বলছেন, শুনছেন কম, এমন সময় তাঁকে 'অধিকার করে বসলো এক বিচিত্র ব্যক্তি যার নমুনা ঈশ্বর এদেশে বেশি দেন নি'। লোকটা ছিল দৈর্ঘ্য আর হ্রস্ব, কাণ্ডজ্ঞান আর পাগলামির অপরূপ মিশ্রণ। সৎ-অসতের ধারণা বড়ো আশ্চর্যভাবে আসন গেঁড়েছে তার মাথায়।' ...এই লোকটাই সে-সময়কার এক নামজাদা সংগীতজ্ঞ রামো-র ভাইপো। অনেক বৈপরীত্য অনেকটা যেমন তার স্রষ্টার চরিত্রেও! কিন্তু এ সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ! মূলত দুজনের আলাপচারিতাই এ গ্রন্থের প্রাণবস্তু।

আকৈশোর নাটকে আগ্রহ দিদ্‌রোর। পরে প্যারিসের নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি

রেখেছিলেন সুসম্পর্ক। কিন্তু তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করেছিল গতানুগতিক নাটক। ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু ও স্টাইলের অস্বাভাবিকতা, কমেডির হালকা রঙ্গরস বাদ দিয়ে তিনি এক নতুন ধরনের নাট্যসৃষ্টির প্রবক্তা হলেন যার নামকরণ হয়েছে 'বুর্জোয়া ড্রামা'। চরিত্রের অনুধ্যানের ওপর জোর না দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের ঘটনাবৃত্তে পারিবারিক সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত হলো এ নাটক। বাস্তবানুগ দৃশ্যপট, পোশাক, সংলাপ এল। আবেগ সঞ্চারেও পরিবর্তন হলো অভিনেতার ভূমিকা। *কাহিনি* তুঙ্গে উঠলে সংলাপ শেষ হলো চিৎকার, দীর্ঘশ্বাস বা দীর্ঘস্থায়ী নিঃস্তব্ধতার মধ্যে। অন্যায়, অসহিষ্ণুতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এ নাটক সোচ্চার।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, নিজের লেখা নাটকে দিদ্‌রো খুব সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তবে ফরাশি দেশের নাটকের ইতিহাসে, বিশেষ করে পরবর্তীকালের নাট্যকারদের ক্ষেত্রে তাঁর এই পথ নিদের্শনা বেশ কিছুটা সার্থকতা অর্জন করেছিল। তাঁর লেখা নাটক, 'মায়ের পেটের ছেলে', 'পুণ্যবলের পরীক্ষা', 'পরিবারের পিতা' ও 'ভালো না মন্দ' নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়েছে। এদের মধ্যে শেষোক্তটি মঞ্চসফল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। অধুনা তাঁর নাটক ও নাট্যধারণা নিয়ে নতুন নিরীক্ষা চলছে। সেগুলো যে অনেকাংশে চমকপ্রদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নাট্য সমালোচনায় তথা সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায়ও দিদ্‌রো প্রদর্শন করেছেন বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। 'মায়ের পেটের ছেলে'-প্রসঙ্গে (১৭৫৭) 'নাট্যকাব্য সম্পর্কে' (১৭৫৮), 'অভিনেতাকে নিয়ে প্যারাডক্স' (১৭৭৩-৭৮, প্রকাশিত ১৮৩০) প্রবন্ধে তিনি জন্ম দিয়েছেন নানা মতবাদের। এগুলো পরবর্তীকালে বিশেষ ভাবে কার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছে। 'কবিতার অস্থিষ্ট বৃহৎ কিছু, বর্বর, আদিম কিছু একটা' ১৭৫৮ সালে উক্ত এই বিখ্যাত বক্তব্য রোমঁতিক কাব্যন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছে।

অবশ্য সমকালে, শতাব্দীর অন্তরালে, তাঁর বৈশিষ্ট্য বেশি পরিদৃষ্ট হয়েছে শিল্প সমালোচকরূপে। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, তীব্র প্রকাশভঙ্গী এই ক্ষেত্রে অর্জন করেছে অসামান্য সাফল্য। এ বিষয়ে পূর্বসুরীদের মধ্যেও ছিলেন না তেমন কোনো কুশলী লেখক। শিল্পীদের কাছ থেকে তিনি চাইতেন মতবাদ নয়- সততা, এবং তাঁদের উপদেশ দিতেন- 'প্রকৃতির পরামর্শ গ্রহণের।' শুধু নান্দনিক পরিতৃপ্তি নয়, শিল্পের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল- 'বিস্মিত হবার এবং চিন্তার প্রেরণা জোগাবার মতো স্ফুলিঙ্গ।' একটি শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণে অগ্রসর হয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক উৎস, এবং তাৎপর্য আবিষ্কারে তৎপর থাকতেন। সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় শিল্পালোচনার রীতি প্রবর্তনাও দিদ্‌রোর বিশেষ কৃতিত্ব। পরবর্তীকালে গ্যাটে, বোদ্‌লের প্রমুখ তার তারিফ ও অনুসরণ করেছেন।

সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাদানের পক্ষপাতি ছিলেন না দিদ্‌রো। যেসব শিল্পকর্মে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সেরা অভিব্যক্তি ঘটেছে তাকেই তিনি মনে করতেন সার্থক সৃষ্টি। প্রথম দিকে না হলেও ক্রমশ শিল্পীবন্ধুদের সহায়তায় শিল্পের টেকনিক, আলো-ছায়ার খেলা, রেখা ও রঙের বৈচিত্র্য অনুধাবনে সমর্থ হয়েছিলেন

তিনি। তাঁর শিল্প বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মোমের শিল্প : ইতিহাস ও রহস্য' (১৭৫৫), 'শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ' (১৭৬৫, প্রকাশিত ১৭৯৬), 'সালোঁ' (১৭৫৯-১৭৮১): 'লুভ্‌র প্রাসাদে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী সম্পর্কিত প্রতিবেদন' উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে বোদ্‌লের ও জোলা দিদ্‌রোর ধারাই অনুসরণ করেন।

দিদ্‌রোর সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমস্যা আছে : তাঁর মৃত্যুর অল্প-পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ফরাশি বিপ্লবের চিৎপ্রকর্ষ নির্মাণে তিনি কতখানি অগ্রণী ছিলেন? বিপ্লবের নায়কদের কেউ কেউ দিয়েছেন বিরূপ ধারণা। এখন এটা আর গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেননা, অনেকের রচনাংশে দিদ্‌রো-চিন্তার বৈপ্লবিক ধারাগুলো আত্মগোপন করে ছিল। গীইয়োম রেয়নালের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের বিপ্লব সংক্রান্ত অংশ বিশেষ দিদ্‌রোরই লেখা। এটা এখন স্বীকৃত তথ্য।

একথা অবশ্য বলা যাবে না যে, দিদ্‌রোর সব লেখাই এখনো গ্রহণযোগ্য আর পাঠযোগ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সমকালীন লেখকের মূল্যায়নেই তো ঘটে নানা হেরফের। তাঁর জীবনের একটা দিক নিয়ে কেউ কেউ কটূ কথা শুনিয়েছেন। ফরাশি বিপ্লবের নেতা রব্‌স্‌পীয়ের তাচ্ছিল্যের সুরে তাঁকে 'জার-সম্রাজ্ঞীর বৃত্তিধারী' বলে উল্লেখ করেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তবে ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। জীবনের শেষ দশ বছর দিদ্‌রো রুশ-সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন (১৭২৯-১৭৯৬)-এর প্যারিসের বাড়িতেই থাকতেন। এবং তারও আগে 'বিশ্বকোষে'র কাজ শেষ হলে অর্থকষ্ট থেকে নিষ্কৃতিদানের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি কিনে নেন সম্রাজ্ঞী। স্থির হয়েছিল : প্রয়োজন না-হওয়া পর্যন্ত দিদ্‌রো তা নিজের কাছেই রাখবেন। পরে আজীবন বার্ষিক বেতনে দিদ্‌রো হলেন নিজেরই গ্রন্থাগারিক।

১৭৭৩ সালে রানীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য দিদ্‌রো যান সেন্ট-পিটার্সবুর্গে। সসম্মানে অভ্যর্থিত হলেন তিনি সেখানে। কিন্তু রুশ দরবারের পরিস্থিতি তাঁকে কিছুটা হতাশ করেছিল, তাই অবস্থান সংক্ষিপ্ত করে কয়েকমাস পরই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। রানীর নির্দেশে তিনি প্রস্তুত করেন, 'রুশ সরকারের নিমিত্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা' এবং 'ডেপুটিদের প্রতি মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর আদেশ সম্পর্কে বক্তব্য'। বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ শাসক সম্প্রদায় খুব বেশি শোনে নি কখনো। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। স্বাধীনতা ও অধিকার চেতনা নিয়ে দিদ্‌রোর মতামত গ্রাহ্য হবার কথা নয় জার দরবারে। অথচ সমগ্র ইউরোপে খ্যাতির কারণে দিদ্‌রোর মতো স্বনামখ্যাত ব্যক্তিকে খাতির করে রানী নিজেকেই ধন্য মনে করেছিলেন।

প্রতিভার অর্থ যদি হয় 'নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি' তাহলে দিদ্‌রোর ক্ষেত্রে সবচে' সুপ্রযুক্ত এই অভিধা। এক অসামান্য প্রতিভাধর-সহিষ্ণু, সাহসী, উদার, উদ্যমী, সচল ব্যক্তিত্ব দনি দিদরো। আঠারো শতকের আলোকমালায় তাঁর দীপ্তি যতখানি উদ্ভাসিত, পরবর্তী সময়ে সে ঔজ্জ্বল্য গেছে আরো বেড়ে। ত্রিশত জন্মজয়ন্তীতে দিদ্‌রোকে মনে হয় অনেক বেশি জীবন্ত এবং প্রয়োজনীয়।

ভিক্‌তর উ্যগো : বিশ্ব সাহিত্যের অগ্রদূত

ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত ভিক্‌তর উ্যগো এক মহৎ লেখকরূপে আমাদের দেশেও সুপরিচিত। দীর্ঘকাল অবধি আমরা তাঁর নাম শুনছি আর তাঁর বই পড়ছি। কিন্তু শুদ্ধ উচ্চারণে সুষ্ঠুভাবে কিছু জানছি না। কাজেই আমাকে একটু মাস্টারসুলভ কাজ করতে হবে। কিছু নির্দেশনামূলক বানান ও উচ্চারণের, কখনো বা ব্যাকরণের কথা দিয়ে রচনা শুরু করতে হবে।

প্রথমত, ফ্রান্স থেকে যা আসবে তাকে আমরা 'ফরাশি' বলবো বা লিখবো। 'ফরাসি' বা 'ফরাসী' নয়। উচ্চারণগত কারণে বুদ্ধদেব বসু এবং অনেক আধুনিক লেখক, বিশেষ করে ফরাশি বিশেষজ্ঞরা এই বানানই পছন্দ করেন এবং উপযুক্ত মনে করেন। দ্বিতীয়ত, ওপরে যে লেখকের নাম উল্লেখ করলাম তাঁর একটি বিখ্যাত, বহুল পরিচিত বই আছে যার নাম 'লে মিজেরাবল' (১৮৬২)। কেন জানি না, নির্বিবাদে ভুল উচ্চারণে বাংলায় একে 'লা মিজারেবল' বলা, পড়া ও লেখা হয়। প্রসঙ্গত, সামান্য একটু ব্যাকরণের কথা বলি। ফরাশি ভাষায় যে নির্দেশক পদ (অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে ডেফিনিট আর্টিকল বলা হয়) রয়েছে তা হলো ল্য-লা-লে Le, La, Les : ল্য হলো পুংলিঙ্গের, লা স্ত্রীলিঙ্গের আর লে (Les) পুং বা স্ত্রী একক বা সম্মিলিত বহুবচন (যথা-টা, টি ও রা, গুলো)। প্রাগুক্ত বইটির নাম ফরাশিতে আছে Les Misérables (ভাগ্যহত মানুষেরা কিংবা দুঃখীরা) 'লে' না বলে (বা লিখে) 'লা' উল্লেখ করাটা হবে মারাত্মক ভুল এবং অকারণ অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান। যাকে নিয়ে আজ আমরা কিছু কথা বলবো তাঁর নাম Victor Hugo-ভিক্‌তর উ্যগো। ফরাশিতে 'ট' নেই, H-এর উচ্চারণও নেই বললে ফুরিয়ে যায়। আর U-র উচ্চারণ 'উ্য' সোজা 'উ'তে কাজ হবে না তবে 'য়্যু' লেখা যেতে পারে। আরেকটা কথা, ফরাশিরা কিন্তু দুটি শব্দ আলাদাভাবে উচ্চারণ না করে একসঙ্গেই বলে যার বাংলারূপ দাঁড়াবে- ভিক্‌তরুয্যগো। কয়েকবার প্র্যাকটিস করলেই বিশুদ্ধ ফরাশি উচ্চারণের কাছাকাছি চলে আসবে। অবশ্য ফরাশি অভিধান কিংবা রেফারেন্স বইয়ে তাঁর নাম লেখা হবে Hugo Victor Marie, Comte.

মারি বংশগতভাবে মায়ের নামটা ছিল, কিন্তু এটি খুব একটা ব্যবহার হয় না, আর কোঁৎ : ইংরেজিতে 'কাউন্ট' হলো তাঁর উপাধি। তাঁর জন্ম বজাসোঁ শহরে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮০২ এবং মৃত্যু প্যারিসে ২২ মে ১৮৮৫ তারিখে। সামরিক কর্মকর্তা পিতা, একজন জেনারেলের সঙ্গে তার শৈশব কেটেছে দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরিতে : কর্স, ইতালি ও হিস্পানে। এ সময়ে তাঁর বাবা-মায়ের ঝগড়া চলছিল তুঙ্গে। আরও কিছু দেশের ভেতর ভ্রমণ সত্ত্বেও ১৮১২ থেকে তিনি মোটামুটি প্যারিসে থিতু হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে অধ্যয়ন করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি আদেল ফুশে-কে বিয়ে করেন এবং পরপর দু'বছর অন্তর তাঁদের চারটি সন্তানের জন্মলাভ হয়। শুরু থেকে ভিকতর উ্যগো ছিলেন রাজানুরাগী এবং ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থ *Odes et Ballades* (1828), *Cromwell* (1827) এবং *Orientales* (1828) সমকালীন, রোমান্টিক আন্দোলনের শীর্ষে তাঁর স্থান নির্ধারিত করে। এরমধ্যে তাঁর একটি নাটক নিষিদ্ধ হলে এবং *Hernani* নিয়ে বিতর্ক তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। এ সময়ে তিনি জুলিয়েৎ দ্রুয়ে নামক এক মহিলার প্রেমে পড়েন। প্রথমদিকে কিছু অশান্তি থাকলেও পঞ্চাশ বছর (১৮৩৩-১৮৮৩) তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয় সুখে-দুঃখে কিন্তু উ্যগোর জন্য উত্তরোত্তর খ্যাতির পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যায় তাঁর উপন্যাস 'নৎরদাম দ্য পারী' (*Notre-Dame de Paris*-1831) এবং মঞ্চ সফল নাটক *Ruy Blas* (1838) ও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কথা। ১৮৪৩ সালে উ্যগোর কন্যা লেওপোলদিনের নৃশংস মৃত্যু তাঁকে রাজনীতির অঙ্গনে নিয়ে আসে। তিনি পোল্যান্ডের পক্ষে, সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে সোচ্চার হন। এ সময়ে ফ্রান্সে নানা রাষ্ট্র বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। তাতে উ্যগোকে দেশের বাইরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় একাধিকবার। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিসম্ভাব অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে। তিনি 'লে মিজেরাবল' 'শতাব্দীসমূহের কিংবদন্তী' 'সমুদ্র শ্রমিক' 'শান্তি' 'বিশ্ব ভাবনা' প্রভৃতি লেখেন। তাছাড়া থাকে বহু অপ্রকাশিত রচনা। ১৮৭৬ সালে তিনি সিনেটর রূপে মানবতাবাদী বাম বলয়ের আদর্শ পুরুষে পরিণত হন।

বহু প্রতিভার আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স ছিল ভরপুর। কিন্তু সৃষ্টি প্রাচুর্যে, রচনার সৌকর্যে-বৈচিত্র্যে উ্যগো অতুলনীয়। সাহিত্য শিল্পের এমন কোনো অঙ্গন নেই যাতে তাঁর প্রতিভার ছাপ পড়েনি। তবে অতিশয়োক্তি দোষে তাঁর লেখার কিছু উত্থান-পতন ঘটেছে। এছাড়া ছবি আঁকায়ও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তিনি রেখে গেছেন দু'হাজারের বেশি শিল্পকর্ম। এসব দিক বিবেচনা করে কেউ কেউ পরবর্তী কালের এশীয় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে থাকেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেন। প্রথমে ভিকতর উ্যগোর চারটি কবিতা অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত চন্দননগর অবস্থানকালে। কবিতা চারটির প্রথম পঙক্তি : ঐ যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,

যে তোরে বাসেরে ভালো,

তারে ভালোবেসে বাছা,

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস

এবং বিপুল মহিমা-মূর্তি মহীয়সী প্রতিমার আগ্নেয় কুসুম।

এগুলো কবির প্রথমদিকের কাব্যগ্রন্থ প্রভাতসংগীত-এ সংকলিত হয়। দু'খণ্ডে রচিত ভিকতর উ্যগোর *লে কোতঁপ্লাসিওঁ* (*Les Contemplations*) কাব্যগ্রন্থে এই কবিতা চারটি রয়েছে।

প্রিয়নাথ সেন 'গীদে মোপাসঁ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য আশ্চর্য প্রতিভাবলে, অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির কয়েকটি কবিতার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে ছন্দের সুষমা, ভাষার মাধুর্য এবং পদের মাহাত্ম্য সকলেই রক্ষিত হইয়াছে। কোনটি অনুবাদ, কোনটি মূল, তুমি বলিতে পারিবে না। যেন দুইখানি সমুজ্জ্বল মুকুরে একই সুন্দর মূর্তি প্রতিফলিত হইয়াছে।'

কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থেও উ্যগোর একটি কবিতার অনুবাদ রয়েছে। তাঁর 'জীবনমরণ' শীর্ষক আরও একটা অনুবাদ কবিতা রয়েছে ফরাশি কবির 'Ceux-ci partent, ceux la demeurent' ওরা যায়, এরা করে বাস। তাছাড়া রয়েছে 'শিশুর মৃত্যু' কবিতাটি (বেঁচে ছিল হেসে হেসে/ খেলা করে বেড়াত সে)। রবীন্দ্রনাথকৃত উপর্যুক্ত ৭ টি কবিতা ছাড়া উ্যগোর অনেক গল্প-উপন্যাস, কবিতা বাংলার বহু লেখক অনুবাদ করেছেন। জহুরী অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "মানব সন্তান" শীর্ষক বিশ লাইনের একটি উ্যগো রচিত কবিতার প্রথম চার পঙক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি : যত্নে রেখ এই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানে/ ক্ষুদ্র-তবু অন্তরে সে ধরে বিশ্বম্বরে: শিশুরা জন্মের আগে রশ্মি রাসিরূপে/ চঞ্চল পুলকভরে ফিরে নীলাম্বরে।

মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ কবির অজস্রকাব্যপঙক্তি এক রহস্যময় জগৎ নির্মাণ করেছে যা শতাধিক বছরেও পুরনো হয়ে যায়নি। তবে ভিকতর উ্যগো বেশি স্মরণযোগ্য থেকেছেন তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলোর জন্য। প্রথমদিকের আইসল্যান্ড ও নৎরদামকে ঘিরে তাঁর যে দুটি উপন্যাস, তা আজও মানব ঐতিহ্য ও সাধারণ জীবনের অলৌকিক রসাবেশ সৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল। ১৮৬২ সালে রচিত তাঁর বিশাল কল্পকাহিনী 'লে মিজেরাবল'-এ ভালজঁ-র অপরাধী চরিত্রকে কেন্দ্র করে স্বদেশ ও স্বকালকে নতুন করে পরিচিত করিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে মানব চরিত্রের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দুর্দশা ও আনন্দ-বেদনার গভীরতর রূপকে উন্মোচিত করেছেন ভিকতর উ্যগো।

বিশ্ব সাহিত্যের ছায়ামন্ডপ যে চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভর করে রয়েছে সম্ভবত তাঁরা হলেন– শেক্সপীয়র, গ্যাটে, ভিকতর উ্যগো আর রবীন্দ্রনাথ। নিজের সময়কালে গভীরভাবে আত্মমগ্ন থেকেও ভিকতর উ্যগো আমাদের কালেও প্রশংসনীয় এবং সজীব ও জাগ্রত। সৃষ্টিশীল থেকে তিনি ভালোবাসায় আত্মলীন ছিলেন, মানবাধিকারের প্রশ্নে তিনি সংগ্রামমুখর ছিলেন সারাটা জীবন। তাই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন উ্যগো তাঁর অমর সৃষ্টিতে।

ভিক্তর উগোর দুটি কবিতা-

হেমন্ত

অনুজ্জ্বল উষা
বাতাস নাতিশীতোষ্ণ
আকাশ ঘোলাটে
ঘটেছে দীর্ঘ দিবসের অবসান
নেই আর উপভোগ্য মাসগুলো
হায়রে ! এই তরুরাজি
ইতোমধ্যেই হয়েছে হলুদ ...
হেমন্ত হলো বিষণ্ন, তার চুম্বন আর ঝড়ো হাওয়া নিয়ে
পালিয়ে যাওয়া যে গ্রীষ্ম সে ছিলো এক যথার্থ বন্ধু।

বসন্ত

এই যে বসন্ত! মিষ্টি হাসি নিয়ে এসেছে মার্চ আর এপ্রিল
পুষ্পিত মে, উষ্ণ জুন- সব ভালো বন্ধু
ঘুমন্ত নদীর পাড়ে পপলার বৃক্ষ
কাত হয়ে শুয়ে যেন বড় তাল গাছ
পাখি ঝটপট করে শান্ত, হালকা গরম বনভূমির গভীরে
সবকিছু হাসছে এবং সবুজ বৃক্ষসমূহ
মনে হয় একত্র হবার আনন্দে কবিতা আওড়ায়
দিবসের আগমন উজ্জ্বল, কোমল প্রভাতে
সন্ধ্যায় শুধু প্রেম; রাত্রি বেলা, শোনা যায়
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার অতিক্রান্ত
এবং রহমত ভরা আসমানের নিচে
সুখের কিছু বন্ধ গান গেয়ে যায় নিঃসীমের।

বিশ্বসাহিত্যে র‍্যাঁবোর প্রভাব

এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। এক জটিল চরিত্রের ফরাশি কিশোর- ষোলো থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে এমন কিছু লিখে ফেললো, যা আজো তাবৎ বিশ্বে কবি-কথাশিল্পী ও দার্শনিকদের ভাবিয়ে তোলে। তিনি অবশ্যই আর্তুর র‍্যাঁবো। স্বয়ং ভিক্তর উ্যগ্যের মতো মহৎ প্রতিভা তাঁকে 'ক্ষুদে শেকসপিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। অনুবাদ ও আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বের বহু বড় বড় কবি-সমালোচক র‍্যাঁবোর প্রতি যে আকর্ষণ প্রদর্শন করেছেন, তা তুলনারহিত। অবশ্য র‍্যাঁবোর আগে-পরে ফ্রান্সে আরো অনেক প্রধান কবি রয়েছেন- যাঁদের মধ্যে অন্তত বোদ্‌লের আর মালার্মের নাম উচ্চারণ করতেই হয়। বোদ্‌লের সম্পর্কে র‍্যাঁবোরই একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে 'প্রথম দ্রষ্টা কবিদের রাজা, এক সত্যিকার ঈশ্বর'। তবে র‍্যাঁবোকে আমরা দেখব, ফরাশি সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবোন্মাদনার অতি প্রভাবশালী আধুনিক কবি রূপে। আমাদের দিক থেকে বোঝার সুবিধার জন্য কিশোর রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী নজরুল বা সাম্যবাদী সুকান্তকে কিছু মিলের কারণে উদাহরণস্বরূপ টেনে আনতে পারি।

র‍্যাঁবোর জন্ম প্যারিসের অদূরে, শার্লভিল শহরে, বেলজিয়াম বর্ডারে। সেটি ছিল ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত কিছু পরিবার নিয়ে একটি হতশ্রী জনপদ। সে যা হোক, দুটি তথ্য এখানে উল্লেখযোগ্য- জন্ম ২০.১০.১৮৫৪ সালে আর মৃত্যু মার্সেই বন্দরে ১০.১১.১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ ৩৭ বছরের অসমাপ্ত জীবন। ছয় বছর বয়সে পিতা-মাতার আলাদা সংসার। স্কুলেই বালক আর্তুর লাতিন ভাষায় কবিতা লিখে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনার মাধ্যমে। ১৮৭০ এর শুরু থেকে কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করে র‍্যাঁবো পরিচিত হয়ে ওঠেন। অতঃপর শার্লভিল-প্যারিস ও বেলজিয়ামে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। হাতে তাঁর একটি প্রকল্প 'কমিউনিস্ট কনস্টিটিউশন' যা পরে হারিয়ে যায়; লেখেন কয়েকটি ধর্মবিরোধী কবিতা। ১৮৭১-এর ১৩-১৫ মের মধ্যে

তিনি দুই বন্ধু ইজঁবার ও দেমর্নির কাছে দুটি চিঠি লেখেন, যা 'দ্রষ্টার পত্র' রূপে বিখ্যাত এবং যাতে রয়েছে সেই বিখ্যাত উক্তি :

Je est un autre [...] le poète se fait voyant par un long, immense et raisonnné dérèglement de tous les sens. (আমি হয় অন্য কেউ ... কবি এক দীর্ঘ, বিশাল ও যুক্তিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলায় নিজেকে দ্রষ্টা করে তোলেন)।

অন্যত্র তিনি লেখেন, 'এছাড়া শব্দের ছায়াবাজিতে চালিয়েছি কুহকের মতো কূটতর্ক। অবশেষে আমার চেতনায় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে খুঁজে পেলাম পবিত্রকে)।' (Délires Alchimie du Verbe/ লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ)'।

সে বছরের আগস্ট শেষে তিনি প্যারিসে জনপ্রিয় কবি ভের্লেনের কাছে পাঠান 'স্বরবর্ণের সনেট'। বিশ্বসাহিত্যের বহুল আলোচিত কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নে পরিবেশিত হলো :

'আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ ও নীল স্বরবর্ণ, একদিন তোমাদের গাঢ় পরিচয় শোনাব; আ কৃষ্ণ নীবিবাস, ক্রুর-পুঁতিগন্ধময় রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্ফীত করে, খিল ...' (লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ)।

এ সময় লিখলেন আরেক বিখ্যাত কবিতা ''Le bateau ivre'' তথা মাতাল তরণী। ভের্লেন বাচ্চা কবির পাকা ভাবনা দেখে নিজেই মাতাল হয়ে পড়লেন। যাতায়াত ভাড়া দিয়ে র‍্যাঁবোকে নিয়ে যান প্যারিসে এবং আশ্রয় দান করেন। র‍্যাঁবো প্যারিসে ছোটবড় বহু কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কারো কারো সঙ্গে করেন খারাপ ব্যবহার। পরের বছর ভের্লেনের সঙ্গে ব্রাসেলস আর লন্ডন ভ্রমণ করেন। একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়ার ফলে ভের্লেন তাঁকে গুলিতে আহত করেন এবং দু'বছরের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। এরপর র‍্যাঁবো তাঁর বিখ্যাত *নরকে এক ঋতু* রচনা করে বেলজিয়ামে ছাপতে দেন (যা অনেক দিন পড়ে থাকে এবং ১৯০২ সালে আবিষ্কৃত হয়)। এরপর তিনি লেখেন *Illumination* (আলোকসজ্জা)। নুভো নামে স্বল্প পরিচিত এক সাহিত্যকর্মীর সঙ্গে লন্ডনে আসেন। এ সময় তিনি ইতালি, অস্ট্রিয়া এবং হল্যান্ডও ভ্রমণ করেন। ডাচ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাটাভিয়া যান এবং সেখান থেকে পালিয়ে যান (১৮৭৬)। এরপর মিসর ও সাইপ্রাসে কাটান দুই বছরের কিছু বেশি সময়। কড়া শাসনের কর্ত্রী মায়ের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ে বিরোধ ঘটে, এ সময়ে তা মেটান। একটা কোম্পানির কাজ নিয়ে তিনি ইথিওপিয়ায় অস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। সেখানকার দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণের এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন কায়রোর এক পত্রিকায়। ১৮৯১ সালে অসুস্থ হয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং বিয়ে করেন। কিন্তু ক্যান্সার ছড়ানোর আশঙ্কায় তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়। মার্সেই নগরীতে বোন ইজাবেলের বাহুতে মাথা রেখে র‍্যাঁবোর দ্রোহী আর এলোমেলো জীবনের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য যে, তার আগে তিনি ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করেন।

উনিশ শতকটি ছিল ফ্রান্সে বহু প্রতিভার আবির্ভাবধন্য। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ঘটে, সামাজিক বিপ্লব আর বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক সীমারেখা পরিবর্তনের প্রয়াস। মাত্র চার-পাঁচ বছরের কবি-জীবনে র‍্যাঁবো অনেকটা ভিন্ন আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যা তাঁর 'Derniers Vers' (১৮৭২ শেষ পঙক্তিমালা), ও 'Alchimie du Verbe' এ উক্ত। একদিকে তিনি চান la rigueur logique de l'experience 'অভিজ্ঞতার শক্ত যৌক্তিক কাঠামো' আর অনুরাগীরা তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছেন la fraicheur féroce, যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি 'বেগবান স্নিগ্ধতা'। এটা র‍্যাঁবোর একান্ত নিজস্ব সম্পদ, তাঁর আবিষ্কার। র‍্যাঁবোর নানা 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস' আমরা উত্তরসূরি বাঙালি নজরুলের দ্রোহে, সাম্যবাদী সুকান্তের শ্রেণী-সংগ্রামের বার্তা নতুন উচ্চারণে শুনতে পাই। কিন্তু র‍্যাঁবোর আত্মপরীক্ষার যে রহস্যময় জ্ঞানের সন্ধান উন্মোচিত, তাতে ফ্রান্সের পল ক্লোদেল, ইংল্যান্ডের ডব্লু বি ইয়েটস, জর্মনির স্টেফান জর্জ, ফেমানসথাল প্রমুখ কবি-বুদ্ধিজীবী প্রভাবিত হন। দৃশ্যমান বাস্তবতার বাইরে অন্য এক জগত, যা কার্যকারণের অপেক্ষায় না থেকে নিয়তি নির্ধারণ করে দেয় তাতেই তাঁরা আকৃষ্ট। তাছাড়া ইংরেজ উলিয়াম ব্ল্যাক, ফরাশি লোত্রেয়ামোঁ এবং জর্মন রেইনের মারিয়া রিলকের কথা বলা যায়, যাঁরা র‍্যাঁবোর 'দ্রষ্টা' ভাবনায় অধিকতর আগ্রহী। অঁদ্রে জিদ তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন, র‍্যাঁবো পড়ার পর তাঁর নিজের ও অন্যদের লেখার ওপর তিনি বিরক্ত ও লজ্জিত। আমরা দেখেছি র‍্যাঁবোর দ্রোহ সমাজ, নৈতিকতা এমন কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও। তাঁর বিশ্বাস ছিল শিল্পে এর সমাধান মিলবে। তাই তিনি বলছেন,

'Et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice. j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la perfection..... (Nuit de L'enfer) এবং বলা যায় আমি সত্যকে ধরে আছি, ন্যায়বিচারকে প্রত্যক্ষ করি : আমার বিচার নির্ভরযোগ্য এবং অটুট। আমি সিদ্ধিলাভের জন্য প্রস্তুত। (নরকের রাত)।

জার্মান কবি হুগো ফ্রিডরিশ সযত্নে র‍্যাঁবো প্রদর্শিত পথে কল্পনাশক্তির প্রচণ্ড ক্ষমতাকে, বাস্তবতার বিনশ্বরতাকে এবং অমানবিকীকরণের প্রক্রিয়াকে অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছেন। একইভাবে ফরাশি করবিয়ের, লাফার্গ, ভালেরি (তাঁর গদ্য রচনায়), জার্মান ট্রাকল, বের্টোল্ড ব্রেশট কিংবা আমেরিকান হার্টক্রেন করেছেন র‍্যাঁবোর প্রভাব অনুভব। এভাবে চলেছে র‍্যাঁবো অনুসরণ ও র‍্যাঁবো অনুবাদ। কবিতাক্ষেত্রে সে সময় থেকে যে প্রতীকবাদ, পরাবাস্তবতাবাদ ও দাদাবাদ প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটে সবক্ষেত্রে কিশোর ফরাশি কবিটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন, অধুনা যে উত্তর-আধুনিকতাবাদ এর প্রচলন হয়েছে তাতেও র‍্যাঁবো রয়েছেন।

বাংলায় র‍্যাঁবো সংক্রমণ কবে থেকে এবং কে কে তাঁর অনুবাদক? আমার কেন

জানি মনে হচ্ছে, সত্যেন দত্তও তাঁর অনুবাদ করেছেন। তবে জানা মতে, খুব বিখ্যাত কাজটি করেছিলেন আমার অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু ড. লোকনাথ ভট্টাচার্য। আকারে ছোট হলেও ১৯৫৪ সালে তাঁর অনূদিত *নরকে এক ঋতু* খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর আমাদের দেশে ১৯৯১ সালের শিশির ভট্টাচার্য *খ্যামবো* নামে একটি চিত্রসম্বলিত মূলানুগ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এবার ড. বিনয় বর্মন উপহার দিলেন *র‍্যাঁবোর কবিতা/ ত্রিভাষিক সংস্করণ*। বস্তুত তাঁর গ্রন্থের অধ্যয়ন ও আলোচনা সূত্রে আমার এই ক্ষুদ্র রচনা। বিনয় বর্মনের এই বইটি ২০১৩ সালে বাংলাদেশে প্রকাশিত (অবশ্য এখনো বছরের ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়নি) গ্রন্থাবলীর মধ্যে খুবই উচ্চ প্রশংসার দাবিদার হবে, এতে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি বাংলা, ফরাশি ও ইংরেজিতে র‍্যাঁবোর ১১৯টি কবিতাকে স্থান করে দিয়েছেন তাঁর ৪১৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থে। তাঁর ভূমিকায় রয়েছে র‍্যাঁবো সম্পর্কে, বিশেষ করে র‍্যাঁবোর অনুবাদ প্রসঙ্গে বহু তথ্য। তাঁর মতে, বাংলা ভাষায় লোকনাথ ভট্টাচার্য (এবং শিশির ভট্টাচার্য) ছাড়াও যাঁরা 'কাজ' করেছেন তাঁরা হলেন- বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, ভূমেন্দ্র গুহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। বিনয় বর্মনের অনুবাদ আকর্ষণীয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও ভাবানুগ। অনূদিত প্রথম কবিতাটিতে তিনি ফরাশি le déluge কে ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে the flood না করে 'প্লাবন' করেছেন। বলাবাহুল্য, তা যথার্থ হয়েছে। তাছাড়া র‍্যাঁবোর কবিতার ফর্মকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস পেয়েছেন- 'অর্থাৎ পদ্যকে পদ্যে এবং গদ্যকে গদ্যে' অনুবাদ করেছেন 'চরণ-স্তবক-অনুচ্ছেদ বিন্যাস ঠিক রেখে'। এটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল। বর্মনের কথায় 'এখনো কবিতাবিশ্ব র‍্যাঁবোভিভূত, কবিকুল র‍্যাঁবোন্মত্ত'। অনুবাদকের শুভপ্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই।

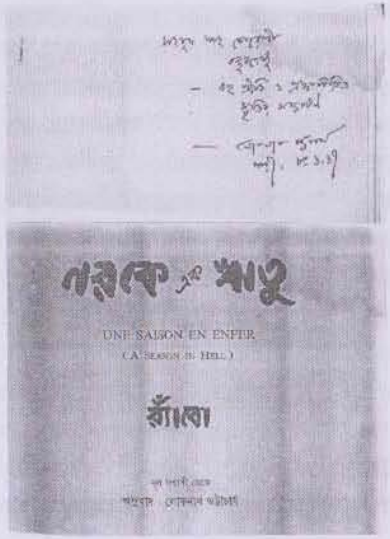

আপলিনের, বিশ শতকের বিশ্বপথিক

'Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers'- Apollinaire
'সমগ্র বিশ্বকে পান করে আমি হয়েছি মাতাল'- আপলিনের

নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথম আধুনিক কবি- বিশ শতকের বিশ্বকবিতার পটভূমিকায়। বোদলের, র‍্যাঁবো ও লোত্রেয়ামোঁর উত্তরাধিকার তাঁকে পথ চলতে সাহসী করেছে অবশ্যই। কিন্তু ঐতিহ্যের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন আপলিনের, যদিও আটকা পড়েননি অতীতাশ্রয়ী চিন্তাভাবনায়। নতুন চেতনা, তাঁর ভাষায় 'লেস্প্রি নুভো' তাঁকে দিয়েছে জীবন ও জগতকে দেখার নবতর দৃষ্টি। ফলে কাব্যশরীরে দেখা গেল অভিনবত্ব। অরুণ মিত্র যথার্থ বলেছেন :

'আপলিনের কাব্যের উপাদানটাই যতদূর সম্ভব সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও নমনীয়। সব রকম বস্তু, সব রকম অনুভূতি ও সব রকম মনোভাব দিয়ে তা গড়া। ইতিহাস, গল্প, জনশ্রুতি, রেস্তোরাঁর কোনো আলাপ, গানের কোনো ধুয়া, কোনো উদ্ধৃতি, কোনো স্মৃতি- এসব নিয়ে তাঁর কবিতার রচনা। অতি দৈনন্দিন, অতি গদ্যময় বিষয়কে কবিতায় রূপান্তরিত করতে যে- ক্ষমতার দরকার সে-ক্ষমতা তাঁর ছিল।'

ধমনীতে এক ফোঁটা ফরাশি রক্ত ব্যতিরেকেও আপলিনের হলেন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে 'খাঁটি ফরাশি'। প্রতীকবাদী কাব্যধারা, মুসসে, নেভাল, লাফর্গ প্রমুখের ঐতিহ্যস্নাত কবিকর্মে ছিল তাঁর একান্ত অধিকার। পূর্বসুরির প্রভাব স্বীকার করেই তিনি এগিয়ে এলেন নতুন কাব্যপ্রয়াসে। বিশেষ করে ছন্দের কারুকাজ ও অন্তর্নিহিত সঙ্গীত সৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট। একদিকে যেমন সর্বশেষ আবৃত্তিযোগ্য ফরাশি কবি হিসেবে তেমনি অন্যদিকে আপলিনের খ্যাতি অর্জন করলেন আধুনিক কাব্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধের উদ্‌গাতারূপে। কবিতার ক্ষেত্রে নয় শুধু শিল্প সমালোচনা, নাটক, গল্প ও উপন্যাস রচনায়ও তিনি দিয়েছেন বিশিষ্টতার পরিচয়। কিউবিস্ট- শিল্পী ও পরাবাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকদের তিনি পরম-পুরুষ। জীবিতকালে তবু কিছুটা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে ছিল তাঁর পরিচিতি। মৃত্যুর পর তাঁকে ঘিরে বয়ে যায় প্রশংসার

ঝড়। ফরাশি-ভাষী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এখনও তিনি অতি প্রিয় বিষয়। ১৯৪৫ সালের পর থেকে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে বলে সাহিত্যের ইতিহাসকাররা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৫৯ সালের ৫ জুন প্যারিসের প্রাণকেন্দ্র স্যাঁ-জেরম্যাঁয় একটি রাস্তার নামকরণ হল 'রু্য গীইয়োম আপলিনের' আর তার মাথায় স্থাপিত হল পিকাসোর ভাস্কর্য।

তাঁর পুরো নামটি মনে রাখার মতো : গীইয়োম- আলবের- ভ্লাদিমির- আলেকসঁদর- আপলিনের কস্ত্রোভিৎজকি। জন্ম রোম নগরীতে ২৬ আগস্ট ১৮৮০, পোলিশ নীল রক্তধারিনী কুমারী ওলগা দ্য কস্ত্রোভিৎজকির অবৈধ সন্তান। বাবা বুরবোঁ বাহিনীর সামরিক কর্মকর্তা ফ্রান্সেসকো ফ্লুগি দাসপেরসো। আন্তর্জাতিক পটভূমি সত্ত্বেও মানুষ হচ্ছিলেন ফরাশি কায়দায়; শৈশব ও কৈশোর কেটেছে মন্টেকার্লো ও নীস শহরে। পনেরো থেকে বিশ বছর বয়সে পড়াশোনার জন্য এমনকি ছবি আঁকার জন্যও বিশটি পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে অনেক ছিল প্রথম পুরস্কার। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌঁছে তিনি লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। কর্মজীবন শুরু করেন ব্যাংকের চাকরি নিয়ে। ১৯০১ সালে তিনি জার্মানি যান এক অভিজাত পরিবারের গৃহশিক্ষকরূপে। একমাত্র ছাত্রীর ইংরেজ আয়ার প্রেমে পড়েন আপলিনের। আয়াটির নাম আনি প্লেয়ডেন। তাঁকে অনুসরণ করে লন্ডনে যান; আনি আপলিনের- এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমেরিকা চলে যান। পরে এই হতাশ প্রেমের স্মৃতি থেকে রচিত হয় কয়েকটি অসাধারণ কবিতার; যেমন- 'মিরাবো সেতু', 'মন্দভাগ্য প্রেমিকের গান' প্রভৃতি।

ব্যর্থ প্রেমিক আপলিনের প্যারিসে ফিরে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সে বিগত শতাব্দী সূচনার কথা (১৯০৪)। উদীয়মান শিল্পী সাহিত্যিকরা যেন তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আপলিনের-এর সঙ্গে দুয়ানিয়ে অঁরি রুসো, দ্যুফি, ব্রাক, পিকাসো, মাতিস, ভ্লামিংক, দেরাঁ প্রমুখ শিল্পীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এ শতাব্দীর শিল্পান্দোলনকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এসময় পিকাসো তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন মারি লোরস্যাঁর সঙ্গে। এই মহিলা শিল্পীর সঙ্গে আট বছর স্থায়ী প্রেমও ব্যর্থ হলো। মারি বিয়ে করলেন এক জর্মনকে। এরপর লুইজ ও মাদলেন নামে দুই মেয়ের প্রেমে পড়েন কবি। লুইজকে নিয়ে 'লু' নামে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লেখেন। মাদলেন-এর সঙ্গে বিয়ের পাকা কথাবার্তাও ভেস্তে গেল। ১৯১৩ সালে আপলিনের অকস্মাৎ বিখ্যাত হয়ে গেলেন। একদিকে প্রকশিত হল তাঁর কাব্যগ্রন্থ, 'সুরাসার' (*Alcools*), অন্যদিকে বেরুলো এক শিল্প সমালোচনা গ্রন্থ। পরবর্তী বছরে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি যোগ দিলেন তাতে। প্রথমে গোলন্দাজ বাহিনীতে, পরে পদাতিক দলে। এই যুদ্ধযাত্রা বাধ্যতামূলক ছিল না আপলিনের-এর ক্ষেত্রে, হয়তো অনিবার্য ছিল তাঁর প্রাণস্পৃহা ছড়িয়ে দেয়ার খাতিরে-নজরুলের মতো। বস্তুত, সমকালীন এই দুই বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মসাধনায় বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দেশকালের দিক থেকে আপলিনেরই প্রথম বাজালেন অগ্নিবীণা।

মাইকেল হামবারগার-এর বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য:

Guillaume Apollinaire continued to make verbal fireworks out of the lethal fireworks of the same war to the bitter end, not least in the ingenious analogies between love and war of his sequence.

Ombre de mon amour (আমার প্রেমের ছায়া)।

১৯১৬ সালের ১৭ মার্চ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হন আপলিনের। শিরস্ত্রাণ ভেদ করে গুলি ঢুকে পড়ে। যুদ্ধযাত্রার অন্যতম কারণ ছিল ফরাশি নাগরিকত্ব লাভ। সেটিও তিনি পেলেন, এবং প্রকাশ করলেন স্মরণীয় কিছু রচনা। ১৯১৮ সালের ২ মে বিয়ে করলেন জাকলিন কলব-কে, তাঁর কাব্যের 'লালচুল সুন্দরী'। কাটল কয়েকটি সুখের মাস। তারপর ৯ নভেম্বর মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হল ক'দিনের 'হিস্পানী সর্দি জ্বরে'। একদিকে নানা না-পাওয়ার বেদনাজাত সূক্ষ্ম বিষণ্ণতা, অন্যদিকে সবকিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার মতো অট্টহাসি- আপলিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর বিচিত্র রচনাসমগ্রের বড় এক অংশ না-শিল্পসম্মত না-জীবনবোধ সম্পন্ন। কেউ কেউ তার কিছু কবিতা ছাড়া বাকিগুলোকে কৃত্রিম মনে করে থাকেন। অবশ্য পরবর্তী ফরাশি কবিকুলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতদের কাছে তিনি 'কবিদের কবি'। বস্তুত বিশ-ত্রিশের দশক রুশ-জর্মন-ইতালীয় বেশ ক'জন কবি কথা বলেছেন তাঁরই ভাষায়।

আপলিনের-এর কবিসত্তা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম। কিন্তু সমকালে তিনি একজন জনপ্রিয় গদ্য লেখকও ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও নাটক নিয়ে সেকালে কম হুলস্থূল হয়নি। তাঁর বেশ ক'টি উপন্যাস রয়েছে যেগুলো অসম্ভব রকমের অশ্লীল। তবে শতাব্দী শুরুতে আধুনিক শিল্পকলার উন্মেষের সঙ্গে তিনি ছিলেন জড়িত। সব ক'জন স্বনামখ্যাত শিল্পী- পিকাসো, ব্রাক, দেরাঁ প্রমুখ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিউবিক শিল্প পদ্ধতির থিয়োরি তিনিই প্রথম লেখেন। তাছাড়া শিল্পকলা ও সমকালীন সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপনে তিনি ছিলেন খুবই সক্রিয়। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে তাঁকে নিয়ে নতুন করে লেখালেখি শুরু হয়েছিল এবং তাঁর কিছু বইপত্রের বিশেষ সংস্করণ অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি হয়েছে। তাঁর বইপত্র নিয়ে বাংলায় ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার। আপলিনের-এর প্রথমদিকের একটি রোমান্টিক কবিতার অনুবাদ দিয়ে শেষ করি এই আলোচনা :

মিরাবো-র সেতুর নিচে বয়ে যায় সেন এবং আমাদের প্রণয়
এও তো স্মরণের দাবিদার : আনন্দ আসে যন্ত্রণার পর সব সময়।
আসে রাত্রি, প্রহর শেষ দিন চলে যায়, আমি থাকি স্থির, অচল।
হাতের পর হাত রাখি চলো থাকি মুখোমুখি
ততক্ষণ (আমাদের) বাহুর সেতুর নিচে পার হয়ে যাক
শাশ্বত দৃষ্টি আর শ্রান্ত তরঙ্গ। আসে রাত্রি, প্রহর শেষ।
দিন চলে যায়, আমি থাকি স্থির, অচল।

প্রেম চলে যায় যেন এক চলিষ্ণু জলধারা
প্রেম চলে যায় কেমন নিশ্চল জীবন,
অথচ কি অদম্য আশা! আসে রাত্রি, প্রহর শেষ
দিন চলে যায়, আমি থাকি স্থির, অচল।
দিন যায় এবং সপ্তাহ আসে না ফিরে আমাদের প্রণয় আর বিগত সময়
মিরাবো-র সেতুর নিচে সেন বয়ে যায় আসে রাত্রি, প্রহর শেষ
দিন চলে যায়, আমি থাকি স্থির, অচল।

উৎসবের কবি স্যাঁ-জন পের্স

বছর ঘুরে এলো, উৎসবের কবি স্যাঁ- জন পের্স ইহজগতে নেই। গত বছর বিশে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ভার এলাকায় জিয়-তে স্বগৃহে দেহরক্ষা করেছেন এই প্রখ্যাত কূটনীতিক কবি। তাঁরই ইচ্ছানুসারে এই খবর প্রকাশ করা হয় মৃত্যুর দুদিন পর, শেষকৃত্যের সময়। শেষকৃত্য সমাপ্ত হয়েছিল একান্ত আপনজনদের নিয়ে, চিরাচরিত আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে। সবগ্রামেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল অষ্টাশি বৎসর। ১৯৬০ সালে যখন তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন তখন ঠিক বিগত বছরটিতে প্রায় অজ্ঞাত এক ইটালীর কবি যেমন এই বিখ্যাত পুরস্কারের বিজয়ী ঘোষিত হয়েছেন– অন্যত্র যেমন ফ্রান্সেও তেমন খোঁজ পড়ে গেল, কে এই কবি? অনেক ফরাশি বন্ধু ও অধ্যাপক প্রকাশ্যে কিংবা ব্যক্তিগত আলাপে সুইডিশ একডেমির ফরাশি-প্রীতিই যে এই দুর্ঘটনার কারণ তা প্রকাশে সংকোচ করলেন না। স্মৃতি ছাড়াও প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধে তার নজীর রয়েছে। কিন্তু তাঁর গুণগ্রাহীরাও তৎপর হলেন সত্বর। তাঁরাও যাকে বলে 'সোচ্চার' হলেন এই বিরাট প্রতিভার বিবিধ পরিচয় লোকসম্মুখে তুলে ধরতে। প্রচারবিমুখ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সহসা উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। দেখা গেল, এ শতকের বিশেষ বছরগুলো থেকে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি - মৌলিক কবি প্রতিভার স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিশ্বের অনেক কবি-মণীষীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ইংল্যান্ডে এবং বলা চলে তাঁরই আগ্রহে অঁদ্রেজীদ গীতাঞ্জলি অনুবাদে ব্রতী হন। তাঁর নিজের কাব্য অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন ভাষার বরেণ্য কবিবৃন্দ। তাছাড়া তিনি হলেন খ্যাতিমান কূটনীতিজ্ঞ, অবসর গ্রহণের দীর্ঘদিন পরও আমৃত্য তাঁর দেশের বিশেষ নিয়মানুযায়ী ফরাশি রাষ্ট্রদূতের সরকারি মর্যাদায় সমাসীন। স্বদেশি উপনিবেশের এক দ্বীপে তাঁর জন্ম, ১৮৮৭ সালে, এক প্ল্যান্টার পরিবারে। আসল নামও পরিচিত নামের মত বিদঘুটে: আলেক্রিস স্যাঁ-লেজে লেজে। অঁতি-দ্বীপের উষ্ণ ট্রাপিক্যাল আবহাওয়ায় প্রকৃতির মহাসমারোহে কেটেছে তাঁর

শৈশব, (স্তুতি) কাব্যে তার পরিচয় বিধৃত। কৈশোরেই অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে তাঁর পরিবার 'বহির্সামদ্রিকে ফরাশি দেশ' ছেড়ে মূল ভূখণ্ডে চলে আসে। পো-অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেন। বরদ্যোতে আলেক্রিস উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন আইন, প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে। ১৯০৯ সালে তাঁর 'লেজিমাজ আলেক্রিস' এবং 'এলজ্' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাসিস জমি, ক্লোদেল রিভিয়ের প্রমুখ প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯১৪ সালে পররাষ্ট্র দপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি কূটনৈতিক কর্মে যোগদান করেন। অতঃপর চীন ও বহির্মোঙ্গলীয়ায় দীর্ঘ অবস্থান এবং উদ্ভিদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক অভিযান তাঁর কবিজীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। ১৯২২ সালে প্রকশিত 'আনাবাজ' কাব্যের উৎস এসবেই নিহিত।

ঐ একই বছরে তিনি ওয়াশিংটনে কিছুদিন কাটিয়ে পরে পারী প্রত্যাবর্তন করেন এবং পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেণ। ক্রমেই এতে তিনি এতই নিমজ্জিত হয়ে পড়েন যে ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ সাল অবধি সাহিত্যকর্ম থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকেন। ১৯৪০ সালে নাজীদের সঙ্গে সন্ধির বিরোধী হওয়ার ফলে তাঁকে সরিয়ে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এই পদ গ্রহণে অস্বীকার করে তিনি গোপনে ইংল্যান্ড চলে যান এবং সেখানে থেকে পরে পাড়ি দেন আমেরিকায়। বস্তুত এই সময় থেকে তিনি প্রায়- অবসরপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘকাল ওয়াশিংটনে লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে 'ভারপ্রাপ্ত গবেষক' রূপে তাঁর নির্বাসিত জীবন কাটে। তাঁর এগ জিল (নির্বাসন) কাব্য এ সময়ের রচনা। ১৯৫৭ সালে তাঁর আমের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় তিনি প্রথম ফ্রান্সে আসেন। ১৯৫৮ সালে তিনি এক মার্কিন মহিলার পানি গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর থেকে ফ্রান্সে নতুন করে বসবাস করতে শুরু করেন।

অশৈশব রুটিন মাফিক পড়াশোনা ছাড়াও স্যাঁ-জন পের্স উদ্ভিদ বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি গভীর আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করেছেন। বৃহৎ বিশ্বে ভ্রমণ ও কর্ম ব্যতিরেকেও সময়ের প্রয়োগগত দিক নিয়ে তিনি নানা চিন্তাভাবনা করেছেন, হাতে- কলমে কাজ করেছেন। সাতসমুদ্রে তিনি একক ও যৌথ নৌভ্রমণের দক্ষ নাবিক হিসেবেও পরিচিতি অর্জন করেছেন। খগোল, শাস্ত্র পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিতেও তাঁর জ্ঞান অগাধ। বলা চলে, জ্ঞানের সব শাখায় অব্যাহত তাঁর সতত সঞ্চরণ যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি তাঁর কাব্যে এসবের অনুভবযোগ্য উত্তাপ এবং স্বাভাবিক সংক্রমণ।

স্যাঁ-জন পের্স সহজ কবি নন শক্ত কবি-ই বরং। তাঁর কাব্যের আবহ ও বাকপ্রতিমা গড়ে উঠেছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পটভূমি এবং মানুষের জ্ঞান-চর্চার প্রকাণ্ড পরিসর থেকে। বস্তু-সত্ত্বাকে তার যথার্থতায় আবিষ্কার, এই মহা-স্বাপ্নিকের ব্রত। তাঁর শব্দ ভাণ্ডার দূরাগত কিন্তু সুচিহ্নিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। বর্ণনাত্মক না হয়েও নানা দুরূহ বিষয়ের দুর্লক্ষ্য বস্তুর বিবরণদান তাঁর পক্ষে সহজ

এবং এই ঘনবদ্ধভাব তাঁর পছন্দসই। সঙ্গীত আবহ ও অবয়বের আশ্চর্য অভিনবত্ব স্যাঁ-জন পের্সের কবিতার বিশিষ্ট অনবদ্য রূপ। কিন্তু তারও অধিক তাঁর কাব্য বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীতে যে শাব্দিক যথার্থতা পরিস্ফুট তা স্থানকালপাত্র অনির্ধারিত রেখে অনির্বান মহাকাব্যিক আলোকের চিরায়ত সৌন্দর্য বহমান রাখতে সচেষ্ট ও সমর্থ বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাঁর কাব্য-বিষয়ের সময়কাল কী? আনাবাজের বিজয়ী-ডিক্টেটর কে? আমেরে কোন অনন্ত নদীর কথা বলা হয়েছে? এসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়া সহজ নয়। ভাষার যাদুকর স্যাঁ-জন পের্স প্রয়োগকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাঁর বিবিধ কাব্যগ্রন্থে। ফরাশি ভাষার সমস্ত ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যকে তাঁর কাব্যশরীরে উপস্থিত করেছেন তথাকথিত অধ্যুষিত শতবর্ষের ব্যবহারক্লিষ্ট নিশ্চিত, গাম্ভীর্যময় এক নতুন ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তদতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে স্যুররেয়ালিস্ত ভঙ্গীতে বস্তু বিশ্বের বর্ণাঢ্য চিত্ররূপ। এক নতুন নান্দীপাঠে উৎসবমুখর করে তুলেছেন স্যাঁ-জন পের্স।

মৌল প্রেরণার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম তাঁর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। প্রথাগত বিষাদ অ-সুখের সাধনা নয়, সুখসন্তুষ্টি উৎসবই তাঁর কাব্যবীণায় বেশি ধ্বনিত। এ জন্যেই বিষয়বস্তু বা বিস্তর প্রশংসা-স্তুতি তাঁর কাব্যশরীরের গভীরে প্রবহমান। প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে তাঁর এক উদ্ধৃতি : 'প্রশংসা করা মানে ভালো করে নিঃশ্বাসটানা'। অর্থাৎ যথার্থভাবে বাঁচা- যা কবির অনিষ্ট। মালার্মে ও ক্লোদেলের ভাবশিষ্য স্যাঁ- জন পের্স মনে করেন, কবির দায়িত্ব মানবজাতির ওপর অর্পিত সব দায়িত্বের শীর্ষে। বিশ্বকে বাণীবন্ধনে আবদ্ধ করে তার সমস্ত সৌন্দর্যের উন্মোচন কবির কাজ। জন্মভূমির অবারিত নিসর্গের স্মৃতি তাঁকে এক উৎসবমুখর প্রকৃতির কবি রূপে চিহ্নিত করেছে (অঁতিয়ের সে- দ্বীপে তিনি অবশ্য আর কোনো দিন ফিরে যাননি)। কিন্তু শুধু দ্বীপপুঞ্জের মায়াবী প্রকৃতি নয় মধ্যএশিয়ার মরুভূমিও তার আশ্চর্য ধুসরতায় তাঁর কাব্যে যথার্থ ব্যঞ্জনায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু বর্ণনা নয়, প্রকৃতির আসল স্বরূপ এবং যাবতীয় রহস্যের অনুধাবনই তাঁর লক্ষ্য। মঙ্গোলীয়ার মরুভূমি হোক, প্রশান্ত অথবা অতলান্ত মহাসমুদ্রই হোক, কৃষ্টি অথবা বরফ পড়ার দৃশ্যই হোক, এহ বাহ্য বরং আরো গভীর এবং অনেক অন্তরঙ্গভাবে নিজেদের মধ্যে আমরা যে মরুভূমি কিংবা সমুদ্র ধারণ করে রয়েছি ভাব-তন্ময়তায় স্বপ্নমুগ্ধতায়, সে অনুভূতির মননজাত প্রকরণই তাঁর কাব্য-শিল্পের বিশেষ প্রবণতা।

দিগন্তছোঁয়া সমুদ্রের ঢেউ শুধু দৃষ্টির তৃপ্তি ঘটায় না কিংবা বর্ণনায় চিত্ত সুখকর হয় না, এতে মানবমনের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, অমিত শক্তি- যা মানুষকে তার সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে মুহূর্তে উৎক্ষিপ্ত করে ফেলতে পারে- এসব কিছু বহুধাবিস্তৃত প্রতীকরূপেও ব্যবহৃত। শুধু বাতাসের উপমা থেকে চিত্ত, উগ্রতা, পবিত্রতা, ভ্রমণ প্রভৃতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রহস্যময় মানুষের ভাবমূর্তিটিকে স্পষ্ট করে তোলে।

এই রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস সফল হলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ কবি উৎসব উদযাপনে আগ্রহী হয়ে পড়েন। বস্তুত, উৎসবের মাধ্যমে নিত্য-নৈমিত্তিকতায় অনির্বচনীয়তার

সন্ধান লাভ করা যায়, অপার্থিবতার আভাস লক্ষ্যযোগ্য হয়ে পড়ে। উৎসব মানুষের আদিম স্বকীয় লক্ষণ, আচার ও সংস্কৃতির উৎস। উদযাপন ব্যস্ত মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবে তার নতুন সত্তার আবিষ্কার হয়ে পড়ে চূড়ান্তভাবে উপভোগ্য। এ ভাবে নিজের বয়োবৃদ্ধিকেও কবি মহাকালের উৎসবে পরিণত করেন এবং তা উদযাপনের ব্যবস্থা নিস্পন্ন করেন। ফলত তাঁর কবিতা স্তোত্রও নান্দীর গুণাগুণে অভিষিক্ত এক গুরুগম্ভীর সাঙ্গীতিক নাঁদ যেন এতে অভিশ্রুত। অতি দূর, পুরাতন অতীত হতে যেন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও পবিত্রতা আনয়ন করে কবি পরিবেশন করছেন এই পৃথিবীতে। গদ্যময় রুক্ষ পৃথিবীতে কবিতার বারিসিঞ্চনে ঢেউয়ের দোলায় অনুভূতি প্রদান তাঁর অভিপ্রেয়। এক উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদী 'হাই স্টাইল' তাই স্যাঁ-জন পের্সের কবি-প্রতিভার অঙ্গীভূত।

সতের বছর ধরে যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য জগতের মধ্যমণি, ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করেছেন তিনি এবং এই উচ্চাদর্শের কিছুটা হিরোয়নিক বা সনাতনী কবি-প্রতিনিধি যে এক ব্যক্তি একথা ভাবতে অবাক লাগে। অথচ এটাই সত্য এবং অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিতান্ত উপেক্ষার সাথে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অভিহিত করেছেন 'সখের আস্তাবল' রূপে। নীৎসের নিহিলিজমে দীক্ষাপ্রাপ্ত পের্স নিজেকে প্রশ্ন করেন এবং জবাব পান নৈঃশব্দ্য, শূন্য থেকে গড়ে তুলতে চান শ্রেয়স মানবভাগ্যকে রূপান্তরিত করতে অভিলাষী মানসশক্তির অদম্যতায়। রবীন্দ্রনাথের বলাকায় শ্রুত 'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে'-র প্রতিধ্বনি তাঁর আনাবাজের উপনিবেশে সহজলভ্য, কিন্তু সবচেয়ে যা উল্লেখ্য তা হলো, কবি শ্রদ্ধাপ্লুত এবং উৎসবমুখের তখন যখন বিপ্লব ও নবীনতায় বিশ্বমানবতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

স্যাঁ-জন পের্সের কবিতার অংশ বিশেষ:

প্রেম-ভালোবাসা যা আমার জন্মের চিৎকার
ধরে রাখে অতি উচ্চে,
সমুদ্র এগিয়ে যায় প্রেমিকার পানে
আঙ্গুরপাতা কাঁপতে থাকে তার তীরে
ফেনায় আচ্ছাদিত বেলাভূমি
সঙ্গীত শ্রুত বালুকা রাশিতে
অভিবাদন, স্বর্গীয় উন্মাদনাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

[AMERS/SEAMARKS: Bilingual edition, Pantheon books, 1958 p.102]

"সুন্দর সঙ্গীত, সুন্দর সঙ্গীত,
এই যে ধাবমান জলের ওপরে ..."
এবং আমার কবিতা, আহা বৃষ্টি, আর যে লেখা হবে না!
...

এলো রাত, দরজা বন্ধ, আকাশের জল
নিচের কাঠের সাম্রাজ্যে পড়ে
কী ওজন দেখাবে
পৃথিবীতে আমার অংশে নির্দেশিত হবে! ...
এবং সবকিছু সমান হলে, মনের নিক্তিতে
আমার হাসির ভয়ংকর প্রভু তুমি আজ সন্ধ্যায়
বদনামিকে সবচে ওপরের অবস্থানে নিয়ে যাবে।
...
তাতেই তোমার আনন্দ, প্রভু
কবিতার শুষ্ক ভূমিতে আমার অট্টহাসি
খ্যাতির সবুজ ময়ুরকেও দেয় ভয় পাইয়ে।

[*EXILE AND OTHER POEMS*, Pantheon Books, 1949 p. 76]

ঋণ স্বীকার : ল মোঁদ পত্রিকায় ২৪-৯-১৯৭৫ তারিখে প্রকাশিত জ্যঁ ওনিম্যুসের প্রবন্ধ। পৃ. ৫০-৫১

রজে কাইওয়া: পাঠযোগ্য পাথর

ফরাশি সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচে সম্মানিত, শক্তিধর রজে কাইওয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে ১৯৬১ সালে। সর্বনের অধ্যাপক লুই রনু আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখা আমার ফরাশি প্রবন্ধটি প্রকাশ করা যায় কিনা দেখার জন্য। কাইওয়া সেটি ইউনেস্কো *কুরিয়ের* সম্পাদক স্যান্ডি কফলারের কাছে পাঠিয়েছিলেন যিনি পরে আমার কাছ থেকে একটি ইংরেজি অনুবাদও আদায় করলেন।

ইউনেস্কোর সাহিত্য বিভাগ পরিচালকরূপে কাইওয়া তখন বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদের ভাণ্ডার বর্ধিত করবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ বৈঠকের আয়োজন করলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন প্রভাষক এবং গবেষকরূপে তাতে আমার একটু ঠাঁই হলো। দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী ও ঢাকার বাংলা একাডেমীর দুটি তালিকা থেকে অগ্রাধিকার বাছাই আর অনুবাদক খুঁজে বের করা এইসব বৈঠকের দায়িত্ব। ইংরেজিতে দেবেন ভট্টাচার্যের কয়েকটি অনুবাদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লাল সালু* এবং আমার ওপর চাপল ফরাশি ভাষায় বাংলা মরমী কবিতা সংকলনের কাজ। এছাড়া আরো কয়েকটি বই বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত হলো যেমন, জসীম উদ্দীনের *সোজন বাদিয়ার ঘাট* -এর একটি মার্কিন অনুবাদ।

ইতিমধ্যে রজে কাইওয়া, তাঁর ইংরেজি ভাষার সহযোগী মিল্টন রোজেনথাল, সচিব মাদাম মামনতফ এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সৌহার্দ্যময় হলো। ১৯৭৭ সালে কাইওয়ার সঙ্গে তাঁর বাস ভবনে শেষ সাক্ষাৎ। ইতিমধ্যে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন এবং ফরাশি একাডেমীর নির্বাচিত সদস্য। কাইওয়ার চার পাঁচটি গ্রন্থ এখনও আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কাইওয়া একজন আগ্রেজে দ্য গ্রামের, একোল নরমাল স্যুপেরিয়র-এর সাবেক ছাত্র, একোল প্রাতিক দেজেত্যুদ এর ডিপ্লোমাধারী। তাঁর স্ত্রী চেকোস্লাভিকিয়ার শরণার্থী আলেনা ভিশরোভার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ জন্মে। কেননা, তিনি প্রাগের বাংলা বিশেষজ্ঞ ও আমার বন্ধু

দুশন জ্ভাবিতেল-এর পরিচিতা।

কাইওয়া কাব্যতত্ত্ব, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান থেকে মিনেরোলজি, সৌন্দর্য বিজ্ঞান থেকে প্রাণিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগে পারদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি নিজেও ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় শরণার্থী। পরবর্তীকালে ইউরোপে ঐ এলাকার সাহিত্যের প্রচার ও প্রকাশে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফরাশি কবি সঁ্যা'-জন পের্স-এর ওপর তাঁর লেখা, কবিতার ব্যাখ্যা ও চিঠি-পত্রের সংকলন খুবই প্রভাবশালী রচনা।

এখানে দৈনিক ল্য মোঁদের বিশেষ প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত (৩০ জুলাই, ১৯৬৬) -র আল্যাঁ বসকে-র "রজেঁ কাইওয়া ও কল্পনাবৃত্তি"র প্রথমাংশের অনুবাদ উপস্থাপন করছি :

"অযৌক্তিকতা বিষয়ক অধ্যয়নে রজে কাইওয়ার অনন্য অবস্থান সর্বজ্ঞাত। বিশ বছর ধরে সহানুভূতি এবং সানন্দে এক অসাধারণ রচনা কুশলতায় কবিতার সারবস্তু নির্ণয়ে, স্বপ্নের ব্যাখ্যায়, খেলাধুলার উন্মত্ততা, উদ্ভটত্বের গোলকধাঁধায় তিনি জড়িয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে যৌক্তিক মানুষের ওপর সমাজবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিটির বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যেখানে খেয়াল খুশি মত এবং যথার্থ লেখা তিনিই জানেন কতদূর গেলে তিনি উন্মার্গগামী হবেন না বা ইপ্সিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবেন না। এর মধ্যে বুঝতে হবে যে, চিত্তবৃত্তির প্রত্যেকটি দিকে রজে কাইওয়ার সহানুভূতি নিবিড় না হয়ে পারে না। তবে এতে সবসময় বিশ্লেষণ করা, বুঝে নেওয়া যেমন আছে তেমনি বহু অতিশয়োক্তি আর ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ-কথাও রয়েছে। কখনো বিপথে পাঠিয়ে পরে তিনি হলেন অসামান্য ব্যাখ্যাতা ও প্রকৃত নির্দেশক।"

পাঠযোগ্য পাথর

অক্তাভিও পাজ

[পাথর কি কখনো পাঠযোগ্য হয়? এমন কি সংগ্রহের বস্তু? কিংবা পাথর নিয়ে কি কেউ কবিতা লিখতে পারেন? ফরাশি আকাদেমির সদস্য, প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক রজে কাইওয়া (Roger Caillois) হয়তো মনে করতেন পাথরও পাঠযোগ্য। সংগ্রহ তো করতেনই। তাঁর 'পাথর' নামে কবিতার বইটি ছেপেছেন ফ্রান্সের সেরা প্রকাশক গালিমার। তাঁর সে রচনা কবিতা কি প্রবন্ধ তা অবশ্য নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। কাইওয়া এক অনন্যসাধারণ আন্তর্জাতিক সাহিত্যব্যক্তিত্ব। তাঁর আগে-পরে এতোবড়ো মাপের মানুষকে ইউনেস্কো তাদের সাহিত্য বিভাগ-প্রধানরূপে পায়নি। ১৯৭৭ সনে প্যারিসের পোঁপিদু যাদুঘরে তাঁকে এক জমজমাট সাহিত্য আসরে দেখার সৌভাগ্য হয় এই তর্জমাকারের। পরের বছর তাঁর অকাল মৃত্যু (২১.১২.৭৮)-র পর, এই প্রথমবার ইউনেস্কো, সর্বন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মিলে প্যারিসে তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সভাপতিরূপে বিগত ১৩ মে প্রথম অনুষ্ঠানটিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মেক্সিকোর কবি অক্তাভিও পাজ পাঠ করেন একটি প্রবন্ধ: "পাঠযোগ্য পাথর"। পরদিন 'ল মোঁদ' পত্রিকা গুরুত্ব সহকারে পুরো প্রবন্ধটি প্রকাশ করে। হিস্পানী থেকে ফরাশিতে অনূদিত এই দুরূহ অথচ মূল্যবান প্রবন্ধটি যথাসাধ্য অবিকল ভাষান্তরের প্রয়াস পাচ্ছি। একই সঙ্গে রজে কাইওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পাজের প্রাবন্ধিক-প্রতিভার নমুনা প্রদর্শন আমাদের বিনীত অভিপ্রায়।– তর্জমাকার– মাহমুদ শাহ কোরেশী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

১৯৪০ সালে আমার হাতে এসে পড়লো একটি বই। লেখক একজন তরুণ ফরাশি, যুদ্ধ আর নাৎসী অধিকারের কারণে বুয়েনোস এয়ারেস-এ শরণার্থী। লেখকের নাম রজে কাইওয়া আর বইটি হলো *ল মিথ এ ল'ম্* (মিথ ও মানুষ)। দেশত্যাগী লেখকদের ছোট্ট একটি দল তৈরি হয়েছিলো বুয়েনোস এয়ারেস্-এ। 'সু' পত্রিকা ও তার সম্পাদক ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোকে ঘিরে রইলো এই দল। এরকমের আরো দল ছিলো ন্যু-ইয়র্কে, মেক্সিকোয়। কিন্তু বুয়েনোস এয়ারেস্-এর দল ছিলো সবচাইতে তৎপর। তাদের একটি মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছিলো 'লা লেৎর ফ্রঁসেজ্' নামে; তাছাড়া তাঁরা নানা লেখক যেমন, স্যাঁ-জন্ পের্স, সুপেরভিয়েল্ প্রমুখের বই-ও ছেপে বার করছিলেন। রজে কাইওয়া ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের হোতা। প্রচুর বিস্ময় ও লোভ নিয়ে আমি তাঁর বইটি পড়লাম। বড়জোর বছর খানেকের বড় হবেন তিনি আমার চেয়ে, কিন্তু তাঁর চিন্তাশক্তির শৃঙ্খলা, ভাষার শুদ্ধতা এবং বিদ্যাবত্তা আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখলো।

কাইওয়ার বইটি আমার কাছে ছিলো যেন একই সঙ্গে আবিষ্কার এবং সাক্ষাৎকার। আবিষ্কার আইডিয়ার নতুনত্বের জন্য। আর সাক্ষাৎকার কারণ তাঁর

অন্বিষ্টবস্তু ও বিষয়াবলীর অনেকগুলিই ছিলো আমারও অন্বিষ্টবস্তু ও বিষয়াবলী। যদিও তিনি তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন অনেক স্পষ্টভাবে আর অনেক বড় পরিপ্রেক্ষিতে। যা আমার কাছে সন্দেহ ও শঙ্কার বিষয় তা তাঁর বইতে পরিষ্কার প্রস্তাব ও সাহসী প্রত্যুত্তরের কাঠামোতে পরিবেশিত।

এতে অবাক হবার কিছু নেই যে আমার মেক্সিকান একাকিত্বের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে এক স্বতঃস্ফূর্ত একত্ববোধে আমি কাইওয়ার ভাবধারার সঙ্গে নয় বরং তাঁর মনোভঙ্গীর সঙ্গে পর্যাপ্তভাবে যুক্ত বোধ করলাম। ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোলের কারণে বিচ্ছিন্ন হলেও আমরা হলাম একই প্রজন্মের মানুষ। তখন আমাদের কতইবা বয়স- বিশের কিছু বেশি। আমাদের যৌবন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং মানব সভ্যতার মহাসংকটের সমসাময়িক। তাছাড়া আমরা একইভাবে তাড়িত ও আলোকপ্রাপ্ত হয়েছি পরাবাস্তবতার প্রকাণ্ড বিস্ফোরণে।

সে যুগে আমাকে একান্তভাবে বিমুগ্ধ করে রাখা একটা গোলকধাঁধা থেকে আমি সবে পথ খুঁজে পেতে শুরু করেছি। আর তা হলো, মিথ জাত সৃষ্টি এবং কাব্যপ্রয়াসের সম্পর্ক। কাইওয়া যে- বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন তাদের একটি এই সমস্যাটির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত: 'ধর্মীয় খোলস' যা যুগপৎ শব শোভাযাত্রা ও অভিশপ্ত নারীর হাস্যকর পরিস্থিতির স্মৃতিবহ। মানব অস্তিত্বের মতো প্রাচীন এই মিথ আধুনিক যুগে এমন সব সূক্ষ্ম, বহুবিচিত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় বিধৃত করে রেখেছে যা পুরাকালের ফ্রেদ্র ও ক্লিতেম্নেস্ত্র-ও জানার কথা নয়। কাইওয়াকে খুঁজে পাওয়া আমার ক্ষেত্রে যে বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলো তার বর্ণনা দেওয়া আজকের দিনে শক্ত: (এ যেন) পোকা মাকড়ের যৌন অভ্যাসের কাঁচা উপকরণের মধ্যে আমাদের কালের কবিতা, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের প্রধান মিথসমূহের আদর্শ পূর্বসত্তা খুঁজে পাওয়া! আমাদের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরত্বে যার অবস্থান, প্রাণিবিদ্যার সেই শাখা অর্থাৎ পোকামাকড়ের জগতের সঙ্গে কল্পনার ভুবনের সমস্যা সমাধানের মতো দুই প্রবল বিপরীতকে কাইওয়া একত্র করলেন।

কয়েক বছর পর তাঁর অন্য বইগুলো পড়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে- আবিষ্কারের চেয়েও যা লক্ষণীয় তাঁর সেই ত্বরিৎ বোধ-শক্তি তাঁকে একটি পদ্ধতির দোরগোড়ায় নিয়ে আসে, অতঃপর যা সন্ধান-অনুসন্ধানের পথে, গ্রহণ-বর্জনের ধারায়, 'কনসেপ্ট-ইমেজ'-এর স্ফটিক-স্বচ্ছ প্রাসাদ নির্মাণে তাঁর সফল উত্তরণ ঘটায়। যুক্তির আনন্দ ও ঝিমুনি!

ছ'বছর পর, ১৯৪৬ সালে, যুদ্ধ-পরবর্তী টানাপোড়েনের প্যারিস যেখানে অগুনতি আইডিয়া আর বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মাদনা ছাড়া সব কিছুরই অভাব। অবশেষে রজে কাইওয়ার সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম। আমি কল্পনা করেছিলাম একজন ব্যঙ্গপ্রবণ বুদ্ধিজীবী দেখবো। দেখবো একজন ম্যান্ডারিনকে। কিন্তু আমি সামনে পড়ে গেলাম খোলামেলা, হৃষ্টপুষ্ট, বর্ণাঢ্য মুখমণ্ডলের একজন মানুষের সামনে। মানুষটি ছিলেন বেশ কিছুটা গোলগাল এবং একটু দলপতি গোছের। তিনি আমারই

সমসাময়িক। তথাপি তাঁকে মনে হলো যেন ফরাশি মাটির গভীর থেকে উত্থিত। চেহারা-সুরতেই তিনি যেন বহু পরস্পর বিরোধী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার।

তাঁর মানবিক উষ্ণতা, বিবেচনার নির্ভুলতা, ব্যয়বহুল আন্তরিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনমনীয়তা হঠাৎ বেরিয়ে-আসা সরলতায় গম্ভীরতার দূরীকরণ, সহজবুদ্ধির আনাগোনা, তাঁর শক্তিশালী উদ্ভটত্ব যাতে থাকতো পাতালতত্ত্ব থেকে উচ্চমার্গের কবিত্ব-দেখে আমি সবসময় আশ্চর্য বোধ করতাম। আর্জেনটিনায় নির্বাসনের বছরগুলো তাঁকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যবিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানলাভের সুযোগ দিয়েছে। আমার কবিতা তিনি পড়েছিলেন এবং তিনি জানতেন, তাঁর লেখা সম্পর্কে আমার কি সশ্রদ্ধ মনোভাব। স্বাভাবিক, বন্ধু হয়ে যেতে আমরা দেরি করিনি।

তবে এটা ছিলো এমন একধরনের বন্ধুত্ব যাতে মিলন ও বিভেদের সুতো বুনট বেঁধে চলেছিলো। কিছু নাম আমাদের মিলিত করেছে আবার কিছু আলাদা করে দিয়েছে। আমাদের কিছু ঠাণ্ডা ও কিছু গরম সময় অতিবাহিত হয়েছে; কেটেছে নীরবতার কাল যা আবার আচমকা উষ্ণ উদ্বেলতায় ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। আমার প্যারিসীয় বছরগুলোয় আমরা প্রায়ই একে অন্যের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়েছি এবং আমাদের সম্পর্ক কখনোই সাধারণ ভাববিনিময়ে সীমাবদ্ধ ছিলো না: তাছাড়া রাত্রির প্রতি, নগরীর প্রতি এবং দৈনন্দিনতায় নিহিত অত্যাশ্চর্যের প্রতি ভালোবাসায় আমরা ছিলাম সমান অংশীদার।

কিন্তু কাইওয়াকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযান ও কর্মকাণ্ডের মধ্য নিয়ে অনুসরণ করা ছিলো দুঃসাধ্য ব্যাপার। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের উদার বন্ধু তিনি গালিমার প্রকাশন সংস্থার 'দক্ষিণের ক্রুশচিহ্ন' সিরিজের সম্পাদকও বটেন। এতে আমাদের সেরা লেখকদের অনেকের ব্যাপক পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটে। ইউনেস্কোতেও তাঁর কাজ ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, সেখানে 'দিওজেন্' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। বিশ্বের চারদিগন্তে অগুনতি ছোটাছুটির ফলে তাঁর ভেতর সৃষ্টি হতো দুটি বিষয়ে আগ্রহ, উন্মাদনা। একদিকে আবার আচরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের অনন্যতা বিষয়ে প্রগাঢ় বোধ, অন্যদিকে সময়ের অদৃশ্য বৃক্ষের ফল যে পাথর তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। সন্দেহ নেই, এইসব তীর্থযাত্রায় তিনি মোঁতেস্‌কিয় এবং 'এক হাজার এক রজনী'র প্রভাবে উদ্দীপিত হতেন।

বিষয়বস্তুর ফলপ্রসূ বিভিন্নতা এবং সন্নিধান তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কার: মিথ ও উপন্যাস, স্বর্গীয় ও জাগতিক, যুদ্ধ ও ক্রীড়া, অনুকরণ ও উৎসর্গ, খনিজবিদ্যা ও শব্দধারণ তত্ত্ব, ফরাশি ক্লাসিকবাদ ও অদ্ভুত রসাত্মক কাহিনি, মার্কসবাদ ও তার কথকতা, কাব্যচ্ছন্দ ও কোনো ভাষাগোষ্ঠীর বাক্যতত্ত্ব, ইতিহাস ও তার পুনরাবৃত্তি, ইতিহাস ও তার গতিভঙ্গ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হ্যাঁ ও না, ডান ও বাঁদিক। সভ্যতার আবিষ্কার ও ভিন্ন বিশ্বসমূহ, আদিবাসী ও হান বংশের চীনারা, পিপীলিকা কিংবা মধ্যযুগের জাপানে বিভিন্ন বড় পরিবারের মধ্যে সংঘটিত ভ্রাতৃক্ষয়ী যুদ্ধ, স্বপ্নকল্পনার

প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় ছিলো তাঁর ভাবনাচিন্তার উপাদান।

তাঁর প্রতিটি বই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ থেকে পরিকল্পিত ও লিখিত। তাই তাদের রয়েছে সংজ্ঞায়িত উপসংহার। এর কয়েকটি যেমন যুদ্ধের জটিলতা কিংবা প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের অনুকরণবৃত্তি ব্যাখ্যার ভান করে, অন্যগুলি তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করে সামঞ্জস্যবিহীনতার (দিসিমেত্রি) সৃষ্টিশীল কার্যকারিতা, অথবা ছড়ার ছন্দ যাকে গণ্য করা হয়েছে এক ধরনের শব্দরেণুরূপে। কিন্তু এসব নির্মিতি, ভবিষ্যৎ-ভাবনা ও প্রদর্শন যেসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে তাদের সঙ্গে অন্যের যে মিলন ঘটছে সেই গোপন সম্পর্কের বিষয় ছাড়া আর কিছু সন্ধান করে না। এরা আবার বহুদূরের এক প্রায় সবসময় অন্য বলয়েরই অধিকারভুক্ত। একাজের উপযুক্ত যে প্রতিচ্ছবি তা খুব ব্যাপক এবং মেরুদণ্ডের মতো। সম্ভবত তা হলো একটি পাতার নড়াচাড়া, যা একটি ত্রিকোণ প্রিজমে প্রতিফলিত। প্রিজম এই নড়া চড়াকে ভেঙে দেয়, ফিরে সৃষ্টি করে, অদ্ভুত বর্ণাঢ্য মিশ্রণে দেখায়। অথচ তা' আদৌ অযৌক্তিক নয়। প্রতিফলনের এই যে ক্রীড়া তা একই সঙ্গে কার্যকারণের যুক্তি দ্বন্দ্ব বৈ কি !

বিষয়ের চূড়ান্ত ব্যাপকতার মধ্যেই যেন কাইওয়া বিশ্বের ঐক্য আবিষ্কারের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। অবশ্য এই ঐক্য প্রদর্শনের ভার নেবার ভান করেন না তিনি। এটা তাঁর কাছে এক অমোঘ সত্য। এটা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন পুনর্ব্যক্ত করবার। বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মিতির চাইতে বেশি বিবরণধর্মী তাঁর সৃষ্টি: আমরা যা দেখি তার বিবরণ নয়, বরং এই বিশ্বের যা অদৃশ্য, যা নিয়ে গঠিত ভুবন-সমূহের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের ছায়াপথ ও গোপন যোগাযোগসূত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি কল্পনা করেছেন প্রকাণ্ড ও শক্ত নিয়মনিগড়যুক্ত চিন্তন রূপে।

এভাবেই প্রতীয়মান হয় তাঁর দৃষ্টির সাদৃশ্য সংক্রান্ত কেন্দ্রীভূত কর্মকাণ্ড। যদিও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি অতি কট্টরভাবে ন্যায়শাস্ত্র অনুসরণ করে চলেন এবং নিজেকে সমর্পণ করেন অভিজ্ঞতার আওতায়, কিন্তু প্রতিটি নির্ণয় এবং অনুমানের ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে যে সম্পর্কে স্থাপিত হয় তা হচ্ছে সাদৃশ্যজাত। কখনোই 'এটা থেকে ওটা বার করা যেতে পারে' নয়- যা বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত; কিংবা 'এটাই সেটা' নয়- যা কবি বা মরমীদের জগতের ; বরং 'এটা ওটার মতো'।

পাথর ও কল্পনার সৃষ্টি-বিশ্বের দুই ভিন্নমুখী দিগন্তের দ্যোতক। প্রথমটি হলো বস্তু, বস্তু বৈ কিছুই নয়। দ্বিতীয়টি বায়ুর চেয়ে হাল্কা জিনিষের বুনন: শব্দ। পাথর ও কাহিনির মধ্যে যে চূড়ান্ত বিরোধ ও যোগাযোগ তা তাঁর পছন্দসই বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর সেরা বইগুলোর অন্যতম 'পুনরাবৃত্তির রহস্যভেদ' (রকুর্‌স্ দেরবে) যা তাঁর অকালমৃত্যুর অল্প পরে প্রকাশিত। এতে তিনি এমন এক সেতু নির্মাণ করেন যা একদিকে চকমকি পাথরের মাত্রাতিরিক্ত প্রতিচ্ছবি এবং একটি ধনুকের কম্পনের কারণে যা-কিছু খনিজ ধূলিকণার সঙ্গে মিশ্রিত তার; আবার অন্যদিকে এখানে সংযোজিত হয়েছে দুটো কাহিনি-একটি জার্মান, অন্যটি জাপানী। এই চারটি ক্ষেত্রে

রূপান্তরে ঘটছে একই রকমের যুক্তি মেনে এবং একই রকমের ফলাফল নির্মাণ করে। কাইওয়া লক্ষ করেন যে, কাহিনি পদার্থজগতের স্পন্দনের অংশীভূত নয়, যা তার আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু এগুলোতেও ঘটে এমন মারাত্মক কাণ্ড যাতে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে উত্তেজনা দেখা দেয়, এবং আমি গোপনে বলি, তার থেকে নতুন গল্প তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত কম্পনই হোক বা মানসিক অবনতিই হোক পরিবর্তনসমূহ হচ্ছে এমন সব সামঞ্জস্যবিহীনতা (দে দিস্‌সিমেত্রি) যা ভারসাম্য নষ্ট করে, নিবিড়ভাবে নতুন সমতা সৃষ্টির অংকুর এনে দেয়। পরিবর্তনসমূহের জন্য কেবলমাত্র একটি বস্তু বা বিষয়কে দায়ী করা চলে না- এককভাবে অসামান্য প্রতিভা, সারবস্তু অথবা অন্য কোনো প্রকারের শক্তি- কাউকে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর কারণ স্বতন্ত্র। শুধু যে-নিয়ম তাকে পরিচালিত করছে তা অপরিবর্তনীয়। কাইওয়া রোঁসার-এর কারণ স্বতন্ত্র। শুধু যে-নিয়ম তাকে পরিচালিত করছে তা অপরিবর্তনীয়। কাইওয়া রোঁসার-এর কবিতার একটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 'বস্তু থাকে, আকার হারিয়ে যায়' এবং যোগ করেন : কবি ভুল করেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে বস্তু হাওয়া হয়ে যায়, আদর্শই টিকে থাকে।

এরিস্টটলের মতোই কাইওয়ার বিশ্ব যুগপৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও অনির্মিত। অন্যথায় তিনি হলেন পুনরাবৃত্তিমূলক, এবং একটি অচল যন্ত্রও তাঁর অধিকারে নেই। কোন্ শক্তি তাহলে চালনা করে এসেছে তাঁকে? কাইওয়া তা বলেন না। আমি ঝুঁকি নিয়ে জানতে পারি: সম্ভবত তা হলো সময় বস্তু ও বস্তুগত যাবতীয় আন্দোলনের জনক। আমি জানি না, আমার উত্তর তিনি সমর্থন করতেন কিনা। কিন্তু তাঁর নীরবতার জন্য আমাদের বেশি কঠোর হওয়া উচিত হবে না। তিনি তো কখনো প্রাথমিক প্রস্তাবনাদি রচনায় অগ্রণী হননি। একটি অধিবিদ্যা সৃষ্টি অথবা একটি বৈজ্ঞানিক থিয়োরি বার করবার প্রয়াস তিনি পান নি। তাঁর ক্ষেত্র ছিলো ভিন্ন : তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন একটি সাধারণীকৃত কাব্যমীমাংসার সৃষ্টিসমূহ যা অধ্যয়নেও ব্যবহৃত হতে পারে।

শব্দতরঙ্গ ও প্রতিধ্বনির এই পৃথিবীতে, নিস্তব্ধতাও যেখানে বৈশ্বিক যোগাযোগের অংশবিশেষ, সেখানে মানুষের স্থান কোথায়? কাইওয়ার জবাব দ্বিধামুক্ত : মানুষ, ধরার বুকে সর্বশেষ আগন্তুক, প্রকৃতির অংশও বটে ধর্মীয় খোলস, চকমকি পাথর, পত্রপল্লবে বাতাসের মর্মর ধ্বনির মতো। আমাদের প্রজাতি বস্তুগত আকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারে এবং একটি আলাদা রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছে যাকে আমরা বলি সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতা। কিন্তু এটা এমন এক রাজত্ব যাকে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল সামঞ্জস্যহীনতা এবং অন্যকিছুর জন্যে যে আক্রমণ করা যাবে না তা নয়। কেননা, এগুলি আদি সামঞ্জস্য বিধানের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। এই অনমনীয় পরিস্থিতিতেই বিজয় হবে মানবসত্তার। যে সঙ্গত হতাশাবাদের সঙ্গে তিনি মানবজাতিকে সম্পৃক্ত দেখে গেছেন তা-ও তাঁকে স্বীকার করতে বাধা দেয়নি যে- বিশ্ব দু'টি ঢালু পথের সন্ধান দিয়েছে। মানব সত্তা যেন এক

দাঁতভাঙা জবাব খুঁজে পেয়েছে। সেটি হলো একটি নঞর্থক সৃষ্টিশীলতা যা রয়েছে সেই অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থানে যাকে আমরা জীবন নামে আখ্যায়িত করে থাকি। এই প্রজাতির নিঃশেষ হবার আশংকা নেই, আছে পরিবর্তনের। এবং জীবনের জগতে পরিবর্তন তো প্রত্যাবর্তন নয়, বরং মৌল সামঞ্জস্য বিধানের সূত্রে ব্যক্তির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের সঙ্গে সমার্থক।

কাইওয়া বৈপরীত্যমূলক মনোভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন পাথরের প্রতি। একদিকে পাথরের মধ্যে তিনি দেখেন মানুষ যা আছে এবং যা হবে: মুষ্টিধুলো নয় বরং অভেদ্য অভঙ্গুর আকৃতির প্রকাশ। অন্যদিকে, পাথর হলো দীর্ঘজীবন ধারণের স্মৃতিস্বরূপ। এখানে পাথর ছিলো প্রথমমানুষ আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে, এবং থাকবে চূড়ান্ত ধ্বংসের পরেও। একই সঙ্গে মৃত্যু ও অমরত্বের স্মারক। উপায় কি তার প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে? পাথরের মুখোমুখি যা সবচেয়ে ভঙ্গুর এবং সবচেয়ে পরিবর্তনশীল তা হলো মানুষ ও তার সৃষ্টি। কার জন্য চ্যালেঞ্জ? পছন্দের তো কোনো প্রয়োজন নেই।

কাইওয়া লিখেছেন এবং আমরা তা পড়ছি। অবশ্যই আমরা তেমনভাবে তাঁর বই পড়ি না যেমন করে কেউ কোনো পাথর পর্যবেক্ষণ করেন, বরং যেমনভাবে কেউ কোনো বই পড়েন। তবু এমন মুহূর্ত আসে যখন এই পাঠ এমন কিছুতে রূপান্তরিত হয় যা তাকে অস্বীকার করে না, বরং সম্পূর্ণ করে এবং তা হলো, ভাব-তন্ময়তা। তখন আমরা তাঁকে পড়ি যেমন করে তিনি পাথরের গায়ে খোদিত চিহ্নগুলো পড়বার প্রয়াস পেতেন: অশরীরী সময়ের প্রতিধ্বনি এবং প্রতিফলনের মতো। একজন কবির চিন্তাঋদ্ধির ফলে পাথরসমূহও যদি পাঠযোগ্য হয় তাহলে কবিতা ও অন্য গ্রন্থাদিও সময়ের শক্ত জড় পদার্থ তথা পাথররূপে বিবেচিত হতে পারে বৈ কি! কাইওয়ার গদ্য-কবিতাগুলি হচ্ছে বৈশ্বিক আন্দোলনের দু'টি বিশেষ প্রকরণ তথা স্রোতধারা ও ঘূর্ণিবায়ুর স্বচ্ছ শব্দরূপ। এই প্রকরণ দুটির একক প্রতীক হলো সমুদ্র শঙ্খ। কবিতা-শঙ্খেও আমরা শুনি জল ও বায়ুর দ্বৈতসঙ্গীত।

শিব নারায়ন রায়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য :

অক্তাভিও পাজ যখন ভারতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত তখন তাঁর সঙ্গে অল্প-স্বল্প সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। তিনি তাঁর *Piedra de Sol* নামে বিখ্যাত দীর্ঘকবিতাটির একটি কপি আমাকে উপহার দেন। বয়সে তিনি আমার চাইতে সাত বছরের বড়। যেমন তিনি খাঁটি কবি, তেমনিই একজন বিশিষ্ট ভাবুক, বৈদগ্ধ্যে, বহুদর্শিতায়, হৃদ্যতায় অসামান্য পুরুষ। জীবনের বড় অংশ তিনি স্বদেশের বাইরেই কাটিয়েছেন, কিন্তু মেক্সিকো সম্পর্কে তাঁর লেখা *El laberinto de la soletad (Labyrinth of Solitude)*-এর সমতুল্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বই তাঁর জন্মভূমি বিষয়ে আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না। মেক্সিকো সরকারের ছাত্রহত্যার

প্রতিবাদে তিনি ভারতে রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করেন (১৯৬৮)। ১৯৭১ সালে মেক্সিকোয় প্রত্যাবর্তন করে *Plural* নামে তিনি যে সাহিত্যপত্রটির প্রতিষ্ঠা করেন লাতিন আমেরিকার তরুণ ভাবুক সমাজে সেটি বেশ আলোড়ন তোলে। সরকারি হস্তক্ষেপে ১৯৭৬ সালে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে পাজ *Vuelta* নামে আর একটি পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ : *Salamandra* (১৯৬২) এবং *Ladera este* (১৯৬৯) ; প্রধান প্রবন্ধ সংকলন : *Corriente alterna* এবং *Conjunciones y disyunciones*।

রজে কাইওয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। তাঁকে নিয়ে অক্তাভিও পাজের প্রবন্ধটি যিনি ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে আমাকে পাঠান তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসংস্কৃতি চর্চার অধ্যাপক। মাহমুদ শাহ কোরেশী সরবোন থেকে ডক্টরেট অর্জন করেন ; তাঁর সূত্রে ওয়ালিউল্লাহ্‌র পত্নী আন-মারির সঙ্গে ফ্রান্সে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। কোরেশীকৃত তর্জমাটি বেশ কিছুদিন দপ্তরে জমা ছিল ; এই সংখ্যায় সেটি প্রকাশ করতে পেরে খুশী হয়েছি। (জিজ্ঞাসা, পঞ্চদশ বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০১, দ্বিতীয় সংখ্যা)।

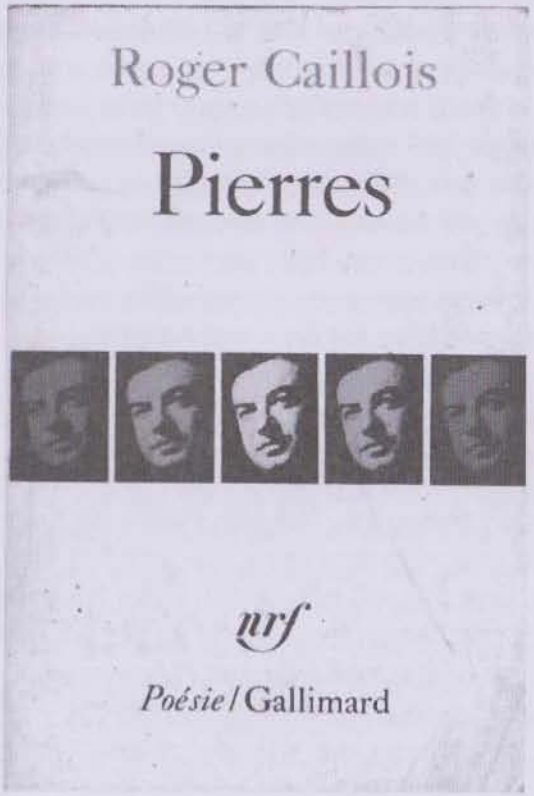

স্যাঁতেগ্‌জুপেরি : জীবন ও জগতের রহস্যশিকারি

ছোট্ট শাহজাদার গল্প

এক শাহজাদার গল্প বলি। তিনি একজন ফরাশি লেখক এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা জনপ্রিয় কথাশিল্পী। তাঁর পুরো নাম অঁতোয়ান স্যাঁতেগ্‌জুপেরি। তাঁর সম্পর্কে বলবার কথা অনেক। তবে আমি তাঁকে শাহজাদারূপে চিহ্নিত করেছি দু'টি কারণে। প্রথমত, নেশা ও পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। বিমানে উড়াউড়ির গোড়ার দিকে তাঁর দুঃসাহসী অভিযান এবং মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বিমানসহ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া তাঁর প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। জীবৎকালে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, বইয়ের থেকেও বিশ্ব আমাদের অনেক বেশি শেখায়। কৃষক যেমন তার লাঙল নিয়ে চাষাবাদে এগিয়ে যায়, তেমনি বিভিন্ন উপায়ে মানুষকেও এই পৃথিবী আবিষ্কারে চলমান হতে হয়। তাই তাঁর মতে, উড়োজাহাজ পৃথিবীর সত্যিকার চেহারা দেখাবার উপায় করে দেয়। সড়ক পথে চলতে গিয়ে মানুষ বহুভাবে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। বাগানের মালী, স্থপতি, নৃত্যশিল্পী, বৈমানিক বা অন্য পেশাদারদের প্রসঙ্গে তিনি সশ্রদ্ধ। ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বহুবার উড়াল দিয়ে বহু কিছু দেখেছেন ও বুঝেছেন। স্যাঁতেগ্‌জুপেরি অন্য যে কোনো ব্যক্তির চাইতে বেশি জানতেন মুরদের স্বাভাবিক মহানুভবতা, আরব মনমানসিকতা এবং পুরনো যুদ্ধরীতি সংগ্রামশীল সৈনিকদের সাহসিকতার তাৎপর্য।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন এক ছোট শাহজাদার গল্প। তাঁর মতে, সব বড়রা এক সময়ে ছিলো শিশু। কিন্তু খুব কম বড়দের স্মৃতি তা ধারণ করে রাখে। তাঁর এই অতি বিখ্যাত বইটির বাংলা তর্জমা নিয়ে ঘটে গেছে বহু লংকা কাণ্ড। তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে অতীতে লেখা আমার একটি ভূমিকায়। সেটাই প্রথমে তুলে ধরি:

রতন বাঙালি রূপান্তরিত ছোট্ট এক রাজকুমার পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। মনে পড়ে গেল বহুকালের পুরনো কথা। চার দশকেরও বেশি দিনের আগের ঘটনা।

সেকালে ভিনদেশি এক তরুণের মনে জন্মেছিল ফরাশি ভাষার প্রতি আগ্রহের সূচনা। ষাটের দশকের বেশিরভাগ সময়ই কাটল ফরাশি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি প্যারিস শহরে। একাধিক ফরাশি বন্ধুর মুখে শোনা গেল ল্য প্যতি প্র্যাস্ (LE PETIT PRINCE), ইংরেজিতে 'দা লিটল্ প্রিন্স' বইটির কথা। বইটির লেখক একজন বৈমানিক। তাঁর নাম অঁতোয়ান্ দ্য স্যাঁতেগ্জুপেরি (ANTOINE DE SAINT-EXUPERY)। ১৯২৩ সালের দিক থেকে ১৯৪৪ সাল অবধি তাঁর প্রধান নেশা ও পেশা ছিলো হাওয়াই জাহাজ চালানো। প্রথম দিকে প্রধানত ডাকবাহী বিমান নিয়ে তুলুজ- কাজাব্লঁকা (মরক্কো), দাকার (সেনেগাল)- কাজাব্লঁকা গমনাগমন। পরে শুরু হলো দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বহু বিপদসংকুল অভিযান। ১৯৩৮ সালে গুয়াতেমালায় এক ভয়ানক দুর্ঘটনায় পড়লেন তিনি। এর মধ্যে বেশ কিছু গল্পকাহিনি, প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাশি প্রতিরোধের পক্ষে এক দুঃসাহসী বিমান অভিযানে জার্মান প্রতিপক্ষের আক্রমণে নিখোঁজ হয়ে যান স্যাঁতগ্জুপেরি। সম্ভবত কর্সিয়ান দ্বীপের কাছে বিধ্বস্ত হয় তাঁর বিমান (১৯৪৪, জুলাই ৩১-এর দুপুর বেলা)। এক পর্যায়ে (১৯৪৩ ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল) ন্যুইয়র্ক অবস্থানকালে তিনি রচনা করেন ল্য প্যতি প্র্যাস্ বইটি। সুদীর্ঘ ফ্রান্স অবস্থানকালে বহু ফরাশি বন্ধু বইটির কথা আমাকে বলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এর থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। প্যারিসের একটি জাতীয় নাট্যশালায় এর ওপর ভিত্তি করে একটি চমৎকার নাট্যভিনয় দেখারও সুযোগ পাই। ১৯৬২-তে বইটি অনুবাদ করলে কেমন হয় জানতে চেয়ে বুদ্ধদেব বসুকে লিখলে তিনি নিষেধ করেন, কেননা অরুন মিত্রের ভাষান্তর রংমশাল পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আমি অবশ্য কিছু অংশ অনুবাদ করে ফেলেছিলাম। তাই ১৯৬৫-তে একবার দেশে ফিরে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে এ সম্পর্কে কথাবার্তাও বলি। কিন্তু সেসময়কার অনুবাদ বিভাগের প্রধান আবু জাফর শামসুদ্দিন খুব আগ্রহ দেখালেন না। ১৯৬৭ সালে প্যারিসে সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেমের বাড়িতে এক আড্ডায় তাঁর অতিথি মি. রফিক (যাঁর সম্পর্কে গল্প প্রচলিত ছিলো যে তিনি নাকি হাইকোর্টকে তাঁর বাড়ি বলে ছবি দেখিয়ে এক জর্মন সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। আসলে মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি বিয়ে করেছিলেন এক অস্ট্রিয়ান মহিলাকে এবং ঘটনাচক্রে জেনারেল আইয়ুব খান ছিলেন বরকর্তা) আমাকে আবার বইটি অনুবাদ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধজ্ঞাপন করেন। আমি অনুবাদের কাজে আরেকটু অগ্রসর হই। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। কেননা অল্প পরে, ১৯৬৮-তে দেশে ফিরে দেখি ড. জহুরুল হক অনূদিত একটি সংস্করণ বাজারে রয়েছে। পরে শুনতে পাই কবি আসাদ চৌধুরীও একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ইতোমধ্যে কলকাতা থেকে বের হয় পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় কৃত 'মূল ফরাশি থেকে অনুবাদ' (আসলে অনেকটা স্বাধীন ও চিত্রহীন তাঁর ছোট্ট রাজপুত্র)। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল একান্তভাবে মূলানুগ অনুবাদ ও সচিত্র প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ল্য প্যতি প্র্যাস গ্রন্থে রয়েছে বৈমানিক স্যাঁতেগ্জুপেরির অঙ্কিত ৪৭ খানা হাফটোন

ছবি -যার ৩১ খানা রঙিন এবং বাকিগুলো সাদাকালো। ছবিগুলো সুন্দর, তাৎপর্যময় ও ইঙ্গিতবহ। মূল ছবির একটিও বাদ দিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের কোনো মানে হয় না। এবং লেখা ও রেখার সমন্বয়ে বইটি নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব সাহিত্যে একটি অপূর্ব সংযোজন।

আশির দশকে *ল্য প্যতি প্র্যাস*-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ব্যর্থ হয়ে আমি এধরনের আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ জাক্ প্রেভের -এর *লপেরা দলা ল্যুন্* (চাঁদের অপেরা) বইটির অনুবাদ প্রকাশে সচেষ্ট হই। ঢাকাস্থ ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষ আমাকে দামী কাগজ বরাদ্দ করে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে। কিন্তু আমার প্রকাশক বাংলাদেশ শিশু একাডেমির তদানিন্তন কর্তৃপক্ষ বারবার বইটিকে তরল করে দেবার আবদার জানিয়ে এবং মূল ছবি ও বিনে পয়সায় পাওয়া দামি কাগজ ব্যবহার না করে একটা যেনতেন শিশুপুস্তক বের করে আমাকে ধন্য করে দেন। বইটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেলেও পুনর্মুদ্রণের প্রয়াস গ্রহণ করেন না।

এমতাবস্থায় বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থটি মূল বইয়ের ছবিগুলো নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। নিজেই যখন করতে পারলাম না, তখন রতন বাঙালীর রূপান্তর আগ্রহ নিয়েই পড়লাম। দু'এক জায়গায় খটকা লাগলে মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি এবং সংশোধন করে দিয়েছি। রতন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কাহিনির মূল রস ধরতে চেয়েছেন যদিও সে সুযোগ তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল না। কেননা, তিনি অনুবাদ করেছেন ইংরেজি থেকে। তবু তাঁর অভিনিবেশ এবং উপযুক্ত চিত্র সংযোজনের প্রক্রিয়ায় স্যাঁতেগ্জুপেরির *ছোট্ট এক রাজকুমার* বাংলা নবজীবন লাভ করতে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা।

ফরাশি দেশের বুদ্ধিবৃত্তির ঐতিহ্যস্নাত বৈমানিক-প্রকৌশলী ও প্রবল দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্যাঁতেগ্জুপেরি (১৯০০-১৯৪৪) রেখে গেছেন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। তাঁর আসন্ন জন্মশতবার্ষিকীর সন্ধিক্ষণে বাংলাভাষায় বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশ হবে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমি রতন বাঙালিকে এজন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করি।'

তবে আমাকে এখন আরো বেশি অভিনন্দন জানাতে হয় কল্যাণীয়া আনন্দময়ী মজুমদারকে কেননা তাঁর *ছোট রাজপুত্র* প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালে, রয়াল সাইজে, রঙিন চিত্র সম্বলিত শোভন সংস্করণে। সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 'তিনটি- ইংরেজি ভাষান্তর অবলম্বনে' প্রস্তুত এই অনুবাদ। আনন্দময়ী একজন দক্ষ অনুবাদ শিল্পী। তাঁর অনুবাদ সাবলীল ও মার্জিত।

আমার হাতের কাছে যে চারটি *ল্য প্যতি প্র্যাস্* বাংলা অনুবাদে রয়েছে তাদের প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় বহু ভিন্নতা চোখে পড়ে। তবে অনুবাদে কতখানি বাংলার কাছাকাছি হওয়া যায় অনুবাদকদের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। আমার পক্ষে ফরাশির সঙ্গে বাংলা তর্জমাগুলোর তুলনামূলক আলোচনা অকারণ কালক্ষেপণ মনে হয়।

আনন্দময়ীর বইটির ক্ষেত্রে আমি অধিকতর খুশি হয়েছি সদ্য-প্রয়াত কাছের মানুষ নিসর্গবিদ দ্বিজেন শর্মার সুন্দর একটি প্রসঙ্গ কথা পাঠ করে। আরো ভালো লাগল দ্বিজেন ও আনন্দময়ী দুজনেই স্যাঁতেগ্‌জুপেরি যাঁকে তাঁর *ল্য প্যতি প্রাঁস* উৎসর্গ করেছিলেন সেই বন্ধু লেওঁ ভেরৎ (Leon Werth) সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁকে উপলক্ষ করে লেখা লেৎর আ আনোতাজ (বন্দীকে লেখা চিঠি) রচনাটি অনুবাদ করেছেন। এটি একটি অসামান্য অবদান। এতে করে আমরা একের ভেতর দুই লেখা পেয়ে গেলাম। বিরলপ্রজ স্যাঁতেগ্‌জুপেরি-র আর মাত্র পাঁচটি 'কাজ' সম্পর্কে কিছু বলবার দায়িত্ব আমাদের রইলো।

১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *কুরিয়ে স্যুদ* (দক্ষিণের ডাক) প্রকাশিত। ফ্রান্সের তুলুজ বিমাব বন্দর থেকে রওনা হয়ে আকাশ, জলবায়ু এ অভ্যন্তরীণ সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ দাকার (সেনেগাল) পৌঁছানোর কাহিনি। জন বের্নি আর - জন ভিয়ে ভরের রহস্যময় প্রণয়, কবিতা পাঠের বর্ণনা আকর্ষণীয়।

ভল্ দ্য ন্যুই (রাতের উড়াল, ১৯৩১) গ্রন্থে স্যাঁতেগ্‌জুপেরি তাঁর প্রথমদিকের অভিজ্ঞতায় নির্মাণ করেছেন বিমান চালক ফারিয়ান ও তাঁর প্রেম, আবহাওয়া জনিত দুর্ভাগ্যের কাহিনিকে কেন্দ্র করে।

তের দে জম্- এ আরো গভীরতর অভিজ্ঞান নিয়ে আকাশ বিহারে গিয়ে নতুন করে '*মাটির পৃথিবী*' আবিষ্কারের কথা শুনিয়েছেন। ভ্রমণ প্রস্তুতির বর্ণনা, সহকর্মীদের কথা, বিমান ও গ্রহ, মরুদ্যান ও মরুভূমির মধ্যস্থানে মানুষের অবস্থানে আমরা মানব কল্যাণ সম্পর্কে বহু নতুন ধরনের অভিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করি।

পরবর্তী *পিলৎ দ্য গ্যের* গ্রন্থে যুদ্ধরত বৈমানিকের অভিজ্ঞতা শোনান স্যাঁতেগ্‌জুগেরি। ১৫ বছর বয়স থেকে লেখকের আগ্রহ বিমান চালনার। তাই পরিপূর্ণ হলো ১৯৩৯-৪০ সালে যুদ্ধবিমান পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। সে-এক বিপদ সংকুল দুঃসাহসী অভিজ্ঞতা বটে!

তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ *সিতাদেল* (দুর্ভেদ্য দুর্গ) লেখা হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে, ১৯৩৬ সাল থেকে। বিশাল গ্রন্থটি অঁতোয়ান দ্য স্যাঁতেগ্‌জুপেরির জীবনের মতোই অসম্পূর্ণ। সময় পেলে উপসংহারে তিনি আরো কিছু বক্তব্য হয়তো উপস্থাপন করতেন। কিন্তু অসময়ে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর বহু বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত বইটির প্রকাশ ঘটে। বইটিতে তাঁর জীবনের চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনির চেয়ে নীতিবাচক মানবিক দায়িত্ব প্রসঙ্গেই বক্তব্য বেশি। তাই স্যাঁতেগ্‌জুপেরির রচনা সমগ্রের ভূমিকা-লেখক রজে কাইওয়ার মতে, বাহ্যিকভাবে *ল্য প্যতি প্রাঁস* এবং *সিতাদেলকে* বানানো গল্প মনে হলেও আসলে নগ্নভাবে নৈতিক অভিজ্ঞতার গভীরতর পরিচয়ই এতে পাই (Préface, XIV)।

অঁদ্রে মাল্‌রো : সাংহাইয়ে ঝড়

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অদ্বিতীয় অঁদ্রে মাল্‌রো। শুধু উপন্যাস, সমালোচনা, শিল্পতত্ত্বের উন্নতমানের লেখক নন মাল্‌রো, স্বদেশ ও বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী নায়ক, নির্যাতিত মানবতার বন্ধু, ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও ব্যাপক সাংস্কৃতিক চৈতন্য সঞ্চারের প্রবক্তারূপে তাঁর যে আদিগন্ত প্রতিষ্ঠা মানব ইতিহাসের কোনোকালে কাউকে দেখা যায় না তার সমকক্ষ। খুব কম করে বললেও অঁদ্রে মোরোয়ার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বীকার করতে হয় যে, নিজের জীবনাটাকেই তিনি পরিণত করতে পেরেছিলেন এক মাস্টার পিসে। ফরাশি একাডেমীর আরেক সদস্য জঁ দর্‌মেসোঁ বলেছেন : তিনি ফরাশি সাহিত্যে বন্দুকের আমদানি ঘটিয়েছেন। প্রুস্ত যেমন স্মৃতি ও বিগত সময়, কাম্যু যেমন অ্যাবসার্ড, মাল্‌রো তেমনি রক্ত, বিপ্লব ও মৃত্যুকে এনেছেন সাহিত্যে। মাল্‌রোর সঙ্গে ফরাশি ক্লাসিক্যাল ধারার উপন্যাসে এলো বিশ্ববিপ্লবের বিস্ফোরণ। প্রথমত আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধের সাক্ষীরূপে আমাদের শতাব্দীকে তিনি চিহ্নিত করে রাখলেন... ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এডভেঞ্চার প্রয়াসী ইতিহাস এগিয়ে যায় তাঁরই ফেলে যাওয়া পথে। তাই তাঁর পক্ষেই কেবল লেখা সম্ভব : 'পৃথিবীটা একদিন আমার বইয়ের মতো দেখাতে শুরু করলো।'

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধ মাল্‌রো হুংকার দিয়ে উঠলেন বীর যুবক-যোদ্ধার মতো। ঘোষণা করলেন জার্মানীর বিরুদ্ধে স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ট্যাংকবাহিনীর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের রণক্ষেত্রে কাজে লাগানোর অভিপ্রায়। সমস্ত বিশ্বে হলো তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। অতিসত্বর বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে আমরাও চিহ্নিত হলাম বিজয়ীরূপে। ১৯৭৩ এর মুক্ত বাংলাদেশ তাঁকে স্বাগত জানাতে পেরেছিলো তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে। বড় আপন ভেবেছিলেন ক্ষতবিক্ষত দারিদ্র¨ লাঞ্ছিত এই সবুজ-সোনার দেশটিকে। তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশের মহৎপ্রাণ মানুষেরাও আমাদের দুঃখ-দুর্দশার সমব্যথী হয়ে পড়েন প্রায়শ। ১৯৯২

সালে সাবেক ফরাশি রাষ্ট্রদূত সের্জ দেগালের পরিকল্পনা ছিলো মালরোর বাংলাদেশ আগমনের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর কয়েকটি বই বাংলায় প্রকাশের। তার প্রথম পদক্ষেপ বর্তমান গ্রন্থ।

'সাংহাই-এ ঝড়' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। অঁদ্রে মালরোর তৃতীয় উপন্যাস। এশীয় অভিজ্ঞতা (১৯২৩-১৯২৬) মালরোকে দিয়েছে সৌভ্রাতৃত্বের, ঐতিহ্যপ্রীতির ও বিপ্লবী চেতনার দীক্ষা। প্রথম দুটি উপন্যাস 'বিজয়ী' ও 'রাজকীয় সড়ক' আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সাহিত্য জগতে। 'সাংহাই-এ ঝড়' সম্পর্কে বছর দশেক আগে আমরা যা লিখেছিলাম তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : বয়স তাঁর তিরিশ। এবার শুরু করেন 'লা কোঁদিসিঁও য়্যুমেন' (ইংরেজীতে দুটো অনুবাদ 'স্টর্ম ওভার সাংহাই' এবং 'ম্যান্'স ফেইট')। এই উপন্যাসের পটভূমি : চীনা বিপ্লবের এক জটিল অধ্যায় : সাংহাইয়ের সাম্যবাদী অভ্যুত্থান এবং চিয়াং কাইশেক কর্তৃক তার নিষ্ঠুর দমন ! অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য : ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জীবনের যথার্থরূপের উন্মোচন। আগের বছর মাল্‌রো চীন সফর করে এসেছিলেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সংবাদপত্রের অংশবিশেষও ব্যবহৃত হয়েছে এই বইতে। প্রধান চরিত্র কিয়োঃ অনেকের ধারণা চু-এন-লাইয়ের আদলে গড়া। আবার কেউ কেই মনে করেন মাল্‌রোর এক জাপানী বন্ধুর নাম ও ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ। এছাড়া জিজর, ফেরাল, ক্লাপিক, চেন সব চরিত্রই এসেছে পরিচিত মহল থেকে। কিন্তু এদের তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন পাস্কালীয় প্রত্যয়ে অর্থাৎ বাস্তবতার অনুভব-সম্ভব সংযোগের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতায়। পাস্কালের কাছে মানব পরিস্থিতি ছিলো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির অবস্থা আর মালরোর কাছে তা' হলো বাক্যহীন প্রায়-অসুস্থ বদ্ধ-বিবর থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস, কর্মে মৃত্যুজয়ের অভিলাষ।

উপন্যাসটির শুরুতেই বিপ্লবী, আততায়ী চেন-এর অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এক অনবদ্য কৌশলে : '১৯২৭ ২১ শে মার্চ। রাত্রি সাড়ে বারোটা। চেন কি মশারিটা তুলে ফেলবে? সামনাসামনি যদি যুদ্ধ হ'ত, সজাগ সতর্ক শত্রু যদি আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দিত, কত স্বস্তি বোধ করত সে!

বাইরের কোলাহলের ঢেউ দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় অনেকগুলো গাড়ি এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

....এই লোকটির মৃত্যু চাই। সে ধরা পড়বে কিনা, খুনের দায়ে শাস্তি পাবে কিনা, সে চিন্তা এখন নয়। এখন শুধু একটি ভাবনা। এক আঘাতে শেষ করে দিতে হবে সামনের লোকটিকে। যেন বাধা দেবার অবকাশ না পায়। বাধা দিতে পারলেই তো চেঁচিয়ে উঠবে। ....

অন্য একটি অংশে মৃত কিয়োর স্ত্রী মে ও তার শ্বশুরের কিছু উক্তি : তুমি না বলতে বাবা, এবার জাতির ত্রিশ শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে, সে আর ঘুমোবে না, ...

জীবনের সঙ্গে বেশিদিন ছলনা চলে না। বাস্তব সত্য কোথাও নেই: আছে শুধু ভাবের জগৎ। সে জগতে প্রবেশ করলে বোঝা যায় সবই মায়া, সবই অর্থহীন।

জগতে এমন কোনো মহিমা নেই যা' বেদনার ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।'

(উদ্ধৃত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-প্রবাহ' কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ২৬-৩১)

বইটি 'নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ'-এ প্রকাশিত হলো ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুন সংখ্যায়। প্রথমে অনেকে পছন্দ করতে পারলো না বইটি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মালরোর শুভাকাঙ্ক্ষী নোবেল পুরস্কারবিজয়ী এবং রবীন্দ্র-অনুবাদক অঁদ্রে জিদ্। তবে জিদ্ লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি ও জীবনানুষঙ্গের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে, অনেক বেশি বস্তু মাত্রাতিরিক্ত জটিলতাসহ উপস্থাপিত। অবশ্য কিছু সমালোচক উপযুক্ত তারিফ করলেন, এই গ্রন্থের ট্র্যাজিক মহিমা, সূক্ষ্ম এবং নতুন মানবিক চৈতন্যের সমাহার প্রসঙ্গে। প্যারিস থেকে ইলিয়া এরেনবুর্গ 'ইজভেস্তিয়া'য় লিখলেন : 'মাল্‌রোর নতুন উপন্যাসটি যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হচ্ছে।... কিন্তু বইটি বিপ্লবের ওপর নয়। মহাকাব্যও নয়। এ-এক অন্তরঙ্গ জুর্নাল। লেখকের মনের অনেকগুলো এক্সরে অংশত এক-একটি চরিত্রে প্রতিফলিত। তাঁর গ্রন্থের দুর্বলতা (?) এখানে যে, এর চরিত্রগুলো বেশ বেঁচে বর্তে আছে কিন্তু আমরা তাদের জন্যে দুঃখবোধ করি, কারণ ওরা কষ্ট পায় বলে আমরাও কষ্ট পাই অথচ এইভাবে জীবন কাটানোর বা দুঃখ পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

১৯৩৩ সালের ১লা ডিসেম্বর 'মানব পরিস্থিতি' ফরাশিদেশের সেরা সাহিত্য পুরস্কার 'গোঁকুর' পেল। বিচারকবর্গের সিদ্ধান্ত ছিলো সর্বসম্মত। তবে ঘোষণায় তাঁরা মাল্‌রোর অন্য দুটি 'এশীয়' উপন্যাসকেও এই সম্মানের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এতে সুবিধা হলো মাল্‌রোর। বই তিনটির বিক্রি বাড়লো এবং মালরো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন অবশেষে। এখানে উল্লেখ্য যে, গোঁকুর পুরস্কার মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রঁ কিন্তু এর সম্মান ও স্বাভাবিক বিক্রি হিসাবের বাইরে।

'মানব পরিস্থিতি' প্রচুর সুখ্যাতি পেয়েছে দেশে-বিদেশে। একজন ফরাশি সমালোচক সুন্দর বলেছিলেন, 'মাল্‌রো ফরাশি সাহিত্যে এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন। এতকাল এই সাহিত্যে বিশ্লেষণ ও কর্মপন্থা (এ্যাকশন) দুই মেরুতে অবস্থান করে ভারসাম্য বজায় রাখত। মাল্‌রো এই ভ্রম সংশোধন করে দেখালেন যে যথার্থ এ্যাকশন বেছে নিয়ে তার শেষ অবধি পৌঁছুলে তাতেই ঘটে নৈতিক সত্যের চূড়ান্ত প্রকাশ।

(অঁদ্রে মালরো : শতাব্দীর কিংবদন্তী' ঢাকা, ১৯৮৬. পৃ. ৪১-৪৩)

উল্লেখ্য যে, মাল্‌রো-জীবনী রচনার সময়ে অশোক গুহ অনূদিত গ্রন্থটি আমাদের হস্তগত হয়নি। মূল বইটিও কাছে ছিলো না। তবে মাল্‌রো স্বয়ং আমাদের বলেছিলেন, তাঁর 'লা কোঁদিসিওঁ য়্যুমেন' (যার বাংলা শিরোনাম 'মানব পরিস্থিতি' রেখেছি)-এর ইংরেজিতে 'সটর্ম ওভার শাংহাই' নামে খুব বাজে একটা ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল প্রথম। বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হলে অশোক গুহের বইটি পরীক্ষা করার জন্য আমরা তৎপর হলাম। ইতিপূর্বে উপযুক্ত মনে হওয়াতে এবং একমাত্র বাংলা অনুবাদ বলে আমরা তাঁর কয়েকটি পঙক্তি ব্যবহার করেছিলাম। অনুবাদ গ্রন্থটি পড়ে আমাদের মনে হলো অশোক গুহ এক

ঈর্ষণীয় কাজ সমাধা করেছেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে কলকাতায় তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে পরিচিত এক সফল অনুবাদক। ইংরেজি মূলে কিছু ত্রুটি থাকলেও কিংবা ফরাশি ভাষায় জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও অশোক গুহ নিপুণ ভাষান্তর ঘটিয়েছেন গ্রন্থটির। বাংলা চলতি ভাষার ওপর রয়েছে তাঁর আশ্চর্য দখল। অবশ্য কখনো কখনো ভাষার ক্ষেত্রে কিংবা রূপান্তরের কাজে তিনি যে ভুল করেননি তা নয়। কিন্তু মনে হয় তা উপেক্ষা করা যেতে পারে। এবং সংশোধনের প্রয়াস পেলে তা সাবলীলতা ক্ষুণ্ন করতে পারে। তাছাড়া প্রয়াত লেখকের অনুবাদকর্মের ওপর অনধিকার চর্চাও হতো বলে আমাদের ধারণা। দুঃখের বিষয় : বইটি যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো তার প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় : 'সাংহাই-এ ঝড়' একটি একাধিকবার পঠনযোগ্য উপন্যাস।

মাল্‌রোর সব লেখায়, *সাংহাই-এ ঝড়*-এ সম্ভবত আরো একটু অধিক পরিমাণে রয়েছে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম-অনুসন্ধানের প্রয়াস। এখানে কাহিনিসূত্র উপলক্ষমাত্র যদিও তার গুরুত্ব সর্বদা সৃষ্টি করেছে উপযুক্ত আবহ। চরিত্র নির্মাণ ও তাঁর প্রধান লক্ষ নয় যদিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন আপন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে প্রতিটি চরিত্র। শুরুতেই চেন চরিত্রটি তুলে ধরে একজন বিপ্লবীর প্রতিজ্ঞা ও মানবিক দুর্বলতার দিক। একটু খুঁজলেই আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে দেখি ভয়ংকরের রূপ ফরাশিরা যাকে বলে 'লেপুভঁৎ'। একে অতিক্রম করতে পারি একমাত্র কর্মের মাধ্যমে।

কিয়ো ও কাতো (কাটভ) ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাবোধ সত্ত্বেও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সংগ্রামী মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে ওরা আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ। নিয়তির অলক্ষ্য নির্দেশ উপেক্ষার উপায় নেই ওদের। 'সম্ভ্রম বলতে কী বোঝেন?' প্রশ্নের উত্তরে কিয়োর সাফ বক্তব্য : 'যা অপমানের বিপরীত'। বস্তুত সম্ভ্রম নিয়ে মানব অস্তিত্ব, মানব কল্যাণ সাধন এই তো জীবন! জাপানী পাঠশালার শিক্ষায় কিয়ো জেনেছে : 'ভাবধারা শুধু ভাবধারা হয়ে থাকলে চলবে না, জীবনে বিকশিত হবার দাবি তাদের আছে।'

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি ফেরাল মাল্‌রোর আরেক আশ্চর্য সৃষ্টি। বালজাকের সঙ্গে তুলনীয় বিস্ময়কর বর্ণনা ও বক্তব্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন ফেরালের ব্যবসায়িক খুঁটিনাটির দিক। নারী স্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসের প্রেমিক দম্পতি কিয়ো-মে'র সম্পর্কের মধ্যে। সাংহাই-এ জন্ম, জার্মান মেয়ে মে হাইডেলবার্গ ও প্যারিসে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার। কিয়োর জীবনসঙ্গিনী, কিন্তু মুক্ত বিহঙ্গ। বিপ্লবের উত্তেজক অপরাহ্নে সে আত্মসমর্পণ করে অন্যের কাছে। লক্ষ্যযোগ্য যে, মাল্‌রো-সাহিত্যে প্রেম তার প্লাতোনিক পর্যায়ে একেবারেই অনুপস্থিত। দেহজ আকর্ষণ নিষ্ঠুর, প্রতারক প্রেমের প্রাধান্যই সর্বত্র। নিয়তিনির্ধারিত আত্মধ্বংসী পথে অগ্রসরমান সত্তার বিস্মৃতি ঘটানোর একটা উপায় যেন প্রেম। ফেরালের পলায়নপর রক্ষিতা ভালেরি তাকে লিখেছিল : 'প্রিয়, আপনি বহু কিছু জানেন, কিন্তু একটি মেয়ে মানুষ যে একটি

মানবসত্তা সম্ভবত মৃত্যুর আগ অবধি একথা আপনার অজানাই থেকে যাবে।'

নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা নানা প্রসঙ্গে এসেছে। কিয়ো-মে সম্পর্কের মধ্যে আমরা প্রধান চরিত্রটির ভেতরের ও বাইরের নানা রূপের প্রতিভাস লক্ষ্য করি। চরিত্র নিজের দ্বান্দ্বিকতা অনুভব করে' দোদুল্যমানতাকে সংযত করে বিপ্লবী চেতনায়।

উপন্যাসটির এক অনন্য-সাধারণ চরিত্র কিয়োর পিতা জিজর (গিসোর)। আইফেনসেবী বৃদ্ধ পবিত্রতা ও জ্ঞানবত্তার মূর্তিমান প্রবক্তা। 'মানুষ আর বস্তুজগতের ওপর নিজের অধিকার বিস্তারের প্রণালী' যে বুদ্ধিবৃত্তি তা তাঁর অধিগত এবং সে বিষয়ে তিনি সচেতন কিন্তু যেহেতু একমাত্র পুত্র ও শিষ্যবৃন্দ বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত তাই মৃত্যুর অনিবার্য ঘটমানতায় তিনি জীবন সম্পর্কে উদাসীন। 'যা তাঁকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল' সেই পুত্রের মৃতদেহ দেখে তাঁর অভিজ্ঞান : 'একটা মানুষ তৈরিতে লাগে ষাট বছর... আর যখন সে মানুষটি তৈরি হলো, তখন সে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুরই যেন উপযুক্ত নয়।' কিয়োর মৃত্যুর পর তিনি আবিষ্কার করলেন সঙ্গীত। কেননা 'কেবল সঙ্গীতই পারে মৃত্যুর কথা বলতে'। তিনি পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস অধ্যাপনা নিয়ে নিরাসক্ত জীবন উদযাপনে ব্যাপৃত থাকলে পুত্রবধূ মে স্বামীর মৃত্যুর 'প্রতিশোধ' গ্রহণের অভিপ্রায়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, যা তাঁর সমর্থন লাভ করে।

ভঙ্গুর, বৈপরিত্যের মানব জীবনে মাল্‌রো দ্বান্দ্বিকতার ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন সার্থক ভাবে। সহজ সমাধানের পথ এড়িয়ে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জটিলতার মোকাবেলা করেছেন, সামগ্রিকতার আবহ সৃষ্টি করেছেন। এতে প্রধানত সহায়ক হয়েছে তাঁর ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহার ও চিত্রকল্প নির্মাণের দক্ষতা। পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়, বিদ্যুতের ঝলকের মধ্যে স্থান ও পাত্রের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান। সাতটি ভাগে বিভক্ত উপন্যাসটি উত্থান ও পতনের ট্র্যাজিক ছন্দে বিলম্বিত।

'সাংহাই-এ ঝড়' রচনার দু'দশক পর মালরো এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : 'আমি মনে করি না - ঔপন্যাসিকের কর্তব্য প্রধানত চরিত্র-সৃষ্টিতে, অন্য সব শিল্পীর মতো তিনি একটি বিশিষ্ট এবং সুসমঞ্জস ভুবন নির্মাণে অগ্রণী হবেন।' ফরাশি ঐতিহ্য-নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, ব্যতিক্রমী ভিকতর‍্যুগোর 'লে মিজেরাবল', এমিল জোলার 'জের্মিনাল' ছাড়া পদ্ধতিগত দিক থেকে মার্কিন কথাশিল্পীদের অনুসরণ করতে চেয়েছেন বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন। বস্তুত, ফরাশি সাহিত্যজগতে মার্কিন কথাসাহিত্যের অনুবাদ ও প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সব মিলিয়ে বহুবাচনিক, যুগোপযোগী ও বিচিত্র এক কল্পজগত সৃষ্টি করেছেন অঁদ্রে মাল্‌রো।

তাই, 'সাংহাই-এ ঝড়' আজো বহুলভাবে সমাদৃত, ক্লাসিকরূপে গণ্য এক অনন্য শিল্পকর্ম।

L'ESPOIR

Pour Nasreen
et Mahmud Shah
Qureshi,
avec le bien sympathique
souvenir d'
A. Malraux
1973

Pour
Monsieur Mahmud Shah Qureshi
en bien sympathique souvenir d'
A. Malraux
ORAISONS FUNÈBRES
Dacca, 1973

আল্‌বের্ কাম্যু- শতবর্ষে স্মরণ ও মূল্যায়ন

পৃথিবীর সব ভাষার বর্ণমালা ও ধ্বনিপুঞ্জে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। একরকমের মনে হলেও সেসব যথার্থ এক নয়। কোনো ফরাশি নাম বা লেখা দেখলে আমাদের দেশে সাধারণত মনে করা হয় তা ইংরেজির মতনই হবে। না, আসলে অনেক ভিন্নতা আছে। তার কারণ ফরাশি উচ্চারণ সম্পূর্ণ আলাদা। আর যে অক্ষরগুলো ইংরেজি মনে করা হচ্ছে তা আসলে ফরাশি এবং একে সে দেশবাসীরা বলেন- 'লাল্‌ফাবে ফ্রঁসে'। একটা উদাহরণ দেবো- A অক্ষর ইংরেজিতে অনেকভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু ফরাশিতে শুধু 'আ'। সুতরাং যখন Albert Camus নামটি উচ্চারিত হবে তখন আমাদের মনে রাখতে হবে আল্‌বের্‌র কাম্যু নামের এক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের কথা, যিনি ১৯৫৭ সনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এটা ইংরেজিতে হয়তো 'এ্যালবার্ট ক্যামুস' হতে পারতো। কাম্যুর তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস আছে যার জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত : L' 'ETRANGER, LA PESTE ও LA CHUTE; *L'Étranger*/ লেত্রঁজে-এর ইংরেজি তর্জমা *The Stranger* কিংবা *The Outsider* আমাদের কাছে এসেছে। শেষোক্ত শিরোনামটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে কেননা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুবাদটি পাঠ্য- তালিকার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যদ্দূর মনে পড়ে, ১৯৫৮/'৫৯ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃত অনুবাদ 'অচেনা' ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গে প্রকাশিত হতে দেখেছি। কিন্তু পুস্তকাকারে বেরিয়েছে কি না জানি না। বই তো দূরের কথা কোনো বিজ্ঞাপনও চোখে পড়েনি। ফরাশি বইটি মূলত এক হতচ্ছাড়া যুবকের কাহিনী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* গ্রন্থের যুবক শিক্ষকের সমগোত্রীয়। অবশ্য দুজন দুই দূরবর্তী দেশের মানুষ। মন-মানসিকতায় তাদের ভিন্নতা স্বাভাবিক। আলজেরীয় ফরাশি যুবক MEURSAULT ম্যরসো মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশে অপারগ, সেজন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে। সে শুধু সমাজের কাছে নয়, নিজের কাছেও অনেকটা অচেনা/ অপরিচিত। ১৯৪০ সালের মে মাসে *লেত্রঁজে* লেখা শেষ করেন কাম্যু। এর আগে প্রায় একই বিষয়ে

তিনি *লা ম্যর উ্যরোজ* (সুখী মৃত্যু) নামে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তা বাতিল করেন। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে *লেত্রঁজে* প্রকাশিত হয় গালিমার প্রকাশনালয় থেকে। জানা যায়, বইটি প্রথমে এক বিশেষজ্ঞ পাঠক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু অঁদ্রে মাল্‌রোর হস্তক্ষেপে সেটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, কাম্যু ছিলেন পূর্বসূরি ফরাশি কথাসাহিত্যিক অঁদ্রে জীদ ও অঁদ্রে মালরোর অনুরাগী। মাল্‌রোর একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি মঞ্চস্থ করেন আলজেরিয়ায়। ১৯৩৮ সালে তাঁর সঙ্গে মাল্‌রোর সাক্ষাৎ ঘটে।

লেত্রঁজে নিয়ে আমাদের দেশেও প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-র মুখপত্র ল্য ফ্ল্যাভ-এ বইটি সম্পর্কে দুটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যা এখানে উদ্ধৃত হলো-

"The Outsider is a compelling dreamlike fable"

"One of those books that mark a reader's life indelibly" (William Boyd).

সম্ভবত সেখানে এক বা একাধিক আলোচনা সভা হয়েছে। তাছাড়া *লেত্রঁজে* অবলম্বনে 'দা আউটসাইডার' নামে সম্প্রতি একটি বাংলা নাট্যাভিনয়ও হয়েছে শিল্পকলা একাডেমিতে।

যুগপৎ আলজেরীয় ও ফরাশি পশ্চাদপটে গড়ে-ওঠা এই মহান লেখকের জীবনের জটিল অগ্রগতির কথা আমাদের জানা প্রয়োজন। তাই আল্‌বের কাম্যুর জীবনপঞ্জির সঙ্গে জড়িত সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

১৯১৩ সালের ৭ নভেম্বর আলজেরিয়ার মোঁদাভি এলাকায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ল্যুসিয়্যাঁ কাম্যু একজন ক্ষেতমজুর- আঙুর চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফ্রান্সের আলজাস অঞ্চল থেকে ১৮৭১ সালে আলজেরিয়ায় বসবাস শুরু করে তাঁদের পরিবার। তাঁর মা কাথরিন সিনতেস্ ছিলেন হিস্পানি বংশোদ্ভব নয় সন্তনের দ্বিতীয়া কন্যা। আল্‌বেরের এক বড় ভাই ছিল যার নামও ল্যুসিয়্যাঁ।

১৯১৪ সালের ২ আগস্ট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

'আমি বড় হয়েছি আমার বয়সী সব মানুষের মত প্রথম (মহা) যুদ্ধের ডামাঢোলের মধ্যে, এবং আমাদের ইতিহাস এরপর থেকে হত্যা, অবিচার বা আক্রমণের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। '(গ্রীষ্ম)'। তাঁর পিতা যুদ্ধে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। তাঁর মা বেলকুর এলাকায় শ্রমিক ও গৃহকর্মীর কাজে লিপ্ত থাকেন। কানে শুনতে পেতেন না প্রায়, খুব কম কথা কলতেন। বদমেজাজী ও অভিনয়-পারদর্শী দাদী (বা নানী), এক পঙ্গু চাচা ও বড় ভাই নিয়ে দুস্থ পরিবারে বড় হতে থাকেন আল্‌বের। তাই লিখতে পারেন : 'মুক্তির শিক্ষা আমি মার্কস থেকে পাইনি সত্যি, দারিদ্র্য থেকে আমি তা শিখেছি।'[১] ১৯১৮-১৯২০ সালে স্থানীয় স্কুলে মেধাবী ছাত্রের পরিচয়ে আল্‌বের শিক্ষক লুই জেরম্যাঁ-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি

তাঁকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ক্লাসের বাইরেও পড়াতেন। কাম্যু তাঁর নোবেল বক্তৃতা উৎসর্গ করেছেন এই শিক্ষককে। ১৯২৩-১৯৩০ বৃত্তিধারী ছাত্ররূপে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পার হলেন। ১৯২৫ সালে অঁদ্রে জিদের 'প্রতারক' প্রকাশিত। ১৯২৬ সালে মোঁতেরলঁর 'পশুশালা' এবং অঁদ্রে মালরোর 'প্রতীচীর প্রলোভন'-এর প্রকাশ। ১৯২৮ সালে মাল্‌রোর 'বিজয়ী' বেরলো। ১৯২৮-১৯৩০ কাম্যু বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমের একজন প্রধান খেলোয়াড়। খেলায় বিজয়ের আনন্দ, বেদনার সাথে ক্লান্তি অনুভব, কিংবা পরাজয়ে কোনো সন্ধ্যায় কান্নায় তিনি আচ্ছন্ন। ১৯২৯-১৯৩০ এক চাচার মাধ্যমে পেলেন অঁদ্রে জিদের কিছু বই। বনে গেলেন বিশুদ্ধ পাঠক। ১৯৩০ মাল্‌রোর 'রাজকীয় সড়ক' প্রকাশিত। কাম্যু যক্ষ্মা আক্রান্ত। আলজেরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন। ১৯৩২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন। এক বন্ধুর কাছে তাঁর লোরকা ও অন্যান্য রচনার অনুবাদ জমা দিলেন। এ সময় দার্শনিক ও প্রবন্ধকার অধ্যক্ষ জঁ গ্রিনিয়ে-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব, যা পরবর্তী জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁকে একাধিক রচনাও উৎসর্গ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত অঁদ্রে *দ্য রিশোর* উপন্যাস 'ব্যথা' কাম্যুকে খুবই প্রভাবিত করে। জিদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন তিনি। এ সময়ে... 'স্যুদ' (Sud) পত্রিকায় তাঁর চারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। হিটলার ক্ষমতা দখল করেন ৩০ জানুয়ারি। অঁরি বারব্যুস ও রম্যাঁ রলঁ প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগদান। মাল্‌রোর 'সাংহাইয়ে ঝড়' প্রকাশিত। প্রুস্ত Proust অধ্যয়ন। জঁ গ্রীনিয়ের 'দ্বীপপুঞ্জ' প্রকাশিত। তাঁর ছোট কাব্যিক ও ব্যঙ্গাত্মক বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ কাম্যুকে প্রভাবিত করে। ১৯৩৪ সালে প্রথম বিবাহ। এক বছর পর বিবাহবিচ্ছেদ। বছর শেষে কাম্যু কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে অল্প দিনের মধ্যেই কাম্যু দলত্যাগ করেন। ১৯৩৫ সালে মাল্‌রোর 'ঘৃণা' প্রকাশিত। কাম্যু এ সময়ে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের খসড়া তৈরি করছেন। তিনি তখনও দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি শিক্ষাঋণ পেয়েছিলেন কিন্তু তাতে খরচ সংকুলান হতো না বলে নানা ধরনের কাজকর্মেও নিয়োজিত থাকতেন। ১৯৩৬ সালে পোত্যাঁ ও স্যাঁৎ ওগুস্তাঁর দৃষ্টিতে গ্রিক ও খ্রিষ্টীয় ধর্মচিন্তার সম্পর্ক বিষয়ে একটি গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করলেন। এ সময়ে পড়লেন এপিকলেৎ, পাস্কাল, কিয়ের্কেগার্দ, মাল্‌রো ও জিদ। মে : ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টের ক্ষমতালাভ। জুন : মধ্য-ইউরোপে ভ্রমণ। ১৭ জুলাই : স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু। ইতোমধ্যে কাম্যু কয়েকজন বন্ধুর সাহচর্যে নাট্য আন্দোলনে জড়িত হলেন। নাটক অনুবাদ শুরু করলেন যা ভূমধ্যসাগরীয় সাহিত্য-আন্দোলনে রূপ লাভ করল। রেডিও আলজের-এর অভিনেতারূপে নিয়োগপ্রাপ্তি এবং মাসে পনেরো দিন বিভিন্ন শহরে গমন।

১৯৩৭ সালে কাম্যুর সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ; পাসকাল পিয়া সম্পাদিত একটি

পত্রিকায় যোগদান। বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে অংশগ্রহণ। ফেব্রুয়ারি : কাম্যু ভূমধ্যসাগরীয় নতুন সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। মে : কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে একটি মেনিফেস্টো রচনা। স্বাস্থ্যগত কারণে দর্শন শাস্ত্রে 'আগ্রেগাসিয়োঁ' পরীক্ষা তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হলো (অসম্ভব রকমের পরিশ্রমসাধ্য প্রতিযোগিতামূলক অধ্যয়ন ও পরীক্ষা; ফলাফল ভালো হলে হাইস্কুল/ কলেজে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত 'কাদর্' (Cadre) শিক্ষক। ফ্রান্সে সার্ত্র, সিমন দ্য বোভোয়ার, পোঁপিদু প্রমুখ এই ডিগ্রিধারী)।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর : মাল্‌রো সম্বন্ধে রচনার উদ্যোগ। স্বাস্থ্যগত কারণে বিশ্রাম গ্রহণ। ফ্লোরেন্স ভ্রমণ। নস *(Noces)* সমাপ্ত। লেখা হলো 'আনন্দের মৃত্যু' উপন্যাস (অপ্রকাশিত)। কলেজের একটি চাকরি পেয়েও নিলেন না। অক্টোবর-ডিসেম্বর : সোরেল, নিটশে ও স্পেংলার অধ্যয়ন। নতুন নাট্য দল গঠন। রাজধানী ওঁর ত্যাগের প্রস্তুতি।

১৯৩৮ সালে মাল্‌রোর *লেস্‌পোয়ার (আশা)* প্রকাশিত। সার্ত্র-এর 'বিবমিষা' প্রকাশিত। কাম্যু বইটির প্রশংসা করেও সার্ত্র-এর নান্দনিকতার বিরোধিতা করলেন। অস্তিত্বের ট্র্যাজেডি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবিক কদর্যতার ওপর জোর দেয়ার ব্যাপারে নিন্দা করেন তিনি। তাঁর মতে, 'সৌন্দর্য, প্রেম কিংবা বিপদ ব্যতীত বেঁচে থাকা সহজই হতে পারে।' কাম্যু *কালিগুলা* লিখলেন। এবসার্ড' বিষয়ে চিন্তাভাবনা। *লেত্রঁজে* তথা *দা আউটসাইডার* (অচেনা) নিয়ে নানা খসড়া।

১৯৩৯ সালের মার্চ : জার্মানির চেকোশ্লোভাকিয়া দখল। অঁদ্রে মাল্‌রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সার্ত্র-এর 'দেয়াল' প্রকাশিত। কাম্যুর মন্তব্য : 'জীবনের অর্থহীনতার অভিপ্রকাশ একটি উপসংহার হতে পারে না। বরং শুধুমাত্র শুরু।'

মে : কাম্যুর *নস্* (প্রবন্ধপুস্তক) প্রকাশিত। আলজেরিয়ার *কাবিলি* এলাকায় একটি অনুসন্ধান উপলক্ষে গেলে তাঁর মন্তব্য : 'এর চেয়ে অধিক হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্য পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দেশের মধ্যে আর নেই।' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গ্রিস ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল।

৩ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। কাম্যুর বক্তব্য : 'প্রথম কথা হলো, হতাশ না হওয়া। যারা পৃথিবী ধ্বংসের কথা বলে তাদের বেশি আমল দেওয়া ঠিক হবে না।' স্বাস্থ্যগত কারণে যুদ্ধে যোগদানে তিনি অসমর্থ।

১৯৪০ সালে ওরঁ-র মেয়ে ফ্রঁসিন ফেরকে বিয়ে করলেন কাম্যু। উত্তর আফ্রিকীয় রাজনীতি নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। আলজেরিয়া ত্যাগ। পাসকাল পিয়ার সুপারিশে পারী-সোয়ার (Paris-soir) পত্রিকার ম্যানেজারের পদ গ্রহণ। মে : *লেত্রঁজে (L'Etranger)* রচনা সমাপ্ত। ১০ মে : জার্মানির প্যারিস আক্রমণ। ক্লেরমোঁ-তে গুটিয়ে নিল পারী সোয়ার; ডিসেম্বরে পত্রিকা ছেড়ে দিলেন কাম্যু। সেপ্টেম্বর : *সিসিপাস*-এর প্রথমাংশ রচনা। অক্টোবর : সাময়িকভাবে লিওঁ শহরে অবস্থান।

১৯৪১ সালের জানুয়ারি : ওরঁ প্রত্যাবর্তন। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল শিক্ষকতা। শিক্ষার্থীরা ইহুদি। ফেব্রুয়ারি : *ল্য মীথ দ্য সিসিপ* (প্রবন্ধগ্রন্থ) সমাপ্ত। *মবি ডিক*-এর প্রভাবে *লা পেস্ত (দা প্লেগ)* এর রচনা। তলস্তয়, মার্ক ওরেল, সাদ অধ্যয়ন।

১৯ ডিসেম্বর : গাবরিয়েল পেরি-র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর। প্রতিরোধের পক্ষে কাম্যু যে একান্তবোধ করছিলেন সেটি সেদিন তুঙ্গে উঠেছে। তবে এ বিষয়ে তিনি বেশি কিছু বলতে নারাজ। 'সাবেক মুক্তিযোদ্ধা' পরিচয় প্রদানে তাঁর তীব্র অনীহা। পাসকাল পিয়া ও রনে লেয়নো-র মাধ্যমে তিনি কোঁবা (সংগ্রাম) গ্রুপে যোগদান করলেন। পরে লেয়নো-কে তিনি 'এক জার্মান বন্ধুর প্রতি পত্র' গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। ১৯৪২ সাল : গ্রীষ্ম : কাম্যু অসুস্থ। হৃদযন্ত্র দিয়ে রক্তক্ষরণ। মেলভিল, ডিফো, বালজাক, মাদাম দ্য লাফায়েৎ, কিয়ের্কেগার্দ ও সি ফিনোজা অধ্যয়ন।

জুলাই : *লেত্রঁজে (দা আউটসাইডার/ অচেনা)* প্রকাশিত। ১৯৪৩ : *ল্য মিথ দ্য সিসিফ*, 'এক জার্মান বন্ধুর কাছে পত্র' প্রকাশিত। 'ফরাশি শ্রমিক সমাজ একমাত্র ওদের কাছেই আমি নিজেকে ভালো বোধ করি। ওদের জানা ও ওদের সঙ্গে বাঁচা এই আমার অভিপ্রায়।' (খসড়া খাতা)। কোঁবা-র অফিসে প্যারিসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কাম্যু। প্রকাশক গালিমার-এর একজন 'পাঠক' হলেন, থাকেন অঁদ্রে জিদের বাসভবনে। এ সময়ে দ্বিতীয়বারের জন্য আরাগোঁ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৪৪ : সার্ত্র-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'না, আমি অস্তিত্ববাদী নই। সার্ত্র ও আমার নাম সবসময় একত্র করে দেখা হয় বলে আমরা দুজনে বিস্মিত। আমরা এমন কি একটি ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাতে চেয়েছিলাম যে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ নিশ্চিত করে জানাতে চান যে তাঁদের মধ্যে 'কমন' কিছু নেই এবং তাঁরা পরস্পরের দ্বারা পরস্পরকে কোনো প্রভাবের জবাবদানের কথা অস্বীকার করবেন। কেননা, এটা এক ঠাট্টা বৈ তো নয়। সার্ত্র এবং আমি একে অন্যকে জানার আগে থেকে আমরা বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছি। যখন আমরা পরস্পরকে জানলাম, তখন আমাদের কাজ হলো বিভেদগুলোকে চিহ্নিত করা। সার্ত্র একজন অস্তিত্ববাদী। এবং আমি যে একটি গ্রন্থে আমার ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছি তা হলো *ল্য মিথ দ্য সিসিপ* এবং তা কথিত অস্তিত্ববাদ দর্শনের বিরুদ্ধেই লেখা।'

আগস্ট : পাসকাল পিয়ার সঙ্গে কাম্যু কোঁবা-র যৌথ-সম্পাদক। কাম্যুর *মাল অঁতঁদ্যু* (ভুল) নাটক অভিনীত। প্রধান অভিনেত্রী মারিয়া কাজারেস (এঁর অভিনয় 'দেখার সুযোগ হয়েছিল এই প্রতিবেদকের, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে, লোরকার একটি নাটকে); 'সাফল্য ফিফটি-ফিফটি'।

১৯৪৫ সালের ৮ মে : কাম্যু অঁদ্রে জিদসহ জানলেন যুদ্ধাবসানের খবর। ১৬ মে সেরিফ অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন। কাম্যুর মন্তব্য : ... 'আমার শুধু একটি কথা : ফ্রান্স যেন সারাদেশে যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে গণতন্ত্র একটি নতুন ধারণা ...।' (সাক্ষাৎকার ২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৫)। ৬ ও ৯ আগস্ট : হিরোশিমা ও

নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ। "যান্ত্রিক সভ্যতা তার সর্বশেষ পাশবিকতার স্তরে নেমে এসেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বেছে নিতে হবে সামগ্রিক আত্মহত্যা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার।" (কোঁবা, ৮ আগস্ট)

কাম্যুর *কালিগুলার* নাট্যাভিনয়। প্রধান অভিনেতা রূপে জেরার ফিলিপ-এর আবির্ভাব। (ষাটের দশকের শুরুতে তাঁর অভিনয় দেখার এবং একটি কবিতা আবৃত্তির রেকর্ডের অধিকারী হবার সুযোগ হয়েছে বর্তমান লেখকের)। ১৯৪৬ বছরের শুরুতে আমেরিকা ভ্রমণ। নিরাপত্তা বিভাগের দুর্ব্যবহার লাভ কিন্তু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল অভ্যর্থনা। নানা অসুবিধার মধ্যে *লা পেস্ত* উপন্যাস সমাপ্ত। লিমন ভেইল-এর রচনা আবিষ্কার এবং তৎকর্তৃক প্রকাশ। তাঁর প্রিয় কবি রনে শার-এর *ফইয়ে দিপ নোস* প্রকাশিত। অক্টোবর : সার্ত্র, মাল্‌রো, কোয়েস্টলার, স্পেরবার-এর সঙ্গে রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা।

১৯৪৭ : মাদাগাস্কারে বিদ্রোহ। কাম্যুর কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ। ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট পার্টি সরকার থেকে বেরিয়ে এল! বহু দল-বিভক্তির ঘটনা ঘটল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কাম্যু কারও সঙ্গে যোগ দিলেন না। জুন : লা পেস্ত প্রকাশিত ও তাৎক্ষণিক তুমুল সাফল্যলাভ। ১৯৪৭-৪৮ : লুর মার‍্যাঁ-য় গ্রীষ্ম যাপন। ১৯৪৬ সালেও কয়েক দিন কাটিয়েছিলেন সেখানে। নোবেল পুরস্কার পাবার পর তিনি একটি বাড়িও ক্রয় করছিলেন লুর মার‍্যাঁয়। দার্শনিক মারলোপঁতির সঙ্গে মতবিরোধ।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি : প্রাগে 'কুদেতা' (Coup d'Etat)। আলজেরিয়া ভ্রমণ। জঁ-লুই বারো (একজন বিখ্যাত অভিনেতা। ১৯৬০-৬৮ সালের মধ্যে তাঁর অভিনীত অনেক নাটক দেখেছি) সহযোগে *লে তাঁ দ্য সিয়েজ* নাট্য রচনার /প্রয়াস সফল হল না।

নভেম্বর: প্রবন্ধ সংগ্রহ *আকতুয়েল-১* এর কিছু অংশ লেখা।

১৯৪৯ সালের মার্চ : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত গ্রিক কম্যুনিস্টদের পক্ষে বিবৃতিদান। ডিসেম্বরে (১৯৫০) অন্যান্যদের পক্ষেও বিবৃতি প্রকাশ। জুন-আগস্ট : দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ। এই ভ্রমণ তাঁকে ভয়ানকভাবে দুর্বল করে এবং পরবর্তী দুবছর তিনি অনেকটা অবসরে কাটান। অবশ্য 'বিদ্রোহী মানব' গ্রন্থের প্রাথমিক খসড়ার কাজ চলতে থাকে। ১৫ ডিসেম্বর : তাঁর নাটক *Les Justes* অভিনীত : সের্জ রেগিয়ানি ও মারিয়া কাজারেস (দুজনের অভিনয় ও গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার) প্রধান দুই চরিত্রে।

১৯৫০ *Actuelles- 1* বের হল। প্যারিসে রু দ্য মাদাম-এ নিজের এপার্টমেন্টে কয়েক মাস বিশ্রাম।

১৯৫১ কোরিয়ায় যুদ্ধ। অক্টোবর : 'বিদ্রোহী মানব' প্রকাশিত। বছর খানেক এই বইয়ের পক্ষে-বিপক্ষে বহু লেখালেখি চলল।

১৯৫২ : আলজেরিয়া ভ্রমণ। আগস্ট : সার্ত্র-এর সঙ্গে বিরোধ। নভেম্বর : রেকামিয়ে থিয়েটারের পরিচালক পদপ্রার্থী। ফ্রাংকো শাসিত স্পেন ইউনেস্কোর

সদস্য হলে তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন (তবে তিনি ইউনেস্কোর কোনো পদে অধিষ্ঠিত কিনা জানা যায়নি। সম্ভবত কোনো কমিটির উপদেষ্টা বা সদস্য ছিলেন)। কাজের ফিরিস্তি : উপন্যাস: 'প্রথম পুরুষ' নাটক : ডন জুয়ান। নাট্যরূপ : দস্তয়েভস্কির *দা পজেস্‌ড*।

১৯৫৩ পূর্ব বার্লিনে দাঙ্গা। ৭ জুন : *Actuelles-II* প্রকাশিত। ১৯৫৪ : বিশ্রাম। 'গ্রীষ্ম' প্রকাশিত।

১৯৫৫ সালের মার্চ : ১৯৩৯-১৯৫৩-র দিনো বুজ্জাতি-র একটি মজার ঘটনার নাট্যরূপ প্রস্তুত। মে : গ্রীস ভ্রমণ। থিয়েটার সম্পর্কে বক্তৃতা। জুন : সাংবাদিকতায় প্রত্যাবর্তন। 'লেক্সপ্রেস' পত্রিকায় যোগদান। আলজেরিয়া ভ্রমণ। সেখানে গোলমেলে পরিস্থিতি। ফেব্রুয়ারি : লেক্সপ্রেস পত্রিকা পরিত্যাগ। ২০ সেপ্টেম্বর : কাম্যু-প্রদত্ত নাট্যরূপে ফকনারের *Requiem pour une nonne*. বুদাপেশতে বিদ্রোহ। একটি প্রতিবাদী সভায় যোগ দিলেন কাম্যু। ফরাশি- ইংরেজদের সুয়েজ নিয়ে মিশরে সামরিক অভিযান। কাম্যুর *লা* শুৎ (পতন) প্রকাশিত। ১৯৫৭ মার্চ : একমাত্র গল্পগ্রন্থটির প্রকাশ (*এগজিল*) জুন : নাট্যোৎসবে কাম্যুর নাটকের সাফল্য। মৃত্যুদণ্ড বিরোধী রচনা প্রকাশ। ১৭ অক্টোবর : সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ। এ ক্ষেত্রে তিনি নবম ফরাশি বিজয়ী।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি : 'সুইডেনের ভাষণ' প্রকাশ। মার্চ : *L'Envers et l'Endroit* নতুন ভূমিকাসহ পুনঃপ্রকাশ। জুন : *Actuelles-III* মূলত আলজেরিয়া সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে রচিত রচনা সমষ্টি প্রকাশিত। তারপর বহুদিন শরীর খারাপ। ১৯৫৯ কাম্যুর নির্দেশনায় দস্তয়েভস্কির দা পজেসসড-এর নাট্যরূপ প্রদর্শিত। নানা লেখালেখির কাজে ব্যতিব্যস্ত কাম্যু লুর মার‍্যাঁর নিজের বাড়িতে বসে 'প্রথম পুরুষ' এর অনেকটা স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেন। ১৯৬০ : ৪ জানুয়ারি ভিলবাভ্যাঁ-য় গাড়ি-দুর্ঘটনায় কাম্যু ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রকাশক মিশেল গালিমার-এর গাড়িতে। উল্লেখ্য যে, তাঁর কাছের মানুষ অঁদ্রে মাল্‌রোর দুই পুত্রেরও কাছাকাছি জায়গায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কয়েক বছর আগে।

কাম্যুকে জানতে হলে বুঝতে হবে তাঁর 'অর্থহীনতার দর্শন' যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'অ্যাব্‌সার্ড ফিলজফি'। শুরুতে এর সঙ্গে অস্তিত্ববাদের কিছু মিল থাকলেও এটা পরিষ্কারভাবে আল্‌বের কাম্যুর নিজস্ব দর্শনরূপে পরিস্ফুট হয়েছে *লেত্রঁজের* সমসময়ে প্রকাশিত *ল মিথ দ্য সিসিপ* (সিসিফাসের মিথ, ১৯৪২)। পরবর্তীতে নাটক *কালিগুলা* (১৯৩৭-১৯৪৬) এবং *ল্য মাল অঁতঁদ্যু* ('ভুল' ১৯৪৪) থেকে উপন্যাস *লা পেস্তে* (১৯৪৭) তা বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়েছে। এই তত্ত্ব অ্যাবসার্ড থেকে বিদ্রোহ, মুক্তি, 'প্যাশন' বা তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, যা কাম্যুর কলমে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। এই যে জীবনটা, কী অর্থ আছে তা চালিয়ে নেবার? কী-ই বা তাৎপর্য বেঁচে থাকার? বেশির ভাগ মানুষের জন্য বেঁচে থাকা মানে অভ্যাসের

দাসে পরিণত হওয়া। আত্মহত্যা জীবনের অর্থ সংক্রান্ত মূল প্রশ্নকে সামনে তুলে আনে। দৈনন্দিন যাপিত জীবনের গভীর অর্থশূন্যতা, দুঃখভোগের অযৌক্তিকতা স্বেচ্ছামৃত্যুকে স্বাভাবিক করে নেয়। বস্তুত, পৃথিবীটা তো অর্থহীন নয়, বরং তার চরিত্রগত অযৌক্তিকতার সঙ্গে সংঘাত। গভীরভাবে মানুষের অভ্যন্তরে ঢুকে পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হবার পথে নষ্ট-অভিপ্রায় স্বরূপ দাঁড়ায়। তাই অ্যাবসার্ড মানুষের মধ্যেও নয়, পৃথিবীর মধ্যেও নয় বরং তাদের উভয়ের একত্র উপস্থিতিতে।

বর্তমান আলোচনায় আমরা কাম্যুর তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস কিংবা কাহিনিমূলক রচনা- *লেত্রঁজে*, *লা পেস্ত* এবং *লা শ্যুৎ* সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করবো। ফরাশি কথাসাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে মোরিস বারেস (Maurice Barres ১৮৬২-১৯২৩)-এর উত্তরসূরি ক'জন স্বনামধন্য মোঁতেরলঁ, আরাগোঁ, দ্রিয়্য, মাল্‌রো এবং কাম্যু। বিশ শতকের তিরিশের দশকে মাল্‌রোর *সাংহাইয়ে ঝড়* (১৯৩৩) এবং *লেস্‌পেয়ার (আশা*, ১৯৩৭) চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার জগতে যে নতুনত্ব নিয়ে এলো সার্ত্র ও কাম্যু তারই অগ্রগতি সাধন করলেন যথাক্রমে *লা নোজে* (বিবমিষা, ১৯৩৮) ও *লেত্রঁজে (দা আউটসাইডার/* অচেনা, ১৯৪২) প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে দুজনই ছিলেন নিরীশ্বরপন্থী মানবতাবাদী কিন্তু সার্ত্র যেখানে অস্তিত্ববাদ নিয়ে বিশ্বজুড়ে তুলকালাম কাণ্ড করে ফেললেন, কাম্যু সেখানে নৈঃসঙ্গ ও নিরর্থকতাকে প্রাধান্য দিয়ে সমকালের জীবন ও জগতের এক ভিন্ন ভাষ্য নির্মাণ করলেন। তাই ফরাশি উপন্যাসের ধারায় তাঁর *লেত্রঁজে* বিবেচিত হলো একটা Récit, লা পেস্ত একটা Chronique এবং লা শ্যুৎ (পতন) একটা Allégorie রূপে। জটিল সংজ্ঞা নির্ণয়ের ঘেরাটোপে না ঢুকেও আমাদের সংক্ষেপে এই তিনটি ধারার পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত Récit বলতে আমরা বুঝব- বাস্তব আখ্যান, কাহিনী, সারসংক্ষেপ ইত্যাদি। আর 'ক্রনিক' বিশেষ সময়ে সংঘটিত ঘটনার, ধারাভাষ্য, ইতিবৃত্ত এবং Allégorie কোনো কল্পনাত্মক বিষয়কে ব্যক্তির উদাহরণে জীবন্ত করে তোলার পদ্ধতি। অর্থাৎ এক প্রতীকাশ্রয়ী কাহিনি, যা আগেকার দিনে খুবই চালু ছিলো। *লেত্রঁজে* (L'Etranger) উপন্যাসটি কাম্যু তাঁর অ্যাবসার্ড দর্শন আখ্যানের অভ্যন্তরে প্রকাশ করেছেন। কাহিনির নায়ক ম্যরসো আত্মকথার ভঙ্গিতে চারপাশের জীবন ও জগতের সব তথ্য প্রকাশ করছেন। তিনি একজন সাধারণ কর্মচারী। আলজেরীয় পরিবেশে কোনোরকমে তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। কোনো কিছুতে তাঁর অধিক আগ্রহ নেই, চিন্তা-চেতনায় প্রবল নৈরাশ্য। এক অদ্ভুত অনীহা তাঁর কাজেকর্মে এবং ভাবনায়। সবই সমান তাঁর কাছে। অ্যাবসার্ড ধারণায় অভিষিক্ত হবার পূর্ব পরিস্থিতিতে তার আবির্ভাব কিন্তু ক্রমশ তিনি জীবনের অর্থশূন্যতার মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছেন। এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক এবং হতাশাব্যঞ্জক বর্ণনায় কাম্যু তাঁর পাঠককে অভ্যস্ত করে তোলেন যাতে অর্থহীনতার সেন্টিমেন্টই শেষ অবধি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আশ্রয়কেন্দ্রে মৃত মায়ের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় এসে ম্যরসো নিয়ম মোতাবেক যাবতীয় ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম পালন করে চলেছিলেন।

নিঃসন্দেহে তাঁর অন্তরে ব্যথা পোষণ করছেন। কিন্তু প্রকাশে অযোগ্যতা এবং গ্রীষ্মতাপে পীড়িতে হয়ে তিনি আশপাশের মানুষের মতো তা প্রদর্শনে অপারগ। পরের দিনই পুরনো এক বান্ধবী মারি কার্দোনাকে পেয়ে তার সঙ্গে সাঁতার কাটতে গেলেন। গেলেন একটা কমিক চলচ্চিত্র দেখতে। বিরক্তিকর ও মামুলি জীবন ধারায় এক রোববার মারি ও তাঁর বন্ধু রেয়মোঁ-র সঙ্গে ম্যরমো শহরতলির সমুদ্রতীরে ছোট্ট কুঁড়েঘরে বসবাসরত মাসোঁ আর তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গেলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিন ব্যাটা ছেলের সঙ্গে দুই আরব যুবকের ঝগড়া লেগে যায়। কোনো মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে ওরা রেয়মোঁর বাহুতে ছুরিকাঘাত করলো। দ্রুত নিজের ঢেরায় ফিরে তাঁর রিভলভারটা নিয়ে ম্যরসো ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি আরবকে খুন করে ফেললেন। সেখানে তখন প্রবল সূর্যালোক। ম্যরসো মায়ের কবর দেয়ার সময় যেরকম রোদের তাপে ঘর্মাক্ত হয়েছিলেন তখনও ঠিক তা-ই হলেন। ম্যরসো এক অদ্ভুত পরিবেশে চারটা গুলি মেরে আরবের দেহকে নিস্পন্দ করে দিলেন। বিচারকার্য শুরু হল। সবাই ম্যরসোর নিস্পৃহ হাবভাবে অবাক হলো। এ পরিস্থিতি একদম অচেনা। প্রথাসিদ্ধ আচরণ ও মূল্যবোধ এখানে অদৃশ্য। খুনের চেয়েও তখন তদন্ত সাপেক্ষে জ্ঞাত মায়ের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় আসামির দৃশ্যত নিরাসক্ত শোকতাপহীনতা তাঁকে আসল ক্রিমিনালরূপে চিহ্নিত করল এবং তাঁর জন্য মৃত্যুদণ্ড বরাদ্দ হল। কারাগারে ম্যরসোর মনে বহু বিচিত্র ভাবনার উদয়, পলায়নী মনোভাব, আইন সংশোধনের আশা, ধর্মযাজকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত প্রত্যয়। খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় ম্যরসো পাদ্রীকে জানালেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তাই অন্য জগতে আনন্দিত মুহূর্ত কাটানোর চাইতে এই মাটির পৃথিবীতেই তিনি শেষ মুহূর্তগুলো কাটাতে চান। উপন্যাসের উপসংহারে এই অ্যাবসার্ড মানুষটি অতীতের সুখস্মৃতি, একটি তারাভরা রজনীর মধুর অনুভূতির কথা স্মরণ করে খুশি। যে অল্প-স্বল্প সময় তার আছে তা ঈশ্বরের জন্য তিনি হারাতে পারেন না। যাবার সময় অশ্রুসিক্ত হয়ে ফেরেন পাদ্রী।

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে কাম্যু মার্কিন মুলুকে যান। নিরাপত্তা বাহিনীর অসদাচরণ তাঁর কাছে সহনীয় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব সমাজের আন্তরিক অভ্যর্থনায়। সেখানে বসে তিনি তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত উপন্যাস লা পেস্ত *(দা প্লেগ)* সমাপ্ত করেন। অনেকে এতে *মবি ডিক*-এর প্রভাব রয়েছে বলে অনুমান করেন। মহামারীরূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে জনবসতিতে যে দুর্যোগ নেমে আসে তার চিত্র অংকনে কাম্যু ব্যবহার করেছেন এই রোগের ইতিবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীকে। ধর্ম ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়েও তাঁর নানা প্রশ্ন। তাঁর কাছে 'একভাবে বলতে গেলে চিকিৎসক হলেন ঈশ্বরের শত্রু। কারণ তিনি লড়াই করেন মৃত্যুর বিরুদ্ধে।' দর্শনের ছাত্র ও দর্শনবিষয়ক বহু রচনার লেখক কাম্যু একটা সুইস পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন : 'আমি কোনো দার্শনিক নই। একটা সিস্টেমে বিশ্বাসী হবার মতো পর্যাপ্ত বিশ্বাসবোধ আমার নেই। আমার শুধু জানতে আগ্রহ

কেমন করে কেউ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী থেকে কিংবা যুক্তিতে অপারগ হয়েও নিজেকে পরিচালিত করতে সক্ষম।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তৃতি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিভেদ ঘটালো। হিটলারের যেনতেন প্রকারে রাজ্য দখলের রাজনীতি এবং 'সবই সম্ভব/ অনুমোদিত' নীতির বিরোধিতা করলেন কাম্যু। 'জর্মন বন্ধুর কাছে চিঠি' (১৯৪৮ সালে প্রকাশিত) রচনায় তিনি লিখলেন :

'আমি সুবিচারের পক্ষে। মাটির প্রতি আমি বিশ্বস্ত। আমি বিশ্বাস করে যেতে চাই যে এই পৃথিবীতে কোনো উঁচু ভাবনা (sens) নেই। কিন্তু আমি জানি যে, এর ভেতর যদি কিছু-একটা অর্থ থাকে, এবং এটা একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। কেননা একমাত্র মানুষই দাবি করতে পারে যে তাঁর সেটা আছে।' এই নতুন চিন্তার অভিব্যক্তি স্বীকৃতি পেল তাঁর *লা পেস্ত* (দা প্লেগ ১৯৪৭) কাহিনিতে এবং তার যথার্থ ব্যাখ্যা ঘটল 'বিদ্রোহী মানব' (*লম্ রেভল্‌তে*, ১৯৫১) গ্রন্থে। কাম্যুর কল্পনায় আলজেরিয়ার শহর ওঁর (Oran) তে ছড়িয়ে পড়েছে প্লেগ। তার সাক্ষী ডা. রিয়্য-র রোজনামচার মাধ্যমে আমরা ঘটনার নাটকীয় বিস্তারের বাস্তবচিত্র পাই। বিশ্বের এক প্রান্তে হাজার মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এই মারাত্মক রোগের কারণে। কাহিনির বাস্তবতার মধ্যে রূপ লাভ করেছে মিথ এবং শারীরিক ও নৈতিক অস্তিত্বের দুরবস্থা। এর সঙ্গে তুলনীয় জার্মান দখলদারিত্ব, কনসেনট্রেশান ক্যাম্প, আণবিক বোমা, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের ঈশ্বরতুল্য অবস্থান, সার্বভৌম যন্ত্রপাতি আর অবিবেচক প্রশাসন। খুবই দক্ষতার সঙ্গে কাম্যু সাজিয়েছেন তাঁর আখ্যানে। প্রথমত, চিকিৎসকের মহামারীর উপস্থাপনা, ব্যর্থতা সত্ত্বেও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, নতুন টীকা আবিষ্কারের ফলে আশাবাদ, যন্ত্রণা, কবর, দাহ- একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অবশেষে একত্ববোধের শিক্ষা লাভ। আশাহীন এক সংগ্রামে সৌভ্রাতৃত্বের আবির্ভাব। কাহিনির বহু জটিলতায় আমরা পাই সাংবাদিক রবের ও তাঁর প্যারিসে আটকে পড়া প্রেমিকার কারণে নিজের শহর ওরঁ ছাড়তে অনিচ্ছুক, ফাদার পেনেলু কর্তৃক ঈশ্বরের মহানুভবতাকে মানবিক দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যবহার, তারপর রয়েছেন একজন বুদ্ধিজীবী ও 'অ্যাবসার্ড ম্যান' যিনি দুঃসহ দিনগুলিতে নিজেকে বিদ্রোহী মানুষে রূপান্তরিত করে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বে শান্তিলাভ করেন। তাছাড়া কাহিনির বর্ণনাকারী ডাক্তার রিয়্য যিনি প্লেগের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থেকে লেখকের ধারণা চিন্তার ধারকবাহক।

একটি শিশু-মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাক্তার ও ফাদার ভয়ানকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বহু আলোচনার পর ডাক্তার রিয়্য ও বুদ্ধিজীবী তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শুধু একজন সত্যিকার চিকিৎসক নয় একজন যথার্থ মানুষ হওয়া চিকিৎসকের কাম্য যেমন বুদ্ধিজীবী হতে চান 'ঈশ্বরহীন সিদ্ধপুরুষ'। কিন্তু মহামারীর শেষ পর্যায়ে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেলেন। ডা. রিয়্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আদ্যোপান্ত ঘটনা তিনি লিখে যাবেন কেননা 'মানুষের মধ্যে ঘৃণার চাইতে প্রশংসার বিষয় বেশি রয়েছে'।

লা শ্যুৎ ('পতন', ১৯৫৭) আমার অতি প্রিয় গ্রন্থ। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কাম্যুর এই ছোট কাহিনিটি মূল ফরাশি ভাষায় এবং ঐ দশকের শেষের দিকে বাংলা অনুবাদে পড়েছি। যদ্দূর মনে পড়ে, *পতন* নামে প্যারিসে একই সময়ে অধ্যয়নরত আমার বন্ধু এবনে গোলাম সামাদ কৃত অনুবাদ বাংলা একাডেমি ছেপেছিল। বইটি নিয়ে কোনো আলোচনা-সমালোচনা আমার চোখে পড়েনি। আমার সংগ্রহে আলবের কাম্যু রচনা সমগ্রের প্রথম খণ্ডে বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭৩-১৫৫৯। এ আরেক কাম্যু! এবং স্মৃতির সাক্ষ্যে বলা যেতে পারে, অসাধারণ! এই উপস্থাপনা, কাম্যুর বক্তব্য, টীকা ও পাঠান্তর রয়েছে ২০০০-২০২৮ পৃষ্ঠায় (ছোট অক্ষরে)। যুদ্ধ এবং ও তার অবসানে যুগান্তরের যে সূচনা তারই তিক্ত ও *Cynique* চিত্র উঠে এসেছে পতন কাহিনিতে। বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট কাম্যুর কাছে 'প্যারিস একটি জঙ্গল' রূপে প্রতীয়মান। আগস্ট ১৯৫২ সালে সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর পত্রবিবাদ তাঁকে বেদনার্ত করে তুলেছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়, অবিচারে তিনি অতিষ্ঠ। *পতনের* কাহিনিকার স্বয়ং নায়ক ক্লামঁস। তিনি কথার ফাঁদে ফেলে নিজেকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেন। *লেত্রঁজে* যেখানে অপ্রত্যয়, কখনো কিছুটা অমার্জিত ভাষায় শব্দ ব্যবহারে আমাদের অভ্যস্ত করে, *পতন* সেখানে অতি প্রত্যক্ষ, বক্তব্যের সহজতম প্রকাশ ঘটায়। আবার বক্তব্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে ইচ্ছাকৃত ভারসাম্যহীনতা প্রদর্শন করে। কখনো কাব্যিক, কখনো ব্যঙ্গ, তির্যক প্রকাশে ঋদ্ধ। ম্যরসো যেখানে সারল্য ও শুদ্ধতায় প্রায়- নগ্ন ক্লামঁস ভালোমন্দ দুদিক, মুখোশ হাঁদারাম সেজে একজন বড় রকমে স্বচ্ছ থাকতে নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে নেয়। অন্যজন সেখানে তার প্রশ্নকর্তার ও পাঠকের মতো করে তোলে নিজেকে। সংক্ষেপে *কালিগুলার* বুর্জোয়া অবতারটি যেন দিদ্‌রোর রামোর ভাইপো-র আরেক সংস্করণ। কাম্যু *পতন* লিখেছিলেন মানুষের কর্মজীবনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। বইটির দুটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। একটি তিরিশ পৃষ্ঠার অন্যটি সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার। ছোট হলেও কাম্যু এতে তাঁর আগ্রহের বিষয়গুলো সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কাম্যু তাঁর গ্রন্থের একটি ছোট্ট 'প্রাসঙ্গিক' সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাতে লেখা : 'কথক ঠাকুর পরিকল্পিত স্বীকারোক্তি, তিনি আমস্টরডামে শরণার্থী। শহরটি নদীনালায় ভর্তি, ঠাণ্ডা আলো এই পুরনো উকিল সাধুসজ্জন সেজে কাল্পনিক শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে" কথাবার্তা বলে চলেছেন। তিনি আধুনিক। তাঁকে বিচার করা চলবে না। তাই তিনি নিজেই নিজের বিচার শুরু করে আসলে অন্যদের বিচারই করে চলেছেন। যে আয়নায় নিজের মুখ দেখবেন, তা অন্যদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কোথায় অপরাধের স্বীকারোক্তি না অভিযোগ? তিনি কি নিজের না তাঁর সময়কালের বিচারে প্রবৃত্ত? এটা কি এক বিশেষ ক্ষেত্র, না প্রতিদিনের মানুষের? যার একক সত্য ওই বরফের খেলায় : বেদনাও তার অনুষঙ্গ।'

১৯৫২ সাল থেকে কাম্যু নতুন ধরনের সাহিত্যকর্মের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন যার একটি হল *পতন*, অন্যটি *L'Exil et Le Royaume* (নির্বাসন ও সাম্রাজ্য,

১৯৫৭) এতে রয়েছে ছ'টি ছোট গল্প। এছাড়া একটি উপন্যাস *Le premier Homme* (প্রথম পুরুষ) যা কাম্যুর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৯১-র দশকে ছাপা হলে বর্তমানে লেখকের অধিকারে রয়েছে একটি কপি। নাট্যকর্মের মধ্যে পাই পাঁচটির নাম : *কালিগুলা* (৪ অঙ্কের নাটক...), *ল মাল্ অঁতঁদ্যু* (৩ অঙ্কের দৃশ্য....) *লেতঁ দ্য সিয়েজ* (৩ অঙ্কের দৃশ্য.....), *লে জ্যুস্ত্* (৫ অঙ্গের নাটক), *রেভল্ত্ দঁ লেজাসত্যুরি* (৪ অঙ্ক, যৌথ সৃজনকর্ম!) প্রথম খণ্ডে অন্যের অনুসরণে ৬টি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। তবে মাল্‌রোসহ কয়েক জনের রচনার নাট্যরূপ রচনা সমগ্রে নেই। আলবের কাম্যুর 'রচনা সমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৫ পৃষ্ঠা) শুধুমাত্র প্রবন্ধের সংকলন। এতে দশটি গ্রন্থ, অতিরিক্ত পাঠ-স্বরূপ টীকা ও পাঠান্তর রয়েছে।

একই সঙ্গে নীতিবানের মহৎ, অতি উচ্চ ও দার্ঢ্য গুণাবলী এবং লেখকের জীবন্ত সংবেদনশীলতা ও আলোকিত চিন্তাচেতনার প্রকাশ-ক্ষমতা আল্‌বের কাম্যুকে সম্মানিত ও স্মরণীয় করে রেখেছে বিগত সাত দশকের বেশি সময় ধরে।

সার্ত্রকে দেখা সার্ত্রকে শোনা

সার্ত্র নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। ১৯৫৫ সালে হেলসিংকিতে সিমনকে নিয়ে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তাঁর যোগদানের খবরটিও ঢাকায় বসে জেনেছিলাম। এর কয়েক বছর পর স্বয়ং প্যারিসে গিয়ে তাঁর ভাষায় লেখা বইপত্র পড়ছি, বিস্মিত হচ্ছি- এ এক সৌভাগ্যের ব্যাপার বটে। কোনো এক মার্কিন সাময়িকীতে পড়লাম, আলজেরীয় যুদ্ধের সময় যখন সার্ত্রের নেতৃত্বে ১২১ জন বুদ্ধিজীবী ফরাশি বাহিনীর পক্ষে অংশ না নেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান, তখন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের কাছে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে জবাব পেলেন, 'না, তিনিও ফ্রান্স'। অর্থাৎ একদিকে তো আছি আমি নিজে, অন্যদিকে তিনিও রাষ্ট্রের প্রতিভূ। পরবর্তীকালেও বহু রাষ্ট্র বা সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডেও তাঁকে কখনো বন্দী হতে হয়নি। অর্থাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করার সাহস হয়নি কোনো সরকারের।

সার্ত্র সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মাল এক মেক্সিকান বন্ধুর সুবাদে। বন্ধুটি ডাক্তার, কিন্তু ভীষণ সাহিত্যরসিক। সার্ত্রের বই পড়ি বেশির ভাগ ওর কাছ থেকে ধার করে। সম্ভবত দু-একটা বই এখনো রয়ে গেছে আমার কাছে। তবে আমার নিজের সংগ্রহও মোটামুটি মন্দ নয়। একবার এক ফরাশি রাষ্ট্রদূত আমার বাড়িতে এলে একটু গর্বের সঙ্গে আমার মাল্‌রো সংগ্রহ তাঁকে দেখাই। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের চোখ চলে গেল বুকশেলফের অন্য প্রান্তে। 'হ্যাঁ, প্রফেসর সাহেবের সার্ত্র সংগ্রহও তো বেশ সমৃদ্ধ দেখছি!'... যা হোক, আমার মেক্সিকান বন্ধুটি আমাকে 'লে দ্যো মাগো' কাফেতে নিয়ে যায় একবার, আরেকবার 'কাফে দে ফ্ল্যরে'। সার্ত্র একসময় এসব কাফেতে বসতেন, লিখতেন, বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকতেন বলে শোনা যায়। সেসব কাফেতে আমি বহুবার গিয়েছি। কিন্তু তাঁকে কখনো পাইনি। তাছাড়া স্যাঁ জেরম্যাঁ-দে প্রে ও মোপারনাসের যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, তার আশপাশেও

বহুবার যাতায়াত করেছি। কিন্তু না, দর্শন মেলেনি।

১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁকে দেখার ইচ্ছা হলো, একবার সুযোগও ঘটল, কিন্তু শেষ অবধি নিজেই নাকচ করেছিলাম। কারণ, আমার নিজের কাজের প্রভূত ক্ষতি হয়ে যেত তাতে।

অবশেষে একটা নতুন সুযোগ এল। আফ্রিকার আরব-মুসলিম ছাত্রদের একটি রেস্তোরাঁ ছিল প্যারিসের ১১৫ বুলভার স্যাঁ মিশেলে, যাতে আমরাও সদস্য হয়ে সপ্তাহে দু-তিন বেলা খেতে যেতাম। সেখানে সার্ত্র একবার বক্তৃতা করতে এলেন। আমি ক্ষুদ্রায়তনের হলঘরে গিয়ে বসে বক্তৃতা শোনার সুযোগ পাইনি। বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে শুনেছি তাঁর অতি তীব্র কণ্ঠের সুচয়িত শব্দের উচ্চারণ। রাজনীতির সঙ্গে দার্শনিক যুক্তি পরিবেশনায় উপস্থিত আরব ছাত্রদের প্রশংসা লাভ করছিল সে ভাষণ। উঁকি দিয়ে একটু দেখে থাকলেও কিছু পর আমার পাশ দিয়ে সদলবলে বেরিয়ে গেলেন সার্ত্র। বেঁটে-খাটো, সাধারণ ফরাশির চেয়ে কম ফর্সা-অল্প দেখা মানুষটি।

তবে পরিষ্কার তাঁকে দেখলাম আর শুনলাম আরও পরে, ১৯৬৮ সালের মে মাসে। প্যারিসে তখন ছাত্র বিদ্রোহ। একপর্যায়ে সার্ত্র এলেন সর্বনে। সে এক এলাহিকাণ্ড! ভিড়ের কথা আঁচ করে মরক্কোর এক বন্ধুসহ আগেভাগে জায়গা নিয়ে বসলাম। ৫০ কি ১০০ জন সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার-সমেত সার্ত্র ঢুকলেন। খুব অল্প ভূমিকাস্বরূপ কিছু বলে তিনি সরাসরি প্রশ্ন আহ্বান করলেন। সেবার অনেকে নাকি তাঁর জবাবে সন্তুষ্ট হননি। তাঁকে নাকি অনেক রক্ষণশীল শোনাচ্ছিল। আমরা অর্থাৎ সাধারণ দর্শক কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনেছি এবং যথাসময়ে হাততালি দিয়ে চলেছি। তাঁকে একটু বিরক্ত ও ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। তবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক প্রতিভাদীপ্ত পুরুষকে প্রত্যক্ষ করছি, এই বোধ আমাদের সর্বক্ষণ ছিল।

সিমন দ্য বোভোয়ার : নারীমুক্তির পথিকৃত

আমাদের দেশে সার্ত্র-সিমন প্রসঙ্গ এখনো আলোচিত হয়। বিশেষত সার্ত্র। অথচ সিমনই বেশি প্রাসঙ্গিক, নারীবাদী ঢেউয়ের কারণে। নামটি অবশ্য উচ্চারিত হয়, কখনো উদ্ধৃতিও দেখি তাঁর নানা লেখা থেকে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সম্ভবত কেউ করেননি, অন্তত আমার চোখে পড়েনি। বিষয়টিতে বহু আগে আমার কিছু আগ্রহ জন্মেছিল। কিন্তু নানা কারণে এতোকাল সিমন দ্য বোভোয়ারকে নিয়ে কিছু লেখা সম্ভব হয়নি।

১৯৬০-এর গ্রীষ্মকালে আমি ছ'সপ্তাহের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একসিটার কলেজের বাসিন্দা-ছাত্র ছিলাম। আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছিল এমন এক ছাত্রের কক্ষে যার একটা সুন্দর গ্রন্থ-সংগ্রহ ছিল। সেখানে সিমন দ্য বোভোয়ার-এর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'- ইংরেজি অনুবাদে *দা সেকেন্ড সেক্স*- বইটি পাই এবং আদ্যোপান্ত পড়ে আমি বিমোহিত হয়েছিলাম। আমার মনে হলো, এই গ্রন্থের জন্য তো তিনি ডক্টরেট পেতে পারতেন। অবশ্য তার যে 'আগ্রেজে' ডিগ্রি আছে, সেটা ফ্রান্সে অনেক গৌরবমণ্ডিত। সে সময়ে আমার কাছে সেটাকে মনে হতো আমাদের দেশের এম.এ+এমএড্+সিএসএস! ফ্রান্সে সেটি অতি কষ্টে পেয়ে একজন শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষক হতেন। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের আরো অনেক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। সার্ত্র, সিমন, কাম্যু, আরোঁ, পোঁপিদু, জিসকার দেস্ত্যাঁ প্রমুখ অনেকেই এই ডিগ্রিধারী। শেষের দুজন যে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সেটা বহুজনবিদিত।

সাতচল্লিশ বছর পূর্বের সেই গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিমনের দিকে দৃষ্টি রেখেছি। কিন্তু তাঁকে ছবিতে, টিভিতে ছাড়া প্রত্যক্ষ করিনি। সার্ত্রকে দু'দুবার মোটামুটি কাছ থেকে দেখেছি ও তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। সিমনের লেখা, তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য, সমালোচনা, বিশেষ করে তাঁর আত্মজীবনীর তিন খণ্ড পড়েছি। এবং আশির দশক পর্যন্ত চলেছে এভাবে। তবে তাঁর প্রতিভার দ্যুতির স্মরণ আমাকে সর্বমুহূর্তে মোহিত করেছে।

পুরো বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ফ্রান্সের অঁদ্রে মাল্‌রোকে

আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বরূপে গ্রহণ করলেও কাম্যু-কে অতি প্রিয় লেখক এবং সিমন দ্য বোভোয়ারকে সবচেয়ে অন্তর্ভেদী লেখিকারূপে স্থান দিয়েছি। আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে যারা বর্তমানে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকেই হয়তো আমার এই 'লেখিকা' অভিধা গ্রহণ করতে চাইবেন না। কিন্তু আমার কাছে এক অদম্য স্বাধীন সত্তার মহিলারূপে সিমন উদ্ভাসিত হলেও তাঁকে আমি একজন 'লেখিকা' রূপেই চিহ্নিত করবো। কারণ তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও তার প্রকাশের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে এর তাৎপর্য এবং সেখানেই এক পর্যায়ে দেখা যাবে, 'পুরুষ-রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই'। বর্তমান নিবন্ধে সিমনের সার্বিক পরিচিত তুলে ধরা সম্ভব নয়। বছর দুয়েক আগে সপ্তাহব্যাপী প্যারিস অবস্থানকালে আচমকা তাঁর লেখা 'বার্ধক্য' শীর্ষক সমাজ-গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হলো। সুলভে বইটি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললাম। এরপর ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধু সমিতির সভাপতি লুসিয়্যাঁ বিগো আমার কাছে তার 'বিদায় সার্ত্র' গ্রন্থটি পাঠালেন। এ এক অসামান্য উপহার! সুদীর্ঘকাল যাবৎ সার্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কের শেষের দিনগুলোর বর্ণনাসমৃদ্ধ গ্রন্থটি আমি পড়তে চেয়েছিলাম। তাছাড়া নিজের দেশেই পেয়ে গেলাম তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', বইটির ইংরেজি অনুবাদ খুবই সস্তায়, সম্ভবত 'পাইরেট এডিশন' বিধায়। সুতরাং বই দুটো ছাড়াও অন্য সূত্রে পাওয়া তথ্যাদি নিয়ে শুরু করা যেতে পারে আমাদের বর্তমান আলোচনা।

বিশ্বখ্যাত লেখকদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রসিদ্ধ দা প্যারিস রিভিউ বসন্ত-গ্রীষ্ম ১৯৬৫ ভল্যুম ৯-এর ৩৪ সংখ্যায় সিমন দ্য বোভোয়ারও রয়েছেন, ২৩ থেকে ৪০ পৃষ্ঠায়। সাহিত্যানুরাগী সাংবাদিক মাদলেন গবেই-কে তিনি জঁ জনে ও জঁ-পল সার্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। কিন্তু নিজের বেলায় ছিল তাঁর সংকোচ : 'আমার তিনটি স্মৃতিকথা কি যথেষ্ট নয়'? অবশেষে দীর্ঘ না-করার শর্তে রাজি হলেন; তাঁর মোঁপারনাসের ছোট্ট, রৌদ্রোজ্জ্বল এপার্টমেন্টের একই সাথে পড়বার ও বসবার ঘরেই তাঁরা দুজন কথাবার্তা বলেছেন। বই-ভর্তি শেলফ। তবে অনেক আজে বাজে বই। সিমনের বক্তব্য, 'সেরা বইগুলো সব আমার বন্ধুদের হাতে। তাই ওগুলো আর ফিরে আসে না'। টেবিলগুলোতে বিদেশ ভ্রমণের সময় সংগৃহীত রঙচঙে জিনিসপত্র। তাতে একমাত্র মূল্যবান সামগ্রী- তাঁকে উপহার প্রদত্ত জিয়াকোমেত্তির একটি ভাস্কর্য। অনেকগুলো গানের রেকর্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁর সম্ভ্রান্ত চেহারায় বিচ্ছুরিত তাজা গোলাপী আভা, নীল চোখ, প্রসন্ন হাসিমুখ। সৌহার্দ্যময় আচরণে তাঁকে অতিমাত্রায় কমবয়সী ও জীবন্ত দেখাচ্ছিল।

সাক্ষাৎকার-পাঠে আমরা জানলাম সিমন আবাল্য ইংরেজি সাহিত্য পড়তে ভালোবাসেন। যতো ভালো পড়তে পারেন ততো বলতে পারেন না। ভার্জিনিয়া উলফের প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল আগ্রহ। কলেৎ-এর সীমাবদ্ধতা তার অপছন্দ, উচ্চশিক্ষায় তিনি যে একাডেমিক মেথড শিখতে পেরেছিলেন তা তার 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' লেখার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। তিনি নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক মনে করেন না। কারণ তিনি শুধু চার-পাঁচজন নির্বাচিত ছাত্রের প্রতি আগ্রহ নিতেন। তাঁর মতে,

ভালো শিক্ষকদের সবার প্রতি সমান আগ্রহ থাকতে হবে। কিন্তু দর্শন পড়াতে গিয়ে তিনি শুধু চার-পাঁচজনকেই ক্লাসে আলোচনায় অংশ নিতে দেখেছেন। দশ বছর ধরে লিখে ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। অবশ্য সার্ত্রও আত্মপ্রকাশ করেছেন পঁয়ত্রিশে ('বিবমিষা' 'দেয়াল')। স্তঁধালও লেখা শুরু করেছিলেন চল্লিশে। সিমনের *L'invitée (She came to Stay/* 'নিমন্ত্রিতা') উপন্যাসে হেমিংওয়ের প্রভাব আছে এবং তাঁর মতে সেটি শুধু সহজ সংলাপ রচনায় ও ছোটখাটো বস্তুর গুরুত্ব প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ।

সকালে চা খেয়ে ১০টা থেকে লেখা শুরু করেন সিমন এবং তা চলে ১টা অবধি। এরপর বন্ধু-সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়া। আবার ৫টায় বসে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ। তাতেই তাঁর আনন্দ। এবং এটা রীতিমতো বাঁধাধরা। সার্ত্রের সঙ্গে প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হন তিনি। সাধারণত তাঁদের এই আহারপর্ব চলে লে দ্যো মাগো ও কাফে দ্য ফ্ল্যর রেস্তোরঁয়। তাছাড়া বিকেলে অনেক সময় তাঁর ঘরেই কাজে বসে পড়েন। সার্ত্রের স্যাঁ-জের ম্যাঁ-দে-প্রে-র বাসা খুবই কাছে। ৫ মিনিটের হাঁটা পথ। বছরে দু-তিন মাস ভ্রমণে কাটান। যেসব বই পড়া বাকি তা তখনই পড়েন।

সিমনের লেখা 'অন্যদের রক্ত' বা 'সব মানুষ মরণশীল'- এই দুই উপন্যাসে যে-সময়ের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য তা তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভূত। জয়েস কিংবা ফকনার থেকে ধার করা নয়। 'সময় যে বহিয়া যায়'; - সে সম্পর্কে তিনি সব সময় সচেতন। তাঁর মনে হতো যে তিনি যেন বুড়িয়ে গেছেন। বার বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর ধারণা; উত্তর তিরিশ বয়স একটা দুঃসহ ব্যাপার। একদিকে কিছু একটা হারিয়ে গেল অন্যদিকে একই সময়ে কিছু যেন পাওয়া গেল, 'জীবন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে গেল'। তবুও 'সময় বহিয়া যাওয়ার' ব্যাপারটা বারবার তাঁর মনে উদয় হতো। কেননা সন্নিকট ভাবতেন মৃত্যুকে যার সঙ্গে রয়েছে ধ্বংস হয়ে যাবার দুর্ভাবনা। আসলে সব কিছু বিখণ্ডিত হবে, প্রেমও নিঃশেষিত হয়ে পড়বে। অবশ্য তাঁর জীবনে চলমানতার অভাব ঘটেনি- এক প্যারিসেই কেটেছে সারাটি জীবন, প্রায় একই জায়গায়। সার্ত্রের সঙ্গে রয়েছে সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক। খুবই পুরনো বন্ধু অনেক যাঁদের সঙ্গে ঘটে নিয়মিত সাক্ষাৎ।

সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্য হচ্ছে- সার্ত্র মনে করেন তিনি অমরত্বের অধিকারী কেননা তাঁর সৃষ্টিকর্ম বেঁচে থাকবে। আর সিমন সব কিছুর বিলয় যে ঘটবে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। সার্ত্রের ধারণা শব্দের মধ্যে জীবনকে পুরে রাখা যাবে। 'আর, সিমনের বক্তব্য, আমি সবসময় ভেবেছি শব্দ জীবন নয় বরং জীবনের প্রতিচ্ছবি, বলা চলে মৃত্যুরও'।

বাস্তবের ভিত্তিতে লেখা তৈরি না হলে, এবং কিছুটা সীমা লঙ্ঘনকারী যেমন আলেকসঁদ্র দ্যুমা বা ভিক্তর উ্যগোর রচনা - তাতে সিমনের আগ্রহ নেই। টলস্টয়ের *ওয়ার এন্ড পীস*-এ যেমন যথার্থ জীবন থেকে চরিত্র নেওয়া হয়েছে, তিনিও তাই করেছেন। 'কোনো বিশেষ চরিত্রের চাইতে চরিত্র সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে, প্রেমের বা বন্ধুত্বের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সমধিক' - বলেছেন সমালোচক

ক্লোদ্ রোয়া।

সিমনের অনেক উপন্যাসে অন্তত একটি নারী চরিত্র পাওয়া যায়, যে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে বা উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সিমনের মতে, প্রেম হল এক অসামান্য অধিকার। সত্যিকার প্রেম যা খুবই দুর্লভ, নারী/পুরুষের জীবনকে সম্পদশালী করে থাকে। মেয়েরা বেশি ফলাফল ভোগ করে কারণ 'প্রেমে মেয়েদের আত্মদান অনেক বেশি। গভীর সমবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তারা অধিকতর সংবেদনশীল'। কিন্তু যে স্বাধীন ও মুক্ত মানবী - 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' গ্রন্থে সিমনের মূল প্রতিপাদ্য সে চরিত্র তাঁর উপন্যাসে খুব বেশি প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাঁর জবাব; 'আমি মেয়েদের দেখিয়েছি যেমন ওরা আছে তেমন অর্থাৎ খণ্ডিত মানবসত্ত্বারূপে। যেমন হওয়া উচিত তেমন নয় ... পুরুষের চেয়ে মেয়েদের চরিত্র অংকন আমার কাছে সহজতর। সেজন্য নারী চরিত্রগুলো অনেক উন্নত'।

'দা মান্ডারিন' উপন্যাস লেখার পর দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্মৃতিকথা রচনায় আত্মমগ্ন ছিলেন। তাঁর কাছে দুটোই পছন্দ। দুটোই দুই ধরনের পরিতৃপ্তি ও হতাশা আনে। স্মৃতিকথার সুবিধা হল, বাস্তবতার ভিত্তিটা সেখানে সহজলভ্য। তবে উপন্যাসে অন্য ধরনের সুবিধা রয়েছে। ... তাঁর মতে কাহিনি বানানোর চাইতে আবিষ্কারই লক্ষ্য হওয়া উচিত। শৈশব ও যৌবন নিয়ে তিনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কথা-সাহিত্যে সেটি সম্ভব হয়নি। এটা ছিল খুবই আবেগাশ্রিত এক ব্যক্তিগত প্রয়োজন। কিন্তু *লে মেমোয়ার দ্যুন জ্যন ফিই রঁজে (দা মেমোয়ারস অব অ্যা ডিউটিফুল ডটার/*কোনো এক লক্ষ্মীমেয়ের স্মৃতিকথা) লিখে তিনি নিজেই হতাশ হয়েছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, "আমি স্বাধীন হবার জন্য যুদ্ধ করেছি, আমার স্বাধীনতা নিয়ে কী করেছি? তার কী পরিণাম ঘটলো"? তখন তার উত্তরভাগস্বরূপ লিখলেন, একুশ বছর বয়স থেকে বর্তমান সময় অবধি 'জীবনের পূর্ণ বিকাশ' এবং 'পরিস্থিতির চাপ' তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অংশটিকে ইতালীর বিখ্যাত লেখক কার্লো লেভি অভিহিত করেছেন "শতাব্দীর মহান প্রেমের উপাখ্যান" বলে। এই গ্রন্থে কিংবদন্তীর সার্ত্রকে যথার্থ মানুষরূপে চিত্রিত করেছেন সিমন। ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি তা করেছেন। সার্ত্র চাননি যে সিমন তাঁর সম্পর্কে লিখুন। কিন্তু যেভাবে সিমন তাঁর কথা লিখেছিলেন, তা দেখে সার্ত্র আর তাঁর লেখায় বাধা দেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছিল অস্তিত্ববাদের সমৃদ্ধির সময়। আর এই সাক্ষাৎকারের সময় অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে নব্য উপন্যাস আন্দোলন হচ্ছে ফ্যাশন। সিমন অবশ্য একে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন না যদিও পুনরুত্থান ঘটেছে বুর্জোয়াতন্ত্রের এক প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরূপে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, এর মধ্যে সার্ত্রের *লে মো (দা ওয়ার্ডস/*'শব্দ') বেরুলে তার সাফল্য হল অভূতপূর্ব। সিমনের মতে, 'বইটি খুবই উল্লেখযোগ্য, তবে সার্ত্রের সেরা বই নয়, অন্যতম বটে। এই সাফল্যের কারণ বইটি 'কমিটেড' তথা দায়বদ্ধ নয়। সার্ত্রের 'বিবমিষা' যা তাঁর প্রথম রচনা তাও ডানবাম দু'পক্ষের কাছে ছিল সমান গ্রহণযোগ্য। অথচ নাটকের ক্ষেত্রে তা নয়। আমার ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। বুর্জোয়া মহিলা সমাজ আমার

'কোনো এক লক্ষ্মী মেয়ের স্মৃতিকথা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল কারণ ওতে তারা তাদের যৌবন খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দু'টি খণ্ড পড়ে তারা প্রতিবাদ করেছিল। ব্যাপারটা স্পষ্ট।'

সিমনের 'পরিস্থিতির চাপ' গ্রন্থের শেষাংশ জুড়ে আলজেরিয়া যুদ্ধের ঘটনাবলী রয়েছে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিবৃত করেছেন বিষয়টি, যদিও সেকালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি কখনো অংশ নিতেন না।

এই গ্রন্থের শেষের দিকে তাঁর একটি বাক্য নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। সিমন লিখেছিলেন; "সেই বিশ্বাসযোগ্য যৌবন সন্ধিক্ষণকে আমি যখন পেছন ফিরে অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখি, তখন অবাক হয়ে যাই; কেননা আমি যেন কেমন করে প্রতারিত হয়ে গেছি"।

তাঁর শত্রুরা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে যে, তাঁর জীবন ব্যর্থ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁকে ভুলভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ধারণা, মেয়েদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করা প্রয়োজন। আসল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তাঁর জীবন নিয়ে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছেন। ফলত তাঁকে যদি আবার জীবন নতুন করে শুরু করতে হয় তাহলে তিনি ভিন্নভাবে জীবন যাপন করবেন না। সন্তানাদি না থাকার জন্যও তাঁর কোনো দুঃখ নেই; যা তিনি করতে চেয়েছেন, সে শুধু লিখতে।

তাহলে 'প্রতারণা' কিসের?

'কেউ যখন অস্তিত্ববাদী বিশ্ববীক্ষা গ্রহণ করেন, যেমন আমি করেছি, তখন মানব জীবনের পর আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী অথচ বাস্তব সত্য হল : একজন 'হতে' চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববান থাকেন। এই বক্তব্যের অনৈক্যের কারণে যখন আপনি 'হওয়ার' ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন- যা একভাবে আপনি সবসময় করে থাকেন, যখন আপনি পরিকল্পনা করে থাকেন, যখন আপনি আসলে জানেন যে 'হওয়াতে' সফল হতে পারছেন না - তখন আপনি ঘুরে দাঁড়ান এবং পেছনের জীবনের দিকে তাকান, আপনি দেখেন যে আপনি শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে জীবন আপনার পেছনে শক্ত বস্তুর মতো নেই, যেমন কোনো দেবতার জীবন (যেমন ধারণা করা হয় অর্থাৎ যা অসম্ভব কিছু)। আপনার জীবন শুধুমাত্র একটা মানব জীবন।

তখন কেউ বলতে পারেন, যেমন আল্যাঁ (ফরাশি দার্শনিক) বলেন, তাঁর এই উক্তি আমার খুব পছন্দ -'আমাদের জন্য কিছুই প্রতিশ্রুত নয়" এক দিক থেকে এটা সত্য। অন্যদিকে থেকে তা নয়। কেননা একজন বুর্জোয়া বালক বা বালিকা যে বিশেষ সংস্কৃতি পেয়েছে তা সম্ভবত তাদের কাছে প্রতিশ্রুত। আমি মনে করি যে, অল্পবয়সে যার জীবন কঠিন ছিল, পরবর্তীতে সে বলবে না যে সে 'প্রতারিত' হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন বলছি আমি 'প্রতারিত' তখন আমি চিহ্নিত করছি সেই সতের বছরের বালিকাকে যে ঝাড় গাছের বন্য এলাকায় গিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিল যে সে পরে কী করতে পারে। আমার যা করার তা সবই করেছি, বই লিখেছি, বিবিধ

বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছি কিন্তু তবুও আমি 'প্রতারিত' হয়েছি, কেননা তার আর পর নেই। মালার্মের একটা পঙক্তি রয়েছে - "বিষাদের সুগন্ধি রয়েছে অন্তরাত্মায়"। আমি যা চেয়েছি সব পেয়েছি এবং সব বলা ও করার পর দেখা গেল, যা চাওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

এক মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ আমাকে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লিখেছেন যে, 'শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে- অভিপ্রায় সব সময় অভিপ্রায়ের পাত্রকে পেরিয়ে যায়'। বাস্তবতা এই যে, আমি না - চেয়েই সবই পেয়েছি কিন্তু 'অনেক দূর পেরিয়ে যাই'। যা এই ইচ্ছায় ছিল তা পাওয়া গেল। এখন ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করল। যখন আমার বয়স কম ছিল তখন আমার মনে অনেক আশা এবং এক জীবন দৃষ্টি সব সংস্কৃতিবান লোক এবং বুর্জোয়া আশাবাদীরা সবাইকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। আমার পাঠকরা আমাকে দোষারোপ করে থাকে যে, আমি সেই উৎসাহ তাঁদের দিতে পারিনি। আমি শুধু এটাই বোঝাতে চেয়েছি এবং আমি যা করেছি বা ভেবেছি তার জন্য কোনো দুঃখবোধ নেই।'

তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ : ঈশ্বর ভাবনা তাঁর লেখায় নেই। 'সার্ত্র এবং আমি সব সময় বলেছি : এটা শুধু যে 'হওয়া'র একটা ইচ্ছা তা নয়, সে ইচ্ছা যে-কোনো বাস্তবতায় সমন্বিত হতে চায়। কান্ট বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে যা বলেছিলেন, এটা যথার্থভাবে তা-ই। ঘটনা হলো, যে কেউ পরিণতিতে বিশ্বাস করে : তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে না যে কোথাও একটা উচ্চমার্গের কারণ রয়েছে। ঘটনা হলো এই যে, মানুষের ইচ্ছা আছে হওয়ার। তাতে এটা বোঝায় না যে সে 'হওয়া'কে পেতে পারে অথবা সেই 'হওয়া'টা একটা সম্ভাব্য ধারণা হবে। যে কোনোভাবে 'হওয়াটা' একটা সমন্বিত রূপ অসম্ভব। সার্ত্র এবং আমি সবসময় এটা প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এই প্রত্যাখ্যান আমাদের চিন্তায় অবস্থান করে। মানুষের মধ্যে রয়েছে একটি শূন্যতা, এমনকি তার সাফল্যেও রয়েছে এই শূন্যতা। আমি বোঝাতে চাচ্ছি না যে, আমি যা পেতে চেয়েছি তা পাইনি। বরং এটা যে, মানুষ যা ভাবে, প্রাপ্তি তা নয়। তাছাড়া এর একটা খুব হালকা বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মানুষ ভাবে যে, আপনি যদি একটি সামাজিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করেন তাহলে আপনি অবশ্য সাধারণ মানব পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকবেন। কিন্তু আসলে তা নয়।

'আমি প্রতারিত' কথাটায় আরো কিছু বোঝায়। যেমন জীবন আমাকে এই বিশ্ব যেমন তাকে তেমনি আবিষ্কার করতে দিয়েছে এবং তা হলো, আমি প্রত্যক্ষ করছি -এমন এক বিশ্ব যা দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যাচারিত। যেখানে অধিকাংশ মানুষ খাদ্যাভাবের শিকার। আমার বয়স যখন কম তখন এসব আমি জানতাম না। তখন আমার কল্পনায় ছিল, এমন এক বিশ্বকে আবিষ্কার করতে হবে যা শুধু সুন্দর। এইদিক থেকেও আমি বুর্জোয়া সংস্কৃতির দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলাম। আর তাই আমি অন্যদের প্রতারণাকে সাহায্য দিতে চাই না। অতএব, আমি কেন বলছি যে -'আমি প্রতারিত' হয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা, যাতে অন্যরা প্রতারিত না হতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে, এটাও একটা সামাজিক সমস্যা। সংক্ষেপে বলি, আমি অল্প

অল্প করে বিশ্বের অসুখী-ভাব আবিষ্কার করলাম। এবং অবশেষে সর্বতোভাবে আমি এটি অনুভব করলাম আলজেরিয়ার যুদ্ধের প্রসঙ্গে আর আমার ভ্রমণের সময়।'

বার্ধক্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অনেকের অপছন্দ। কারণ 'ওরা বিশ্বাস করতে চায় যে জীবনের সব পর্ব আনন্দঘন। শিশুরা নিরপরাধ ও সব বিবাহিত দম্পতি সুখী। সব পূত-পবিত্র। আমি এসব ধারণার বিরুদ্ধে সারাজীবন বিদ্রোহ করে আসছি। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সময় যা আমার জন্য বৃদ্ধ বয়স নয় বরং বৃদ্ধ বয়সের গুরুটাই প্রতিনিধিত্ব করে, এমনকি কেউ যদি যা চায় তার সবই পেয়ে থাকে, তখনও। স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের মতো কাজ- যে কারো অস্তিত্বে পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন বহু কিছু হারানোর দ্বারা চিহ্নিত। কেউ যদি এগুলো হারানোতে দুঃখিত না হন তার মানে এসব তাদের পছন্দের ছিল না। খুব দ্রুত কেউ বার্ধক্য বা মৃত্যুকে মাহাত্ম্যমণ্ডিত করেন। তাঁরা আসলে জীবন ভালোবাসেন না। অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে : আজকের ফ্রান্সে সব কিছু চমৎকার, এমনকি মৃত্যুও।'

স্যামুয়েল বেকেট এবং 'নব্য ঔপন্যাসিকদের' মধ্যে তুলনাত্মক এক প্রশ্নের জবাবে সিমন মানব পরিস্থিতিতে প্রতারিত হবার ব্যাপারটা বেকেট যে তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেছেন তা স্বীকার করেন। তাই তাঁর লেখার প্রতি সিমনের আকর্ষণ রয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর মতে, নব্য উপন্যাসের প্রবক্তারা যা করতে চাইছেন, তা ফকনারে পাওয়া যাবে। তিনিই তাঁদের শিখিয়েছেন তা কেমন করে করতে হয় এবং এ ব্যাপারে তিনিই শ্রেষ্ঠ। বেকেটের ব্যাপারে বলতে গেলে তিনি যে জীবনের অন্ধকার দিককে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন, তা সিমনের কাছে খুবই সুন্দর প্রতীয়মান হয়। বেকেট নিশ্চিত যে, জীবন অন্ধকার এবং শুধু তাই। 'আমিও নিশ্চিত যে, জীবন অন্ধকার এবং একই সময় আমি জীবন ভালোবাসি।...'

নিজের মূল্যায়ন সম্পর্কে সিমন নিস্পৃহ। তাঁর মতে, 'কিসের এই মূল্যায়ন? শোরগোল, নিস্তব্ধতা, উত্তরসুরি, পাঠকসংখ্যা, পাঠকের অভাব, বিশেষ সময়ে গুরুত্ব? আমার মনে হয়, মানুষ আমাকে কিছুকাল পড়বে। অন্তত তাই আমাকে আমার পাঠকরা বলেন। আমি কিছু অবদান রেখেছি - নারীদের সমস্যাসমূহের আলোচনায়। যেসব চিঠিপত্র আমি পাই তাতে আমি জানি - আমার কাজের সাহিত্যিক 'গুণ' সম্পর্কে। শব্দটির যথার্থ অর্থ সম্পর্কে, বলতে গেলে, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

প্রসঙ্গ : উপন্যাস ও ফরাশি বিবেচনা

উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনায় সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পের এই শাখার বিভিন্ন দিক আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে আকর্ষণ করবে। উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি, উপন্যাসের গঠনশৈলী তথা 'ফরম' উপন্যাসের উপকরণ এবং সাম্প্রতিক নব্যোপন্যাস আন্দোলন- একটি দিক নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থাপন সম্ভব হলেই এই আপাত সহজ, জটিল বিষয়টির ওপর যে আলোকপাত করা হবে- তা অনস্বীকার্য।

সাহিত্যের নানা শাখার মতো উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি নানা যুগে বদলেছে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি যেহেতু একান্তভাবেই মানুষ এবং তার চারপাশের জগৎ নির্ভর-বিবর্তনের সূত্রও তাই এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। মানুষ এবং সমাজের রূপান্তর, উৎকর্ষ, বিকৃতি ব্যক্তিমানুষ খুব সহজভাবে গ্রহণ করেনি, কখনো সে স্বেচ্ছায় এতে অংশগ্রহণ করেছে কখনো বা অনিচ্ছায় এর বিপক্ষে সংগ্রাম করছে। সংগ্রামে হয়তো সে জয়ী হয়েছে- কিংবা পরাজয় বরণ করেছে, অথবা একান্ত নির্বিকার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে শুধু পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে থেকেছে। এই তিনটি পরিস্থিতির যে কোনো পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তার চোখে দেখা, অন্তরে উপলব্ধি, কল্পনায় দৃশ্যমান কিংবা জীবনে ঘটিতব্য যে কোনো বিষয়কে লিপিবদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছে। সেই প্রয়াস যখন এ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সামগ্রিক জীবনবৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে তখনই আমরা উপন্যাস নামধেয় শিল্পবস্তুটির সাক্ষাৎ পাই। উপন্যাস তাহলে একধরনের যথার্থ মূল্যবোধ সন্ধানের ইতিহাস, হয়তো বা তার সংরক্ষণের বিবরণ যে মূল্যবোধ পাঠক বা সমালোচক হয়তো সহজে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন না অথচ সে মূল্যবোধ সেই লিপিবদ্ধ জগতের প্রতি অংশে রক্ত-মাংসের মতো মিশে রয়েছে। বলা বাহুল্য, এক উপন্যাস থেকে অন্য উপন্যাসে এই মূল্যবোধের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী।

সমগ্র জীবনই উপন্যাস-বিধৃত হবে, কোনো খণ্ডাংশ নয়, হয়তো বা বিভিন্ন ভগ্নাংশ জুড়ে লেখক তাঁর অপরিস্ফুট মূল্যবোধের তাগিদে জীবনের সমগ্রতা প্রমাণে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু সেখানেও থাকবে, তুলনামূলক সাহিত্য-শিল্পের ভাষায় যাকে বলা চলে, মহাকাব্যিক মায়াঞ্জন।

উপন্যাসের আকৃতি নির্ধারণ তার প্রকৃতি নির্ণয়ের মতো জটিল নয়, পঞ্চাশ থেকে পাঁচ হাজার পৃষ্ঠায় তা লেখা হয়ে থাকতে পারে। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি হোক আর কম হোক-এহবাহ্য-যা আসল, তা তার মৌল প্রকৃতি যার কথা এইমাত্র বলা হলো। পঞ্চাশ পৃষ্ঠা যেমন খুব কম করে বলা হলো পাঁচ হাজারও তেমনি নিঃসন্দেহে বেশি। আসলে, পৃষ্ঠা সংখ্যা আড়াইশো থেকে পাঁচশোর মধ্যে উপন্যাসের আয়তন নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সেরা উপন্যাসগুলো, যেমন, তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' বাল্যাকের 'লা কমেদি য়্যুমেন' (মানব উপাখ্যান), রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', মার্সেল প্রুস্তের 'হারানো সময়ের সন্ধানে' রম্যাঁ রলাঁর 'জঁ ক্রিসতফ' শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কিংবা বাংলায় সম্প্রতি প্রকাশিত অনেক বড় বড় উপন্যাসের আয়তন

স্ফীতি অলস পাঠকের জন্য ভীতিপ্রদ। অথচ দেখা গেছে, পাঠক যখনই একবার এ ধরনের বই হাতে নিয়েছেন কিছু সময়ের ব্যবধানে আদ্যোপান্ত শেষ না করে ছাড়েননি। একই পাঠককে আবার উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের সংকলন হাতে নিয়ে বাদ-সাদ দিয়ে, দীর্ঘসূত্রিতায় পড়তে দেখা গেছে! বরিস পাস্তেরনাকের মতো প্রতিভাধর কবি ঔপন্যাসিক তাঁর 'ডক্টর জিভাগো'তে লিখেছেন, তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' ডিকেন্সের 'দুই নগরীর কাহিনি' স্তঁদালের 'লাল কালো' উপন্যাস তিনি একাধিকবার পাঠ করেছেন। শরৎচন্দ্র স্বয়ং বহুবার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' তিনি অসংখ্যবার পড়েছেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে : আয়তন-ভীতি, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি যেসব যুক্তি উপন্যাস -পাঠ বা রচনার বিপক্ষে উপস্থিত করা হয়ে থাকে এবং ছোট গল্পের স্বপক্ষে দেখানো হয়ে থাকে তার ভিত্তিমূল খুব শক্ত নয়। আসলে উপন্যাস পাঠের মানসিকতা, উপন্যাস রচনার শিল্প সৌকর্যের মতোই সাধনা সাপেক্ষ, অভিজ্ঞতা নির্ভর।

উপন্যাসের উপকরণ কী হবে তা এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা গেছে এরকম আশা করাটা হয়তো অন্যায় হবে না। তবু আকৃতি এবং প্রকৃতির জন্য উপন্যাসকে যেহেতু গদ্য মহাকাব্য বলেও কেউ কেউ অভিহিত করেছেন তাই উপন্যাসের নায়ক মহাকাব্যের নায়কের মতো ধীরোদাত্ত ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হবেন, এমন কথা জোর করে বলা চলে না। এ বিষয়ে পথ নির্দেশকারী সংজ্ঞাটির উদ্যোক্তা হলেন মোপাসঁ। সংজ্ঞাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে; কেননা, মোপাসঁর পর অঁদ্রে জীদ, জঁ-পাল সার্ত্র, লুই আরাগোঁ প্রমুখ প্রখ্যাত ফরাশি ঔপন্যাসিক এধারায়ই মূলত নিজেদের প্রতিভাকে নিয়োজিত রেখেছেন : উপন্যাসে লেখককে আবেগ ও বুদ্ধির একটি সমাহার প্রয়োগ করতে হবে যার ফলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এবং তাদের কল্পিত জগৎটি পূর্ণভাবে পাঠকের দরবারে হাজির হতে পারে। চরিত্রগুলো তাদের পরিচিত পরিবেশে জীবন-জিজ্ঞাসা, সংস্কার মুক্তি প্রভৃতি সমস্যায় বুদ্ধি ও আবেগ দিয়ে স্ব স্ব মহিমা অভিব্যক্ত করবে! সাধারণ হয়েও অসাধারণ, অসাধারণ হয়েও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আত্মলীন ইত্যাকার শিল্পকৌশল অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক যথোচিত শিল্পধর্মে তাদের উজ্জ্বল বা ক্ষণপ্রভ করে দেবেন। নানা ঘটনার সমারোহে তাদের অস্তিত্ব একবার অবলুপ্ত হবে, আবার ওরাই সেসব ঘটনার কাণ্ডারী হয়ে হাজির হবে যেমন বাস্তব জীবনে হয়ে থাকে বা হবার সম্ভাবনা থাকে। তবেই উপন্যাস সার্থকতা অর্জনে সক্ষম হবে।

বাঙালি জীবনের স্বভাবসিদ্ধ বৈচিত্র্যহীনতা আমাদের মাতৃভাষায় বেশি সংখ্যক সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি না হওয়ার কারণ রূপে চিহ্নিত করেছে। কথাটা মনে হয় আংশিক সত্য। কেননা বৈচিত্র্য খুঁজে বের করাটাই তো যথার্থ শিল্পীর কাজ! এবং শিল্পী অর্থাৎ জীবন শিল্পী তো দৈব প্রেরণার ওপর নির্ভর করে উপন্যাস লেখায় হাত দিতে পারেন না? তাই জীবনকে জানা আরো বেশি করে জানা এবং সার্থক উপন্যাস রচনার কলাকৌশল আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষের জীবনের নগর কেন্দ্রিকতা বা মনোবিকলন ব্যাপক বলে আমাদের আধা-গ্রামীণ আধা-শহুরে জীবনকে জোর করে নাগরিক সাজিয়ে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বদর্শনের মোড়কে প্রকাশ করলে যে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি হয় না একথা আজ সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ফ্রান্সে গত পনের বিশ বছর ধরে যে নব্যোপন্যাস আন্দোলনের ঝড় বইছে সে সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। আলাঁ-রব গ্রিয়ে, মিশেল বুতর, নাথালি সারোৎ প্রমুখ ক'জন অনূর্ধ্ব চল্লিশের কথা-সাহিত্যিক এ আন্দোলনের নেতা। উপন্যাস, সিনেমা কাহিনি এবং প্রবন্ধ-বক্তৃতায় তাঁরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য হলো : সাধারণত পাঠক বা দর্শক কোনো শিল্পকর্ম দেখে, কিছু অভিজ্ঞতার বাহ্য সমষ্টি বা বড় জোর সমাজ বাস্তবতা থেকে অদূরে অবস্থিত এক কল্পিত বস্তুজগত। নব্যোপন্যাস আন্দোলনের নায়করা চান সবাই দেখুক বা জানুক সেখানে সাবধানতার সঙ্গে শুধু সমকালীন বাস্তবতার কল্পিত রূপ দেওয়া হয়েছে এবং যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে স্থান-কাল পাত্র বিশেষে ভূত বর্তমান ভবিষ্যতে লীন হয়ে। ধরা যাক কাহিনিতে একজন স্বামী, স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিক সম্পর্কে বলা হচ্ছে। তিন জনের একত্র সমাবেশে স্বামী তাঁর পত্নীর প্রতি প্রেম, বিবাহিত জীবনের অভ্যাস এবং স্ত্রীর প্রেমিকের প্রতি হিংসা এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে পড়ে। পরে প্রেমিককে এবং অবশেষে নিজেকে বস্তু হিসেবে কল্পনা করে থাকে। তার ব্যবহারে প্রকাশ পায় বস্তুর মতো অচল অথচ মানসজগতে চলে অদৃশ্য ভূত-ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র! নব্য উপন্যাসের লেখক এই দৃশ্যগুলোকে উপন্যাসের পাতায় উপস্থিত করতে সচেতন। তাই আনুসঙ্গিকভাবে তাঁর ভাষায়, বর্ণনায় এসেছে পরিবর্তন। আজকের উপন্যাস এখনো উনিশ শতকীয় বালজাক প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ করে চলেছে। চেতনা-প্রবাহ রীতি দুরূহ ও শিল্পসৌকর্য্যের জটিলতা সম্পৃক্ত বিধায় অল্প অনুসরণযোগ্যই রয়ে গেছে। সংলাপের মধ্যে কিংবা মনস্তত্ত্ব বর্ণনার মাধ্যমে চিরাচরিত রীতি অনুসারে হাস্যকরভাবে সবজান্তার ভূমিকা নিয়ে সাধারণ ঔপন্যাসিক গতানুগতিক কাহিনি লিপিবদ্ধ করে থাকেন। নব্যোপন্যাসের স্রষ্টারা সেক্ষেত্রে বস্তুজগৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসত্তার সাংগঠনিক ঐক্য নির্ণয়ে সচেষ্ট। মানব জীবনে এবং শিল্পকর্মে এক সুগভীর অনুসন্ধিৎসা ও আস্থা নিয়ে তাঁরা অক্লান্ত সাধনা করে চলেছেন উত্তরসুরীদের জন্য নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির, মূল্যবোধের নতুন পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের কাজে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
ক্লোদ্ সিমোঁ ও তাঁর উপন্যাসরীতি

১৯৮৫ সালের জন্য এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাশি ঔপন্যাসিক ক্লোদ্ সিমোঁ। ফরাশি দেশের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিকের সংখ্যা অন্য দেশের চেয়ে সম্ভবত বেশি। অবশ্য অনেক সময় এমন সব ব্যক্তিত্বকে এই বিখ্যাত পুরস্কারটি অর্পণ করা হয়েছে যে, খবর জেনে ফরাশিরাই প্রথম অবাক হয়ে গেছেন। তাই নোবেল কমিটির নিরপেক্ষ মনোনয়নের ব্যাপারে প্যারিসে প্রচুর সন্দেহ। ১৯৬০ সালে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও কবি স্যাঁ-জন পের্স যখন ফ্রান্সের একাদশতম পুরস্কার বিজয়ী হলেন তখনও তাঁর দেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখে বিদেশিরা হয়েছেন বিভ্রান্ত। এমন কি, প্রকাশ্যেই উচ্চারিত বা লিখিত হতে থাকে ফরাশি অভিমত। পরে ১৯৬৪ সালে সার্ত্র যখন ডিনামাইট নির্মাতার স্মারক পুরস্কারটি পেলেন এবং প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তো তুলকালাম কাণ্ড। মোটকথা, সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারে ফরাশিদের কাছে নোবেল নিরিখ খুব একটা গ্রাহ্য নয়। বরং 'গোঁকুর' পুরস্কার পেল কিনা খোঁজ করা হয় কারু ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব অনুধাবনে। ক্লোদ সিমোঁ সম্ভবত 'গোঁকুর' পাননি। অন্য কোনো পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন কিনা, জানি না। তবে তাঁর উপন্যাস সাধনা দীর্ঘদিনের। বয়সও খুব কম নয় তাঁর। ১৯১৩ সালে তাঁর জন্ম, তানানারিভে (মাদাগাস্কার)। পেরপিনঁ-তে আঙুরের চাষবাস নিয়ে তিনি থাকেন। কখনো-সখনো প্যারিসেও অবস্থান করেন। প্রথম উপন্যাস 'ফাঁকিবাজ' (ল ত্রিশ্যর) প্রকাশ পায় ১৯৪৫ সালে। দু'বছর পর বেরুল একটি স্মৃতিকথা, 'লা কর্দরেদ্'। বায়ান্ন সনে আর একটি উপন্যাস 'গালিভার' ছাপা হলো এবং এর সঙ্গে শেষ হলো তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়েই তিনি যে নিজস্ব লিখনভঙ্গীর অনুসন্ধানরত, এটা স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির জগৎ কিংবা গন্তব্য পথ খুব স্পষ্ট নয় পাঠক-সমালোচকের কাছে। তবু ধরা পড়ে তৃণলতাগুল্মের এক

অবিস্মরণীয় বাস্তব বিশ্ব। আরও ধরা পড়ে ফ্রান্সের 'পপুলার ফ্রন্টে'র আমল থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনের বছরগুলো তৎসহ হিস্পানী গৃহযুদ্ধ, নাৎসী সন্ত্রাস, বর্ণবাদ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু বিশেষ আবহ। ১৯৫৭ থেকে ৬২'র মধ্যে বেরোয় সিমোঁর 'বায়ু', 'তৃণ', 'ফ্লদ্রের পথ' ও 'প্রাসাদ' শীর্ষক চারটি উপন্যাস। এগুলোতে তিনি গভীরভাবে এক নতুনতর সাহিত্যপদ্ধতির গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। 'বায়ু' প্রসঙ্গে তিনি নিজে একবার বারোক শিল্পপ্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। কংক্রিট সঙ্গীত কিংবা তাশিস্ত চিত্রাংকন পদ্ধতির সঙ্গেও কেউ কেউ এর তুলনা করেছেন। সংযোগহীনতা থেকে এর সূচনা এমন অনুমান একেবারে অগ্রাহ্য নয়। 'তৃণ' উপন্যাসের চরিত্রসমূহের কোনো নাম নেই। বাক্যস্রোত চলেছে একনাগাড়ে এলোপাতাড়ি আঁকাবাঁকা পথে কিন্তু কখনো বা উদ্ভাসিত আশ্চর্য কাব্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য। স্যুররেয়ালিসম বা জয়েসীয় চেতনাপ্রবাহ অনেকটা এ জিনিস এনেছে আগে। কিন্তু সিমোঁ ধাবমান সময়ের স্থবিরতা এবং বাস্তবের বস্তুনিষ্ঠ রূপ নিয়ে অনেক বেশি তন্নিষ্ঠ।

তাঁর উপন্যাসগুলোতে কাহিনির তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। চরিত্রগুলোরও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব উহ্য থাকে। কিন্তু তাঁকে অধিকার করে আছে অন্যজিনিস। ইমোশন এখানে খণ্ড খণ্ড রূপে উপস্থাপিত বা একটি অন্যটি থেকে বিশ্লিষ্ট। তবে ধারাবাহিকতার সূত্রে গাঁথা। ক্লাসিক সময় ধারণাকে বদলে এসেছে অস্পষ্ট কালক্ষেপণ পর্ব, যাতে অতীত-বর্তমান একীভূত। দীর্ঘ, কখনো কাটা-কাটা বাক্যে খুবই সুক্ষ্ম বর্ণনা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খণ্ডিত অবস্থানে বোধ ও বাস্তবতার জটিল সম্পর্ক অনুধাবনে সহায়ক। সিমোঁর 'ইস্তোয়ার' (১৯৬৭) ফার্সালের যুদ্ধ (১৯৬৯) এই রীতির পরিপক্ক অনুশীলন। একটি উপন্যাসের সঙ্গে অন্য উপন্যাসের উপস্থাপনা, বিষয় বিন্যাস, বক্তব্যে কোথাও কোনো মিল নেই। এ এক নব্যরীতির উপন্যাস যা ফরাশি দেশে ইতোমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে নুভো রোমঁ বা নব উপন্যাস আন্দোলন রূপে।

ক্লোদ সিমোঁ নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের এক প্রধান পুরুষ। এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে, এটি আসলে কোনো আন্দোলন নয়। পঞ্চাশ দশকের শেষভাগে ব্যক্তিগত প্রয়াসে কেউ কেউ নবতর উপন্যাসরীতির প্রবর্তন করতে থাকেন। কিন্তু এদের প্রত্যেকের ছিলো আলাদা বৈশিষ্ট্য। প্রথমে, এঁদের মধ্যে সবচে' বেশি উচ্চারিত নাম ছিলো মিশেল বুতর-এর, তারপর আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে-র। এ সময়ে চিত্র পরিচালক আল্যাঁ রেনে-র দুটো ছবি, 'হিরোশিমা মনামুর' (১৯৫৯) এবং 'লাস্নে দের্নিয়ের আ মারিয়েনবাদ' (১৯৬১) 'নুভো রোমঁ'-র বিতর্ককে বিস্তৃততর করে তোলে। এই আলোড়নসৃষ্টিকারী ছবির কাহিনি রচয়িতা ছিলেন নব্য উপন্যাসস্রষ্টা মার্গারেত দ্যুরাস এবং আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে। এই দু'জন এবং আরেক মহিলা কথাশিল্পী নাথালি সারোৎ-এর জনপ্রিয়তা সিমোঁ কখনো পাননি।

সিমোঁ একবার বলেছিলেন যে, তিনি 'বোধির স্থাপত্য' নির্মাণে আগ্রহী। ভাবগত, ভাষাগত বিবরণ, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যার চেয়ে ছবির পর ছবি প্রদর্শন, তাদের

স্থবিরতা-বিলম্বিত লয়-দ্রুততা নিয়ে তৈরি 'চালক শরীর' উপন্যাসটি শেষকথা না বলে হঠাৎ যেন থেমে যায়। বোধকরি সেজন্য শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা ছাপা হয়নি।

সিমোঁ একবার ষাটের দশকের চিন্তানায়ক, মনস্তত্ত্ববিদ জাক লাকঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছিলেন, "শব্দ শুধু ইশারা নয়, তাৎপর্যের গিঁঠ।" এই তাৎপর্যের গিঁঠ খুলতে বা বাঁধতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, দুই শতাব্দীর বড় বড় কথা-সাহিত্যিকদের যে বাস্তবতার ছদ্মাবরণ ও যৌক্তিক বিন্যাস তা যথেষ্ট প্রশ্ন সাপেক্ষ। গণিতশাস্ত্রের উপস্থাপনা রীতি ও প্রতিপাদ্য বিষয়, পশ্চিমা শিল্পরীতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য সিমোঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই নতুন রীতির উপন্যাসসৃষ্টিতে। সৃষ্টি না বলে বরং নির্মাণে বলাই হয়তো সমীচীন। এই প্রত্যয়বোধকে সম্মানিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন সুইডেনের নোবেল কমিটি, এটা বলাই বাহুল্য।

ল্য ক্লেজিও : নতুন গন্তব্যের অভিযাত্রী

সাহিত্যে ফরাশিদের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে বিতর্কের বিষয়টি বলা শেষ না হতেই আবার জয়মাল্য এসে গেল সে দেশের এক প্রতিভাবানের গলায়। এবার যিনি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক তাঁর নাম জ্যঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও (Jean-Marie Gustave Le Clezio)। তাঁর সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য ঢাকায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম। কিচ্ছু নেই। নেই বলতে নেই-ই। কোনো রেফারেন্স গ্রন্থও নেই। যা হোক, অধমের কাছে সামান্য কিছু রয়েছে; কিন্তু সময়মত সব কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে ১৯৬৪ সালে যখন ল্য ক্লেজিও'র ল্য *প্রসে ভেরবাল্* (সরকার পক্ষের উকিল কর্তৃক আসামির বিরুদ্ধে পেশকৃত অভিযোগনামা) অবশ্য ইংরেজি অনুবাদের শিরোনাম সম্ভবত *The Transcript* প্রকাশিত হলো তখন আমি প্যারিসের একজন পুরনো বাসিন্দা। ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের কাল শেষ করে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ডক্টরেটের থিসিস জমা দিতে যাব এই সময় ঘটে গেল দুটো বড় সাহিত্যিক ঘটনা (লিটারারি ইভেন্ট)। এক সার্ত্রের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং প্রত্যাখ্যান : দুই-চব্বিশ বছরের প্রায় অখ্যাত এক সুদর্শন যুবকের 'ল্য প্রসে ভেরবাল' শীর্ষক উপন্যাস প্রকাশ। উপন্যাস? হ্যাঁ, তবে এ-এক নব্যউপন্যাসের নতুন ধারা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ফরাশিরা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের অনুসন্ধান কাজে লাগানোর প্রয়াস পরিদৃষ্ট হবে। সার্ত্রের পর পর বুতর্, রব গ্রিয়ে, নাথালি সারোৎ, মার্গেরিৎ দ্যুরাস্, ক্লোদ সিমোঁ ইত্যাকার নামের সঙ্গে ল্য ক্লেজিও নামটিও স্মরণযোগ্য হয়ে পড়ল।

কিন্তু কে এই ল্য ক্লেজিও? জানা গেল, ভারতীয় মহাসাগরের দ্বীপ মরিশাসে বসবাস তাঁদের পরিবারের। বাবা ইংরেজ চিকিৎসক এবং মা ফরাশিনী-ব্রঁতো এলাকার রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে। অবশ্য ল্য ক্লেজিও জন্মেছেন নীস শহরে, ১৯৪০ সালে। ফ্রান্সের বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ব্রিস্টল ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি

কিছু পড়াশোনা করেন। ফরাশি ও ইংরেজিতে সমান দক্ষ ল্য ক্লেজিও প্রথমে 'ঔপনিবেশিক' মনে হওয়াতে ইংরেজি পরিহার করে ফরাশিতেই ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অবশ্য তাঁর প্রথমাবধি লক্ষ্যবস্তু। এ জন্য তিনি ইংরেজ কবি জন কীটস থেকে স্কটিশ কাহিনিকার রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, আইরিশ চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রবক্তা জেমস জয়েস, মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জে.ডি স্যালিনজের প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন যাঁরা ছিলেন নিঃসঙ্গ কিংবা নির্বাসিত। এ লেখার উপসংহারে আমরা দেখব জ্যঁ-পল সার্ত্রকে তিনি কীভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁকে যা ক্রমশ অনন্য করে তুলেছে তা হলো শুধু পশ্চিমা নয়, অন্যান্য এলাকার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য-তার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা, মানবসভ্যতার ও বোধির উন্মেষ যুগের অবস্থানের প্রতি তাঁর আগ্রহ। প্রাথমিক সংস্কৃতিসমূহের প্রতি এই আগ্রহের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মানুষের ঊষাকাল গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এখন আমরা গোধূলিবেলায় রয়েছি। মনে হচ্ছে, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি বা তার কাছাকাছি।'

আশৈশব ল্য ক্লেজিও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, মরুভূমিতে ও আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে বসবাস করেছেন। বর্তমানে বেশির ভাগ সময় কাটান নিউ মেক্সিকোর আলবু কার্কে, শিক্ষকতায়। এক সময়ে তিনি বলেন, 'ফরাশি ভাষাই হচ্ছে আমার একমাত্র স্বদেশ, যাকে আমি বাড়ি বলতে পারি।'

১৯৬৫ সালে তাঁর গল্প সংগ্রহ *ল্য ফিয়েভ্র* (জ্বর) প্রকাশিত হয়। এতে তিনি লেখেন, 'লেখা, লেখা একাই শব্দ নিয়ে ইতস্ততভাবে এগিয়ে চলে, যা খুঁজে বেড়ায় এবং গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করে, লেগে থাকে, আর বাস্তবতাকে নির্বিকারে চিত্রিত করে।' ১৯৬৬ তে প্রকাশিত হলো *ল্য দেলুজ* (প্লাবন), '৬৭ তে *তেরা আমারত*, ৬৯-এ ল্য লিভ্র দ্য ফুইট (পলায়নের কাহিনি) প্রভৃতি রচনায় ল্য ক্লেজিও'র চিন্তাসৌকর্য ও আঙ্গিকগত উৎকর্ষতার পরিচিতি বহন করে।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত এবং ফরাশি একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত *ল্য দেজের* (মরুভূমি) উপন্যাসটি ল্য ক্লেজিওকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কেননা এই গ্রন্থে সাহারা মরুভূমি, বেদুইন ও অভিবাসীদের চালচিত্রের পটভূমিতে হারানো সংস্কৃতির এক চমৎকার প্রতিচ্ছবি তিনি এঁকেছেন। প্রথমটিতে তিনি অত্যন্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতন লেখক। ২০০৭ সালে বেরুলো *বালাসিন*। এটি হলো চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস ও সিনেমার গুরুত্ব বিষয়ে ব্যক্তিগত রচনা। এটিও অতি উচ্চ প্রশংসিত। এছাড়া শিশু সাহিত্যে রয়েছে তাঁর কয়েকটি অসাধারণ অবদান। এখন আমরা তাঁর রচনার ও বিশ্বধারার নমুনা স্বরূপ একটি অনুবাদ এখানে উপস্থাপন করছি। পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পেয়ে গেলাম ল্য ক্লেজিওর লেখা একটি ছোট্ট বিশেষ প্রবন্ধ। বিশেষ এ জন্য যে, এটি প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত দৈনিক *ল্য মোঁদ* এর সাহিত্য পাতায়, জঁ-পল সার্ত্রের উপন্যাসসমগ্র গালিমার এর প্লেইয়াদ সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে। খ্যাতনামা দুই কথাশিল্পী আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে ও ল্য ক্লেজিও এবং

সমালোচকপ্রবর বেরত্রঁ পোয়ারো-দেলপেশ্ (১৯৯৬ সালে এঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। আর রব গ্রিয়ের সঙ্গে ১৯৬৪ সালে) তিনজনের লেখা সেখানে ছিল। অকুস্থলে সার্ত্র প্রসঙ্গে ল্য ক্লেজিও'র অভিমত তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক মনে করছি:

'সার্ত্র সহজবোধ্যতার সৌন্দর্য। 'বিবমিষা' প্রকাশের চল্লিশ বছর পরও এই কাজের শক্তি, তার গুরুত্ব। 'দেয়াল' 'স্বাধীনতার সড়ক' 'মজার বন্ধুত্ব' (১৯৪৯) প্রভৃতি বিপরীতধর্মী রচনার একত্র সমাবেশে সার্ত্রের শিল্পকর্মের সামগ্রিক শক্তি উদঘাটিত হলো। এক অদম্য যৌবন যা তাঁর চিন্তাচেতনায়, সৃষ্টিধর্মিতার জীবনকাল শুরু করেছে।

কামনা ও বাস্তবতা, ব্যক্তির ভোগ, তার সুখের প্রবৃত্তি, সত্যের সীমানাও সমাজ নির্ধারিত করেছে। সার্ত্রের যথার্থ আগ্রহ সত্য, যৌবনের আবেগও তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কিছুই অনুসন্ধানের পথ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে পারে না।

সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য সঙ্গতি ও চলমানতা সমন্বিত হয়েছে এই ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দার্শনিকের মধ্যে। এই সৃষ্টিতে সঙ্গতিপূর্ণ প্রচেষ্টা, ইচ্ছাসূত্রে, চিন্তাভাবনায় জীবনের প্রকাশ ঘটেছে খানিকটা। এই সঙ্গতিপূর্ণতাই সম্ভবত সার্ত্রকে শুরু থেকে এত বেশি অনুরাগী ও শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে।

মাথিয়্য, ব্রুনে, রকঁত্যাঁ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে কিংবা নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েও সার্ত্র নিজেকে চেনান। আরো বেশি সত্যভাবে, আরো বেশি নির্দিষ্টভাবে বোঝার প্রয়াস পেয়েছেন। এর জন্য সাহিত্যের চেয়ে উত্তম মাধ্যম আর নেই। কেননা উপন্যাস হচ্ছে এমন এক অনুসন্ধানী দৃষ্টি, যা দিয়ে সমস্ত অস্তিত্বকে প্রতীয়মান করা যায়। রকঁত্যাঁ তাঁর ডায়েরি লেখেন, ল্যুসিয়্যাঁ শৈশব, লুলুর পরিণয়, মাথিয়্যর জীবনটাই কেটে গেল যেন অভ্যন্তরীণ সংলাপের ভেতর দিয়ে। সময় থেমে যায় যখন কেউ ঘটনার দুঃখাবর্ত অনুভব করে যেন তারা ট্রেনের কামরায় বন্দী এবং চলেছেন অজানা এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

যাত্রী যখন ইতিহাসে স্থবির হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু দেয় হাতছানি ; 'ওদের ছিল একটি নিয়তি, রাজাদের মতো, মৃতদের মতো'।

শব্দ দিয়ে যে সত্যের অনুসন্ধান সার্ত্রের, ক্রমে তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয় রক্ত মাংসের শরীরে। যা আমাদের সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে এই উপন্যাস সমগ্রে সেটা হলো, এগুলো আংশিকভাবে সব মানব অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; যা মানুষকে পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত করে। এই অনুসন্ধান যেন একটি প্রত্যাদেশ, একটি অতিক্রমণ। এটা হলো প্রতিবন্ধী হওয়ার মতো একটি সহজবোধ্যতার ক্রমবিকাশ গর্বিত বিবেকের, যে নিজেকে গলাধঃকরণ করা ছাড়া কিছুই জানে না। কর্মপ্রয়াসের সৌন্দর্যের প্রতি, কিন্তু রকঁত্যাঁর মধ্যে, মাথিয়্য বা ব্রুনের মতো একটি দুশ্চিন্তা খুঁজে পাওয়া যায়। একই সহজবোধ্যতার সূত্রে গাঁথা একটি প্রায়-বেদনাদায়ক জগতের প্রতিক্ষণে প্রতিষ্ঠিত যা প্রায়-মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিয়ে দেয়। এখন এটা পরিষ্কার দেখা যায়, যা সার্ত্রকে বাস্তববাদী বা দার্শনিক উপন্যাস থেকে আলাদা করে রেখেছে,

বিশেষ করে মাল্‌রো বা কাম্যুর কাছ থেকে। সার্ত্রের অঙ্গীকারাবদ্ধতা একেবারে সম্পূর্ণ এবং শর্তহীন। এই অঙ্গীকারাবদ্ধতাই ব্যক্তিকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সবকিছু বুঝতে দেয় ; সবকিছু প্রশ্ন করতে শেখায়। এটাই হচ্ছে ভীষণ এক একগুঁয়েমি, যা প্রায় পাগলামিতে কিংবা মৃত্যুতে পর্যবসিত করে। মাথিয়্য, ব্রুনে বা মূলত রকঁত্যাঁ থেকে পৃথক নয়; কেবলই তাঁরা মৃত্যুপথে এগিয়ে যান। তাঁরা তাঁদের অনুসন্ধান ছাড়তে রাজি নন। বিশ্বাসহন্তা হতে চান না ওঁরা। বরং নিঃসঙ্গতার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীরপুরুষরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন।

সার্ত্রের সৃষ্টিকর্মে, বিশেষ করে যেগুলোর অভিজ্ঞতা এবং দৈনন্দিনতার ভিত্তিতে নির্মিত বাস্তবের এক অসাধারণ শক্তি; কিন্তু এই বাস্তবতা কোনো জ্ঞানের প্রকাশ নয়, মানুষের ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিশ্বাসেরও নয়। এটা বরং একটা সম্পূর্ণ প্রয়াস, একটা উন্মত্ততার মতো। সার্ত্রের নায়করা সার্ত্রের মতো। বিশ্বকে ভালোভাবে সৃষ্টি করার জন্য বাস্তবের ওপর মাতাল দৃষ্টি মেলে ধরে না। সব জ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীর নির্দিষ্ট মিলনের এবং তার ভাষার প্রকাশ ঘটায়। সার্ত্র এমিল জোলা এবং ফ্র্যাংক নরিস এর উত্তরাধিকারী যতটা নন, ততটা রাবলে, দস্তয়েভস্কি এবং ডোস্ পাসোসর এবং সেলিনেরও। তাঁদের স্বগতোক্তি, কমবয়সের উৎপীড়ন, নিজের সম্পর্কে ব্যবহারের ভাষার গুরুত্ব নির্ধারণ করে দেয়।

কৌতুকও আছে। ঠাণ্ডা কৌতুক, সর্বধ্বংসী ক্রোধ, অফুরন্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে, যাদের তিনি ভালো জানেন। সব ছোট দোষত্রুটি, ছোট দুর্বলতা, ছোট হাস্যকর আচরণ, যেমন "ল্য স্যুরসি" যেমন "ল্য বুভার" এর লেখকের চিহ্ন এবং যা সার্ত্রের লেখনীতে পাপ স্বীকারের মতো কিংবা আত্মসমালোচনার মতো মনে হবে। সেটাই সার্ত্রের লেখা নিয়ে আমাদের সমস্যায় ফেলে দেয়। অনন্তকালের মতো যা দানিয়েল ওর দৃষ্টি পার হয়ে যায় এবং তাকে ঈশ্বর মনে হয়; কিন্তু যা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত হয়ে যায় : 'আমি সাহিত্য করি'।

বাস্তবতার শক্তি সার্ত্রের রচনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রাখে, জীবন্ত করে। নতুন সংস্করণের উপন্যাস একই কাহিনিও শেষ, যা যুদ্ধোত্তর কালকে খুবই চিহ্নিত করেছে। সার্ত্র শব্দমালা দিয়ে যার জন্ম দিয়েছেন তা খুবই বিস্ময়কর। মনে হয় প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি চৈতন্য সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ভার বহন করে, গভীর প্রতিধ্বনি শোনায় : রাজনৈতিক বক্তব্য, কিংবদন্তি, যেটা যৌথ মতিভ্রম, মায়া, হতোশ্যি, উন্মাদ, আশা সবকিছু ; যা একটি যুগ সম্পর্কে বলা হয়, তা সেখানে আছে এবং এর পাতায় পাতায় সন্নিবিষ্ট। আর কী যুগ! যুদ্ধ সার্ত্রেকে বিমোহিত এবং ভয়ার্ত করে। যুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা তছনছ করে দেয়,

যা মানুষের কাছে উন্মোচন - তারা যথার্থই কী এবং কোনো ছদ্মাভরণ না নিয়ে কী তাদের স্বরূপ?

সত্য সব সময় তাই- যা সুখ এবং অসুখ এনে দেয়। সার্ত্রের রচনার এই সমগ্র যা আজ এক সম্পূর্ণতায় অনুভব করা যায়, একটা প্রতীকরূপে; কারণ এ এক

অভ্যন্তরীণ বিপ্লব। সার্ত্রের নায়করা, আমাদের মতো তাদের সারল্য হারিয়ে ফেলেছে। তারা তাদের অনুসন্ধানে বেঁচে থাকে এক দুঃসময়ের মধ্যে ক্রনে ভিকাবিওসকে যা বলে তাতে আশার কোনো চিহ্ন নেই।

পৃথিবীর চারদিকে হাজার হাজার ক্রীতদাস এবং আগুন- তুমি বন্ধুত্ব চাও? তুমি প্রেম চাও? সঙ্গে সঙ্গে তুমি একজন মানুষ হতে চাও?

সন্দেহের কোনো কারণ নেই; সার্ত্রের কণ্ঠস্বর আজ এখনো আমাদের সঙ্গে কথা বলে, আমাদের বর্তমান সময়েও।

মহিলা কবি আনা দ্য নোয়াই

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে ফরাশি মহিলাদের কাব্যচর্চায় এগিয়ে আসতে, বিশেষ করে রোমঁতিক ভাবনাযুক্ত রচনায় নিমগ্ন থাকতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য আমরা তাঁদের প্রত্যক্ষ করি কথাসাহিত্যে বেশি অগ্রসরমান হতে। যা হোক, Anna de Noailles (1876-1933) স্বনামধন্য এক দাপুটে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। একান্ত আপন প্রতিভা সংযুক্ত ছিল তাঁর নব্য-রোমঁতিকতা। শুধু এক অসামান্যা অভিজাত রূপসী কবি নন, আনা ভালো অংকনশিল্পীও ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "পৃথিবীর সৌন্দর্যে আমি ভর করে আছি। এবং সব ঋতুর সুগন্ধ রয়েছে আমার হাতে।" আমরা এখানে তাঁর একটি কবিতার অনুবাদ দেব-

চিহ্ন
জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি ভালোভাবে চেপে ধরবো
এমন কঠিন বাঁধন আর গভীর আলিঙ্গনে
দিবসের পেলবতা আমাকে বিমুগ্ধ করে রাখার
পূর্বাহ্নে উষ্ণতায় ভরে রাখবে

ছড়িয়ে থাকা ভূখণ্ডে সমুদ্র তার জলরাশি
নিয়ে এলোমেলো পথ আঁকড়ে ধরবে
আমার বেদনার স্মৃতি-কটু আর লবণাক্ত
চলমান জাহাজের মতো দিনের চাকা ঘুরে

পাহাড়ের ঢালুতে আমি নিজেকে রাখবো
আমার চোখের উষ্ণতা যেমন পুষ্পিত হবে

এবং বিষাক্ত পতঙ্গ কাঁটার ওপর একটু
বসে দ্রুত পালিয়ে যাবে

বসন্তের বাগানে নতুন সবুজ
ঘন তৃণ মাঠের প্রান্তে
আমার বাহুর অনুরণন অনুভব করবে
এবং পাখা বিস্তারে পালিয়ে যাবে

যে-বাহুর ছায়ার অন্তরালে
প্রকৃতি আমার সুগন্ধ ছড়াবে
মানব হতাশার ওপরে
আমি রেখে যাবো আনন্দ আর আমার হৃদয়ের যথার্থ স্বরূপ।
("L'empreinte," *Le Coeur Innombrable,* 1901)

আনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পর্ক হয়েছিলো, সেটিরও উল্লেখ না করলে নয়। ১৯২০ সালে প্রথম সাক্ষাতকারে তিনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবিতা শুনেছেন এবং নিজেও তাঁকে শুনিয়েছেন। দ্বিতীয়বার (১৯৩০) তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই অংশটুকু আমার *রবীন্দ্রনাথ ও ফরাশি সংস্কৃতি* গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি:

স্যুজান (কার্পেলেস) সুন্দর করে লিখেছেন তাঁদের স্বনামধন্য মহিলা কবি আনা দ্য নোয়াইর পরিদর্শনের কথা: 'অপূর্ব সুন্দরী তিনি, তেমনি রুচিপূর্ণ তাঁর বেশভূষা। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো চেহারা তাঁর, আবালবৃদ্ধ সমস্ত পুরুষই প্রথম দর্শনে তাঁর প্রেমে পড়তো। হাবুডুবু খেত, লুটিয়ে পড়তো তাঁর পদতলে। সে জন্যেই বিজয়িনীর মতো এসেছিলেন তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবির কাছে, গোটা ভারতকে তাঁর অঙ্কশায়িত দেখবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে। অবিস্মরণীয় এক নাটকীয় দৃশ্যের সাক্ষী রইলাম আমি। রবীন্দ্রনাথ যতই উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর রূপে, আনা দ্য নোয়াই-এর ততই রোখ চেপে যাচ্ছে তাঁকে বশে আনবার, কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। কয়েক মিনিট বাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা দুজনেই কবি এবং তাঁদের সাক্ষাতকারের এই তাৎপর্যটুকু বিস্মৃত হওয়া অন্যায়। তখন অত্যন্ত সাদা গলায় আনা দ্য নোয়াই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন স্বরচিত কিছু কবিতা শোনাতে; তারপর এলো আনার স্বরচিত কবিতা পড়বার পালা'

কোঁতেস আনা দ্য নোয়াই রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর ক্যাটালগের যে ভূমিকা রচনা করেছিলেন, তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। আমরা তার পাঁচটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরলাম:

১. 'দশ বছর আগে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল, গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায়,

সেই নদীর ধারের এক প্রাচ্য-সুলভ বাগানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পায়চারি করবার। কবির উন্নত দীর্ঘ দেহ, সোনালি বালির ওপর তাঁর মৃদু পদক্ষেপ, নিয়তিকে বরণ করে নিয়ে নিজে হাতে তাকে গড়ে নেবার ক্ষমতায় দৃপ্ত এক দৃঢ়সঙ্কল্প নবীর মতো মুখশ্রী, সমস্ত মানবতাকে সমৃদ্ধ করতে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম শান্ত-স্নিগ্ধ দুটি হাত, সব কিছুই সামঞ্জস্য এনে দিচ্ছিল বাগানের পথের দুধারে ফোটা অজস্র বাংলা দেশের গোলাপের সঙ্গে, জাগিয়ে তুলছিল তাদের নতুন এক তাৎপর্য।

কী মহান কী প্রাচুর্যধন্য এই মহামানব যাঁর প্রতিটি কথাই যেন স্বগতোক্তি, প্রতিটি কথাই রহস্যময় অথচ রূপোলি সমুদ্রের মতোই স্বচ্ছ।

২. 'এই কবি নিজেকে প্রচুর অবকাশ দিয়েছেন নিজেকে নিবিড় করে জানবার জন্যে। জ্ঞান তাঁর আসে হঠাৎ, তারপর জাগে তাঁর সন্দেহও, তেমনই আকস্মিক। এই যে যাদুকর যিনি নির্ভয়ে হাত তুলে দাঁড়াতে পারেন আসন্ন ঝড়ের মুখোমুখি, যিনি অসহ্য মারাত্মক বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা উপশম করতে জানেন নিছক ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে, তাঁকেই দেখেছি কি সঙ্কুচিত আপন সৃষ্টির প্রসঙ্গে - এর সাক্ষ্য দিতে পারি আমরা সবাই। সবাই যখন তাঁর প্রশংসা করে- সন্দিহান, দ্বিধান্বিত, উনি শুধু হাসেন।

৩. 'বিস্ময়কর এই সৃষ্টিগুলি, যা একধারে চোখ জুড়োয় আর আমাদের টেনে নিয়ে চলে বহু দূরের সেই সব দেশে, যেখানে কাল্পনিক বস্তুই বাস্তবের চেয়ে বেশি করে বাস্তব - ভেবে চমৎকৃত হতে হয় কী করে যুক্তিবাদী স্বপ্নপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টির দ্বার খুলে দিলেন! বুনো পায়রার মতো রঙের কমনীয় যে হাতে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই হাতই তাঁর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে খুঁজে পেল হঠাৎ, অব্যক্তর আনন্দ সুরায় মাতাল হয়ে, ক্ষুরস্যধার রচনার বিধিনিষেধ থেকে অনেক-অনেক দূরের এক জগৎ যেখানে কল্পনার অদম্য শক্তিই সর্বেসর্বা। প্রথমে মোটামুটি কিছু স্কেচ এঁকে নিয়ে তিনি তারপর বসলেন অবচেতনার ঐশ্বর্যরাশিকে সমৃদ্ধতর নিটোলতর করে তুলতে, অলৌকিক পথ- প্রদর্শকের বাধ্য শিষ্যের মতো।..

৪. 'প্রথম দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলো ঘুমের ঘোরে সূক্ষ্ম কোনো লোকে প্রবেশ করবার মতোই অস্পষ্ট স্বপ্নালু মনে হলেও অনবদ্য রচনাশৈলীর কল্যাণে অনতিবিলম্বেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে; হতবাক হয়ে যেতে হয় এই প্রতিভাধরের অণোরনীয়ান মহতো মহীয়ান আত্ম-অভিব্যক্তির ছন্দ দেখে। ছায়ার পোঁচ, তুষারের শুভ্রতা, কত লাল, কত সবুজ, কত-না বেগুনির সমাবেশ, যা গড়ে তুলেছে জীবন্ত এক বিশ্ব। যে-রবীন্দ্রনাথের মনমাতানো গান আমাদের নিয়ে গিয়েছে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কত না প্রত্যয়ের লোকে, আজ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন মানবসাগরের সুমহান রহস্য, অসংখ্য পুরুষক্রমিক প্রভাবের রহস্য, যা কি-না লুটিয়ে পড়েছে অসুরের অট্টহাসিমুখর প্রেতগণের পদতলে!...

৫. 'কেন মহান মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ, প্রেমোন্মাদ কবি এমন আকস্মিকভাবে নিজেকে ধরে দিলেন অজানা সেই শক্তির কাছে, যে-শক্তি তাঁর মনের আড়ালে বসে

বিদ্রুপে,ব্যঙ্গে, এমনকি ঘৃণায় পুষ্ট হয়ে উঠছিল? যতই যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে রূপেরই সত্তা। কি মহানুভব মুখভঙ্গী, দৃপ্ত ভাব, নাগলোকের কমনীয়তা, আর গভীর নীলরাত্রি যেখানে শেক্সপীয়রের আঁকা সুখী প্রেমিক- প্রেয়সীরা কি-না আমাদের নিয়ে যায় মৃত্যুহীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-প্রায় এক স্বর্গের সুষমালোকে। কিন্তু সের্ভান্তেস-বর্ণিত চরিত্রগুলির মতো পার্শ্বচিত্রগুলিকেই বা আমরা কী করে এড়িয়ে যাই? অস্বস্তি না অনুভব করে কী করে পারি অশিবগ্রস্ত মুখোশগুলোর সামনে - রোগা, লাল, পাণ্ডুর, বিশেষ এক কোণ থেকে যা দেখা দিয়েছে ছুরির ফলার মতো প্রখররূপে? ছলনা, খলতা, বিশ্বাসঘাতকতারই অবতার যেন এক-একটা? এগুলো পরেই, একজোড়া পায়রার ছবিতে যে নিপুণ ভারসাম্য সৃষ্ট হয়েছে, দেখে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর হাওয়ার বুকে যেন থমকে-দাঁড়ানো সগর্ব সুন্দর হরিণটাকে দেখে কে না অভিভূত হবে? ...'

রবীন্দ্রনাথ এবং আনা দা নোয়াই, পারি, ১৯২০

রম্যাঁ রলাঁ

(জন্ম ১৮৬৬, মৃত্যু ১৯৪৪)

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার রম্যাঁ রলাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সর্বত্র সুপরিচিত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ যোগাযোগ *জুরনালে* পরিব্যক্ত। তাছাড়া *গান্ধী - রম্যাঁ রলাঁর দৃষ্টিতেও* একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর রয়েছে তাঁর বহুল পঠিত রচনা। উন্নতমানের পড়াশুনার মাধ্যমে তিনি ইতিহাস শাস্ত্রের আগ্রেজে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হন। শিল্পতত্ত্ব ও সংগীতে তিনি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান লাভ করেন। এক সময়ে নাট্যরচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী বিটোভেনের জীবনী (১৯০৩) এবং অন্যান্যদের নিয়ে লেখা তাঁর রচনা তুলনারহিত। এক সংগীতজ্ঞের কাহিনি নিয়ে আট বছর ধরে (১৯০৪-১৯১২) লেখা তাঁর *জঁ ক্রিস্তফ* বহুখণ্ডে প্রকাশিত হয়ে বাংলায় অনূদিতরূপে আমাদের কাছে বরণীয় ছিল। তাছাড়া বাংলায় অনূদিত *বিমুগ্ধ আত্মা* (সাত খণ্ড, ১৯২২-১৯৩৩) সেকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। এককালে বিপ্লবী, পরে সক্রিয় শান্তিবাদী (১৯১৬ সালে প্রাপ্ত নোবেল পুরস্কার তিনি রেডক্রসকে দান করে দেন)। ১৯৪০ দশকের শেষ দু'বছর ও পরবর্তী কয়েক বছরে আমি স্কুল কলেজের ছাত্ররূপে তাঁর গ্রন্থাদি পড়ি, বিশেষ করে তাঁর *I will not rest*- এর অনুবাদ *শিল্পীর নবজন্ম* তখন আমাদের সবাইকে খুব প্রভাবান্বিত করে। পরে প্যারিসে গিয়ে তাঁর পরিচিতি কিছুটা ম্লান দেখে আমি একটু হতাশ হই। তবে জাক দমুজ্যাঁ নামে এক অধ্যাপকের সৌজন্যে রলাঁর জীবনী আমার হস্তগত হয় এবং জীবনীকারের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই সময়ে তাঁদের পরামর্শক্রমে মোঁপারনাসে অবস্থিত রম্যাঁ রলাঁ ফাউন্ডেশনে আমি বেশ কিছুদিন যাতায়াত করি। গ্রন্থাগারে কাজ করি। সেখানে মাদাম রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। কিন্তু গবেষণার চাপে আমি রলাঁ সম্পর্কে কাজ করতে পারিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর বোন মাদ্‌লেন বাংলা শিখেছিলেন এবং তাঁর লেখা একটি বই রয়েছে। রম্যাঁ রলাঁ মাদ্‌লেনের মারফত বাংলা ও ভারতের নানা বিষয়ে বহু উপাত্ত সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

জাক প্রেভের

ইতোমধ্যে একশো বছর !

ফরাশি কবিতার বর্ণিল ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা জাক প্রেভের। দেখতে দেখতে তাঁর জন্মশতবার্ষিক এসে গেল। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! চির-শিশু, চির-কিশোর কিংবা সিগারেট মুখে গম্ভীর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কখন জন্মেছিলেন, কখন ঘটে গেল তাঁর মৃত্যু, আর এর মধ্যে বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হতো একশো বছর! বস্তুত, ২০০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্যে প্যারিসে তথা ফ্রান্সে হবে জন্মশতবার্ষিকীর হৈ-হুল্লোড়। যদিও থোরাই পরোয়া করেন কবি এসবের জীবিতকালে যেমন নয়, মৃত্যুর পর তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমাদের তো একটু দায়িত্ব আছে। কবিতাপ্রেমী বাংলাদেশে কেন আমরা মনে করবো না কবিকে? না-হয় একটু আগে-ভাগেই স্মরণ করি তাঁকে।

বাঙালি কবি ও ফরাশিবিদ অরুণ মিত্র অনেক আগেই স্মরণ করেছিলেন এই কবিকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত তাঁর দু-একটি প্রবন্ধে প্রেভের প্রসঙ্গ এসেছে। আবার ষাটের দশকের প্রথম দিকেই প্রেভের নজরে আসেন বর্তমান লেখকের। প্যারিসে এক বন্ধুর বাসায় 'বার্বারা' কবিতাটি পড়বার স্মৃতি এখনো জ্বলজ্বল করছে। সদ্য ফরাশিবিদ্যা কিছুটা আয়ত্ত করে যুবক লেখক তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যেন। কবিতাটি আমাকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে মনে হয়, এরকম কবিতা আমি যেন আর কখনো পড়িনি! সেদিনের সেই শিহরণ, আনন্দ ও বেদনাবোধ আমার চৈতন্য থেকে এখনো অবলুপ্ত হয়নি। এসময় থেকে বিগত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের সময় পরিধিতে তাঁর আরও বহু কবিতা পড়ি। প্রেভের আমার বহু রকমের সুপ্তবোধকে যেন জাগিয়ে তোলেন। দেশি-বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করি। ১৯৫৯-৬৮ সালে ফ্রান্স অবস্থানকালে লক্ষ্য করি ফরাশি যুবসমাজে তাঁর প্রভাব। কখনো কখনো মনে হয়েছে তিনি যেন তাঁদের একচ্ছত্র সম্রাট। অথচ তিনি স্বয়ং ভয়ানকভাবে

নির্লিপ্ত, অনেকটা যেন তাঁর কবিতা 'মে মাসের গান' এর রাজার মতো যিনি মারা যাবেন বিরক্তিতে। স্যাঁ জেরঁম্যা দে-প্রের কাফে ও কাবারে জুলিয়েৎ গ্রেকো তখনো গেয়ে চলেছেন প্রেভের এর যুগপৎ সেন্টিমেন্টাল ও এন্টিসেন্টিমেন্টাল গানগুলো। ইতোমধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে সময়। প্রেভের-এর কবিতার দুচারটি অনুবাদ হয়তো পড়েছি। আমার পরলোকগত শিল্পী বন্ধু রশীদ চৌধুরীও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন প্রেভের অনুবাদে। তাঁর কাছ থেকে পড়তে নেওয়া প্রেভের-এর *ইস্তোয়ার* বইটি এখনো রয়েছে আমার শেল্‌ফে। অবশ্য এর আগেই সেই ৬৩/৬৪ সালে ফরাশি লেখক, ইকবাল -নজরুলের অনুবাদক, মাদমোয়াজেল ল্যুস ক্লোদ মেৎর আমাকে জাক প্রেভের রচিত *ল'পেরা দলা ল্যুন* শীর্ষক শিশুতোষ বইটি পড়তে দেন। অপরূপ গ্রন্থ! তরতাজা ভাষার কারিগরি ছাড়াও রয়েছে জাক্‌লীন দুয়েমের বহুরঙা ছবি। বইটি সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত, প্যারিসে পাওয়া যাচ্ছিলো না তখন। মেৎর ফেরৎ নেননি তাই। অনেক পরে বইটির একটি অনুবাদ বার করা হলো ঢাকা থেকে।[২] বইটি নিশ্চয়ই পছন্দ করেছিলেন কেউ কেউ, যদিও নজরে আসেনি কোনো আলোচনা-সমালোচনা। অল্পসময়ে নিঃশেষিত হলেও পুনর্মুদ্রণও হয়নি এযাবৎ। '৭২ সাল থেকে আমি নিজে মাঝেমধ্যে কিছু তর্জমা করে যাচ্ছি প্রেভের থেকে, কখনো কখনো এক একটি কবিতা একাধিক বার। তবে এর মধ্যে এদেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, প্রেভের এর মৃত্যুর পর প্রকাশিত বর্তমানে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কবি শহীদ কাদরীর একটি ছোট প্রবন্ধ। ছোট্ট কিন্তু ভারি মর্মস্পর্শী লেখা! ১৯৭৭ সালে ১১ এপ্রিল মৃত্যু ঘটে জাক প্রেভের-এর। কদিন পরই শহীদ কাদরী তাঁর প্রবন্ধের উপসংহার টেনেছেন এভাবে :

'স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত প্রেভের-এর একটি প্রখ্যাত কবিতা (La Crosse en l'air) পিকাসোর গুয়ের্নিকার (Guernica) সমতুল্য বলে অনেকেই মনে করেন। এই বাকবিতণ্ডা থেকে আমরা (যারা মূল ফরাশিতে কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না) এই সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে, জাক প্রেভের একজন বিতর্কিত কবি। অর্থাৎ তাঁর জীবনাবসান ঘটলেও তাঁর কবিতা সংক্রান্ত তর্কের অবসান সহজে ঘটবে না। এও এক ধরনের বিজয় মৃত্যুর ওপরে জীবনের'।

কাদরীর শেষ কথায় পাই মাল্‌রোর প্রতিধ্বনি। বস্তুত, প্রবন্ধের গোড়ার দিকে কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত মাল্‌রোর মৃত্যু প্রসঙ্গটিও নিয়ে এসেছিলেন তিনি। মাল্‌রোর এক বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, "আর্ট ইজ অ্যান্টি-ডেস্টিনি"। মানুষ মারা যাবে, বেঁচে থাকবে তার শিল্প। নিয়তির ওপরে এখানেই মানুষের বিজয়। যাহোক, আমরা ফিরে আসি প্রেভের প্রসঙ্গে।

ভীষণরকমের সিগারেটখোর 'খুবই নরোমশরম নিকোটিন ডাইনীর হাতে' প্রেভের কে আত্মসমর্পণ করতে হলেও তাঁর বিদ্রোহী সত্তা, স্বর্গীয় বালকসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে বিশ্বব্যাপী। তাঁর যে জনপ্রিয়তাকে এক কালে সন্দেহের চোখে দেখা হতো কিংবা বিবেচিত হতো অবজ্ঞার সঙ্গে, তাকেই এখন ঘুরিয়ে তিনি যে

দৈনন্দিনতার গান গেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন সে কথা জোর গলায় বলা হতে থাকলো ১৯৭৭ সাল থেকে, তাঁর মৃত্যু হবার পর অবধি। অবশ্য শহীদ কাদরী আমাদের আগেই জানিয়েছিলেন যে,

'চল্লিশের দশকের ফরাসী সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে প্রেভের হচ্ছেন The only authentic poet, who upto the present time, has known how to break through the limits of a more or less specialised public অর্থাৎ শিল্প সাহিত্যের ভোক্তা বলতে আমরা যাঁদের বুঝি, সেই "বিশেষ জনগোষ্ঠী" এবং তার সীমা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের হৃদয় তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন। একজন আধুনিক কবির পক্ষে এটা কোনো কম কথা নয়।' কম কথা তো নয়ই, বরং অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রেভের এর জীবৎকালে তাঁর কবিতার বইয়ের বিক্রি ছিলো অকল্পনীয়। তাঁর *Paroles* বইটি (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫) ১৯৫৭ সনে পকেট বুক সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে ১ জানুয়ারি ১৯৬৫ এর মধ্যে বিক্রি হয়েছে ৪,৬৪,১৪৬ কপি, *Spectacle* (১৯৬০) ২,৪৬,৯০২ *La Pluie et le beau temps* (১৯৬২) ১,৭১,১৬৭ কপি। একই সময়ে কিন্তু এল্যুয়ারের নির্বাচিত কবিতার (১৯৬২) বিক্রির সংখ্যা মাত্র ১,২০,০৭০ কপি।[৫] অথচ স্বীকার করতেই হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে এবং সমকালীন ফরাশি সমাজে পোল এল্যুয়ার অনেক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত। মৃত্যু পরবর্তীকালে প্যারিসে ও অন্যত্র প্রেভেরকে নিয়ে অসংখ্য প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হয়েছে, তাঁর নামে বহু প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ঘটেছে যাতে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার বিষয়ে অনুমান করা যায় সহজে। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে তাঁর ওপর লেখা প্রবন্ধ ও সন্দর্ভসমূহের সংখ্যা। সেজন্য আমাদের ধারণা, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বে বহু উদ্দীপনাময় উৎসবমুখর অনুষ্ঠানাদি হবে, হবে এন্তার ছোট বড় প্রকাশনা। এবং এই সুযোগে আমরাও শরীক হলাম তাতে।

শৈশব ও যৌবন

জাক প্রেভের জন্মেছিলেন শতাব্দীর গোড়ায়, ১৯০০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, প্যারিসের প্রখ্যাত সড়ক শঁজেলিজে থেকে সামান্য দূরে নঅঈ-স্যুর সেনে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর মা ছিলেন নরোম মেজাজের কিন্তু উষ্ণ হৃদয়ের মহিলা। বাবাও হাসিখুশি মানুষটি তবে প্রায় ঋণগ্রস্ত এবং সেজন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন পিতামহের ওপর। পিতামহটি আবার কঠোর প্রকৃতির এবং গোঁড়া ক্যাথলিক। তবে পুত্রের জন্য তিনি দরিদ্রদের সাহায্য দেবার কেন্দ্রীয় অফিসে একটি চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে বৃহস্পতিবার স্কুল বন্ধ থাকলে জাক প্রেভেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাবা সাহায্যের উপযুক্ত গরীবদের এলাকা পরিদর্শনে যেতেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে বহু কবিতা ও চলচ্চিত্র কাহিনিতে তিনি তার ব্যবহার করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স কম। তাই যুদ্ধে যেতে হয়নি। দোকানের

সহকারী থেকে শুরু করে নানা ছোটখাট কাজে লিপ্ত থাকেন তিনি। ১৯২০ সালে যান মিলিটারি সার্ভিসে। ইভ তঁগি (পরবর্তীকালের এক স্যুররেয়ালিস্ত শিল্পী) এবং মার্সেল দ্যুয়ামেল-র (যিনি পরে ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন) সঙ্গে মোঁপারনাস এলাকায় বাসা ভাড়া করে একসঙ্গে বসবাস করতে থাকেন।

১৯২৪ থেকে বছর চারেক চলে এই এডভেঞ্চার। স্বাধীন জীবনযাপনের এ পর্যায়ে তিনজনই যোগাড় করেন তিন বান্ধবী যাঁদের তাঁরা বিয়ে করেন পরে। জাক যাকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর নাম সিমন দিয়েন, বাল্যবান্ধবী। পরে, তিরিশের দশকে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জানিনকে বিয়ে করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা মিশেল, জন্ম ১৯৪৬ সালে। প্রেভের তখনও কিছু লিখছেন না। গল্পগুজবে তাঁর সময় কাটে, চলচ্চিত্রে ছোটখাট ভূমিকায় নামেন। এই সময়টাকে প্যারিসের ইতিহাসে 'লা বেল এপক' আনন্দময় এডভেঞ্চারের কালরূপে চিহ্নিত করা হয়। কিউবিজম দাদাবাদ পার হয়ে স্যুররেয়ালিস্ত পর্বের তখন শুরু।

কর্মজীবন

১৯২৭-২৮ এর দিকে নির্মিত 'প্যারিস স্মৃতি' শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারি ছবিতে জাক প্রেভের চিত্রকাহিনি রচনার কাজে যোগ দেন। এসময় প্যারিস থেকে প্রকাশিত মার্কিন দ্বিভাষী পত্রিকা 'ট্র্যানজিশান'-এ তাঁর একটি লেখা বের হয়। ১৯৩০ সালে স্যুররেয়ালিসম-এর প্রবক্তা অঁদ্রে ব্রতোঁর সঙ্গে ফরাশি বুর্জোয়া সমাজের দুর্নীতি ও কপটতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু শ্লেষাত্মক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন জাক প্রেভের। ৩২-৩৬ সালে তিনি ফরাশি শ্রমিক থিয়েটার ফেডারেশানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নাট্যান্দোলনের প্রধান লেখকে পরিণত হন। 'অক্টোবর গ্রুপ' নামে খ্যাত এই দলটি রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত এবং বামপন্থী চিন্তাধারায় স্নাত। প্রেভের অবশ্য নিজেকে ও দলকে কম্যুনিস্ট পার্টির লেজুড় হতে দিলেন না। সারাটি জীবন তিনি এক অদম্য স্বাধীনতার বাণী প্রকাশে ও মুক্তভাবে বিচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তখনকার দিনে এবং পরবর্তীকালেও একটা সাধারণ ধারণা হচ্ছে তিনি এনার্কিস্ট ও ননকনফরমিস্ট। তাঁর বিবিধ রচনায় এ ধরনের ভাবধারার প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য। ১৯৩৩ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত একটি বড় নাট্যোৎসবে প্রেভের রচিত ব্যঙ্গ নাটিকা উপযুক্তভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তী বছর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে যান।

এরপর থেকে প্রেভের কবিতা ও গান রচনায় বেশি মনোনিবেশ করেন। প্রতিভাবান সুরকার জোসেফ কসমার সঙ্গে শুরু হয় তাঁর নতুন ধরনের গান পরিবেশনার কাজের সহযোগিতা, যা চলে আজীবন। বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবের দ্যোতনায় প্রেভের প্রথম থেকে অনবদ্য রচনারাজি উপহার দিতে লাগলেন। নাট্যরচনায় ইস্তফা দিয়ে তিনি চিত্রনাট্য রচনায় মন দিলেন। প্রেভের-এর সৌভাগ্য তিনি সেরা ফরাশি প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মার্সেল কার্নের সঙ্গে সৃষ্ট লে

ভিজিত্যর দ্যু সোয়ার, দ্রোল দা দ্র্যাম, লে পর্ত দ্য লা নুই এবং *লে জঁফঁ দ্যু পারাদি* সর্বকালের সেরা ফরাশি ছবিগুলোর অন্যতম। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কিছু ব্যালে এবং ছায়া নাটকের দিকে আকৃষ্ট হলেন। তাঁর কন্যার জন্মের পর তিনি শুরু করলেন শিশুদের জন্য গ্রন্থ রচনা। *লপেরা দলা ল্যুন*, বাংলায় চাঁদের অপেরার কথা আগে বলেছি। ছ'টি অপরূপ শিশুতোষ গ্রন্থ তাঁর রয়েছে। তাঁর সংকলিত ছোট গল্প 'লাল গোলাপ' 'চার ঋতুর ফোয়ারা' প্রভৃতি প্যারিসের নামী দামি কাবারে থিয়েটার সমূহে অভিনীত হতে থাকল। প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী গায়িকা জুলিয়েৎ গ্রেকো, অভিনেতা গায়ক ইভ মোতঁ, শার্ল ত্রেনে, ফ্রের জাক গ্রুপ প্রমুখ প্রেভের এর বিভিন্ন মেজাজের ও আঙ্গিকের গান পরিবেশন করে তাঁর খ্যাতির দিগন্ত আরো বাড়িয়ে দিতে থাকেন। সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশনের জন্য বিবিধ রচনা ছাড়াও ফটোগ্রাফি, কোলাজ ও অন্যান্য ফর্মের শিল্পকর্মেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন জাক।[৬] প্রথম দিকে তাঁর সম্পর্কে অনাগ্রহ ও সমালোচনা, পরবর্তীকালে কিছু প্রতিহিংসা থাকলেও মৃত্যুর আগের দশ বছরে তিনি প্রবলভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ফরাশি চলচ্চিত্র জগতের তিনটি বড় পুরস্কারও তিনি লাভ করেন।

কবিসত্তা ও কাব্যকৃতি

প্রেভেরে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর প্যারিসীয় সত্তা। বলা যেতে পারে যে, জাক ছিলেন অস্থিমজ্জায় প্যারিসীয় যাকে ফরাশিরা অভিহিত করে থাকেন 'পারিজিয়াঁ' বা 'পারিগো'। স্যুররেয়ালিসম দিয়ে শুরু করে তাঁর আয়ত্বে এলো এক বিশেষ ধরনের বাস্তবতাবোধের ব্যবহার যা তাঁর নিজস্ব। কিন্তু এখানেও তাঁর সবচে বড় কাজ ভাষার ভাঙচুর কিংবা অব্যবহৃত, এমনকি ব্যবহার-অযোগ্য শব্দের এক আশ্চর্য প্রমিতকরণ ও প্রাণীতকরণ। সরলের মধ্যে যে গরল লুক্কায়িত, আবার অশুভের ভেতরও যে শুভর ইঙ্গিত দৈপ্যমান তার প্রদর্শন তিনি করেছেন সুকৌশলে, সর্বকালের বুর্জোয়া বচন ও মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। আধুনিক কালের, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সাধারণ মানুষের ভঙ্গুর জীবনের তুচ্ছ অভিজ্ঞতা ও প্রাত্যহিকতার 'আশ্চর্য' প্রকাশ আছে প্রেভেরে :

মা বোনেন উল
ছেলে যায় যুদ্ধে
মার কাছে সেটা খুব স্বাভাবিক
আর বাবা কী করেন, বাবা
তিনি আছেন ব্যবসায়
...
যখন যে শেষ করবে যুদ্ধ
তখন সে ব্যবসা করবে বাবার সঙ্গে
...

পুত্রধন নিহত তারটা আর চলছে না
বাবা মা যান কবরস্থানে
বাবা মার জন্য সেটা স্বাভাবিক
ব্যবসা যুদ্ধ উলবোনা যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা ও ব্যবসা
কবরস্থানের সঙ্গে জীবন।
(পরিবার পরিচিতি/ পরিবেশ ও পরিস্থিতি)

এই প্রাত্যাহিকতা উত্তরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'পরিবেশ ও পরিস্থিতি' পর্যায়ের প্রথম কবিতা 'সকালের নাশতা' প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। বহু আগে 'ব্রেকফাস্ট' নামে দিলীপ মালাকার অনুদিত কবিতাটি পাঠ করে একজন বর্ষীয়ান কবি, যিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং একখানি কবিতাপত্রের সম্পাদক, একসময়ে (১৯৭১) মন্তব্য করেন "জনি না, আধুনিকতা সারা পৃথিবী জুড়েই কোন পথে চলেছে। কবিতায় যে ব্যঞ্জনা, যে ইঙ্গিতময়তা, তা যেন চলে যাচ্ছে, 'চামচে দিয়ে কফিটা নাড়লাম, চুমুক দিয়ে খেলাম' এই যেন আজকের কবিতা। তাঁর জিজ্ঞাসা, "এটা কি কবিতা হলো? কিন্তু "আধুনিক বাংলা কবিতা ও দ্বন্দ্ববাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় সমস্যাটি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন' "ঐটি কবিতা হয়ে উঠেছে। হয়ত মনে হবে, সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলের এটা রিপোর্টাজ। অবশ্য রিপোর্টাজের ধর্ম এতে রয়েছে। কিন্তু তবু এটি কবিতা হয়ে উঠেছে। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেঁয়েমী, তার সুর এই কবিতার মন্থরতার ব্যঞ্জনায়। 'আমার দিকে সে তাকাল না, একটি বারও আমার সঙ্গে কথা বলল না, আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম' এরই মাঝখানে যে প্রাত্যহিক জীবনের ট্রাজেডি, সেটুকু প্রকাশ করতে পেরেছে বলেই এটি কবিতা হয়ে উঠেছে।"[৭]

বস্তুত, প্রাত্যহিক জীবন কিংবা চলমান কালপ্রবাহকে প্রেভের রচনায় ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন নানাবিধ পদ্ধতিতে। কবিতা, গদ্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকর্ম বহুমাধ্যমে নিরন্তর সাধনায় রত ছিলেন তিনি। প্রথমে লক্ষ্য করি শিশুর অবস্থান, শিশুর চিন্তাবিকাশের ধারা, প্রাণী ও মানুষের (এক্ষেত্রে ছোট্ট এক মেয়ে, দ্র.'বিড়াল ও পাখি' কবিতা) কিংবা বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা 'হতাশা বসে আছে বেঞ্চির ওপর', প্রেমাসক্তের বিবিধ অভিব্যক্তি, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপীয় জীবনাভিজ্ঞতার রূপায়ণ। এবং শুধু রূপায়ণই নয় সমস্ত কিছু যেন একটি নতুন দৃষ্টিতে দেখা। তাঁর নীল চোখের প্রগাঢ় দৃষ্টিতে কখনো শিশুর সারল্য, কখনো যুবকের দুষ্টুমী, কখনো হাসি, কখনো রাগ বা ক্রোধ, কিংবা ব্যঙ্গ! তবে তাঁর লক্ষ্য বিস্ময়ের আবাহন, লক্ষ্য মানুষের মঙ্গল, লক্ষ্য শিল্পবোধের উত্তরণ। পূর্বনির্ধারিত সত্য : যাজকতন্ত্র, রাজশক্তি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অত্যাচারী মহলের প্রতি কবির তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ, নানাভঙ্গীতে তার প্রকাশ, আবার একই সঙ্গে খুবই সাধারণ কিন্তু পবিত্র সেন্টিমেন্ট-প্রেম, অপাপবিদ্ধ শিশু, প্রাণী, ফুল প্রভৃতির পক্ষে শান্তমধুর বিষাদের গান।

প্রেমের অভিব্যক্তিতেও কবি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। দেহজ আবহ প্রকাশেও যেন কোনো বাড়াবাড়ি নেই। অথচ প্রেমিকের সকল আকুতি এবং আর্তি এতে স্পষ্ট। সমস্ত অস্থিরতার মধ্যেও প্যারিসীয় পদ্ধতিতে এক সুগভীর সুখানভূতির অনুসন্ধান লক্ষ্যযোগ্য এবং অবশেষে তাঁর অভিপ্রায় বিঘোষিত :

আমাদের ভালোবাসা যদি পালিয়ে যেতে চায়
তাকে ধরে রাখতে আমরা যা পারি করবো
প্রেম ছাড়া কী হয়ে যাবে আমাদের জীবন
সংগীতবিহীন এক বিলম্বিত ছন্দে ও নৃত্য
(কিংবা এমন) এক শিশু যে কখনো হাসে না
অথবা এক উপন্যাস যা কেউ পড়ে না
প্রেমহীন সে জীবন শূন্য, বিরক্তির যন্ত্রকৌশল
('সুপ্রভাতের মতো সহজ')

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে প্রেভের এর অন্বিষ্ট সখ্য, বন্ধু : সমস্ত বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে নারী পুরুষের, সত্যিকার একাত্মতা অথচ যাতে একে অন্যের স্বাধীনতার প্রতি থাকবে শ্রদ্ধাবান। একে অতিক্রম করতে গেলেই অসুবিধা। লক্ষ্য করা যেতে পারে 'তোমার জন্য প্রিয়তমা মোর' কবিতাটি। জোর জবরদস্তিতে কিছুই মেলে না, মিললেও টিকে থাকে না। কিন্তু প্রেমের অমরত্ব চিরনবায়নযোগ্য জীবনীশক্তি :

জীবন একটি চেরী ফল
মৃত্যু একটি বিচি বৈকি
প্রেম তো চেরী ফুলেরই গাছ।
('মে মাসের গান')

প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা প্রেভের এর বেশিরভাগ কবিতায় রয়েছে একটা হারানোর বোধ যাকে অধুনা কম ব্যবহৃত একটি শব্দে প্রকাশ করা যায় : মমতা। ছোটদের জন্য লেখা, *চাঁদের অপেরা* বইতে এই মমতা বিষয়ক বোধের প্রকাশ ঘটেছে আশ্চর্যরূপে। গল্পটি গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে। বুদ্ধিশুদ্ধি হবার আগেই সে হারিয়েছে তার বাবা-মাকে। আশেপাশের লোকজনের কাছে আদর মমতা সে বেশি পায়নি। অথচ তারা কেউ লোক খারাপ নয়। ছেলেটি তাই ডুবে থাকতে চায় এক স্বপ্নের জগতে। আবহাওয়ার কারণে আমাদের দেশে আমরা ঠাণ্ডা পছন্দ করি বেশি। ওদের দেশে দরকার গরম পানীয়, গরম ঘরের। অবশ্য সবদেশেই ছেলে বুড়ো সবাই আশা করে উষ্ণ আচরণ। একে অন্যের প্রতি যদি আমরা সহানুভূতিশীল হই তাহলে কত সুন্দর হয় পৃথিবীটা। জাক প্রেভের সে কথাই বলেছেন এক আশ্চর্য ভঙ্গীতে। বারবার বলেছেন, পুনরুক্তি দোষের পরোয়া না করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কবি অধ্যাপক অরুণ মিত্রের মন্তব্য, 'প্রকাশ পদ্ধতিতে প্রেভের এর মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। তিনি আশ্চর্য সাবলীলতার সঙ্গে এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক চিত্রকল্প থেকে আর এক চিত্রকল্পে চলে যান কখনো তাদের তরতর করে বয়ে যেতে দেন, কখনো ভেঙে ফেলেন, উল্টেপাল্টে দেন।

এক অনুষঙ্গকে আর এক অনুষঙ্গে মিশিয়ে দেন। সুররিয়ালিস্ট 'স্বয়ংচল রচনা'র শিক্ষা তাঁর ভাষায় পরিস্ফুট'।[৮]

শিল্প ও শিল্পী

প্রেভের ব্যক্তিত্বের একটা বড় দিক তাঁর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সেরা শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পারস্পরিকভাবে শিল্পসৃষ্টিতে, সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অঁদ্রে ব্রতোঁ, পোল এল্যুয়ার প্রমুখ স্যুররেয়ালিসম প্রবক্তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ব্রতোঁর সঙ্গে বিসম্বাদ ঘটে কিন্তু এল্যুয়ার বিপরীত রাজনীতিতে আবদ্ধ থাকলেও দুজনে দুজনকে কবিতা উৎসর্গ করেছেন। পিকাসো ও মিরোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো অবিচ্ছেদ্য। দুজনের শিল্পসৌকর্য নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন প্রেভের। কালদার ও মাক্স এরনস্ত প্রমুখ আরো অনেকের প্রসঙ্গে লিখেছেন। এসব লেখায় কবিতা ও শিল্পের অন্তর্গত সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত ঘটিয়েছেন। ভান গগ, ব্রাক, শাগাল প্রমুখের ওপর রয়েছে অনবদ্য রচনারাজি। বহু আলোকসঞ্চারী মন্তব্য শিল্পের অন্যান্য শাখার প্রতিভাবানদের নিয়ে লেখা রচনায় রয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে এ শতাব্দীতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা হয় তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে অথবা তিনি তাতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাছাড়া এসময়ে যন্ত্রজগতে ঘটে বহু বিপ্লব। যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে আমূল পরিবর্তিত। সিনেমা জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা তাঁকে তাঁর নিজস্ব নিয়মনীতি আবিষ্কারের সুযোগ দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর ভাই পিয়েরও ছিলেন সফল চিত্রপরিচালক এবং তাঁরা একসঙ্গে বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে শুধু নয়, সমগ্র চিন্তা ভাবনায় প্রেভের চলচ্চিত্রের টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বস্তুত তিনি হলেন অডিও-ভিশুয়েল যুগের প্রথম কবি। একই সঙ্গে ঐতিহ্যগত মৌখিক ধারায় স্নাত ছিলো তাঁর মন মানসিকতা কিছু কবিতা ছাড়াও সংগীতে তিনি এভাবে সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জনপ্রিয়তা কি দোষের?

প্রেভের প্যারিসের কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে চাননি যদিও বহু কবিসাহিত্যিক তাঁর বন্ধু ছিলো। লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল না, তাঁদের নাক উঁচু ভাব, অন্যান্য বিষয়ে উন্নাসিকতা, অসাধুতা তাঁকে প্রতিবাদমুখর করে রাখতো। সুযোগ পেলে তিনি তীব্র ভাষায় এঁদের কষাঘাত করতেন।
বহু কবিতায় তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। বিশেষ করে, শ্লেষ প্রকাশে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। কবিতার বই প্রকাশেও তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল না। এক বন্ধু তা করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বই প্রকাশ করেছেন আরেক বন্ধুর সঙ্গে আধা-আধি ভাগাভাগি করে। তাঁর কবিতার আবৃত্তি, রচিত গানের আসর প্রথম দিকে তাঁর জনপ্রিয়তা

সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু আসলে প্রেভের-প্রতিভার ধর্মই ছিল অন্যরকম অর্থাৎ তিনি ছিলেন একান্তভাবে প্যারিসের আড্ডাবাজ দশ-পাঁচজনের একজন, অন্তত হাবেভাবে তাই। কিন্তু অল্প সময়েই তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্য তাঁকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দেয়। প্যারিসের কিংবা বহির্বিশ্বের কাব্য-সমালোচকবৃন্দ পড়ে যান দ্বিধাদ্বন্দ্বে। তাঁকে উঁচু আসনে বসান যায় কিনা তাই তাঁদের সমস্যা। শেষ অবধি স্বীকার করতেই হয়েছে যে প্রেভের এক অতুলনীয় প্রতিভা এবং তাঁর নিজের মধ্যেই রয়েছে এক দ্বৈততা যা 'বুদ্ধু' শীর্ষক কবিতায় প্রকাশিত :

সে মাথা দুলিয়ে বলে-না
কিন্তু তার অন্তরের উচ্চারণ হলো- হ্যাঁ
যা কিছু ভালোবাসে তারই প্রতি রয়েছে তার- হ্যাঁ
শিক্ষককে বলে সে-না।

কিন্তু এই দ্বৈততার মধ্যেও আমরা পাই তাঁর চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত সংহতি। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর নঞর্থক অভিপ্রায় প্রকাশ পেলেও হৃদয়বৃত্তিতে তিনি সর্বমুহূর্তে সদর্থক।

অনুবাদ প্রসঙ্গ

প্রেভের অনুবাদ প্রসঙ্গে ভাষান্তরের কাজটির ধারা সম্পর্ক দু'চার কথা বলা যেতে পারে। অনুবাদ যতখানি আয়াসসাধ্য পরিশ্রম ততখানি শিল্পসৃষ্টির আনন্দিত শিহরণও বটে। আড়াইশো বছরের বেশি সময়ের সম্পর্কের পরও ইংরেজি-বাংলায় অনুবাদ, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। ফরাশি-বাংলার তর্জমা ক্ষেত্রে শুভ সূত্রপাত ঊনিশ শতকে ঘটে থাকলেও তেমন একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বলা যাবে না। পূর্ণাঙ্গ একটা অভিধানও এ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি। ফরাশি অনেক বিশিষ্টার্থক শব্দ বা বাক্য রয়েছে যা বাংলায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। এটা হয়তো প্রতিটি ভাষান্তরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। যাহোক, আসল কথা হচ্ছে কবিতার অনুবাদ, এমনকি কবিদের লেখা ভাবমূলক প্রবন্ধাদি অনুবাদও খুবই দুরূহ কাজ।

আপাতসহজ ও ক্ষুদ্রাকৃতি প্রেভের-কবিতাগুচ্ছের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য দীর্ঘ কবিতাও অনেক আছে। তবে উপরোক্ত দুটি কারণে তাঁর কবিতার অনুবাদে প্রলুব্ধ হওয়া অনেকের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু এদের ভাষান্তর সত্যি শক্ত ব্যাপার। এর প্রধান কারণ, প্রেভের একই শব্দকে একাধিক অর্থে একই কবিতায় বহুবার ব্যবহার করেছেন। চলতি কথা, পরিচিত ভঙ্গীর অনুরণন ঘুরে ফিরে এসেছে নতুন আবহ সৃষ্টির কাজে। তবে সাধারণভাবে অনুবাদকর্মীর কাছে হয়তো মনে হয়েছে যে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ বলে ধরে নিতে হবে।

বাংলায় প্রেভের-কবিতার খুব কম অনুবাদ হয়নি। আমি নিজে অবশ্য এর ক্ষুদ্রাংশই দেখেছি। শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও কলকাতার সাংবাদিক ড. দিলীপ মালাকার এর তর্জমার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উদ্যোগী অনুবাদক হলেন পুষ্কর

দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর *বিশশতকের ফরাসী কবিতা* গ্রন্থে জাক প্রেভের-এর পরিচিতি সমেত এগারোটি কবিতা উপস্থাপন করেছেন বাংলায়। তাছাড়া একটা ভালো কাজ করেছেন। তাঁর বন্ধুদের নিয়ে তিনি প্রেভের-এর মৃত্যুর পর *জ্যাক প্রেভেরের কবিতা* শিরোনামে একটি দ্বিভাষিক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যাতে পুষ্করের অনুবাদ ছাড়াও অরুণ মিত্র, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, এবং গোলক গুঁইয়ের চৌদ্দটি অনুবাদ রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটির অনুবাদ আমাদের বর্তমান সংকলনেও আছে। উৎসাহী পাঠক এগুলো মিলিয়ে পড়তে পারেন। এমনকি, আমার যেসব পূর্বকৃত অনুবাদ আহসান হাবীব সম্পাদিত দৈনিক বাংলার সাহিত্যের পাতা, সদ্যপ্রয়াত কবি আতাউর রহমান ও এ্যানার *উত্তর নক্ষত্র*, *মীজানুর রহমানের পত্রিকা*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের বার্ষিকী এবং কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাপক পরিবর্তিত রূপ এক্ষণে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এতে অন্যের চেয়ে আমি নিজেই বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করেছি। দীর্ঘকাল পরে হাত দিয়ে দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে খোলনলচে বদলে যাচ্ছে। কয়েকটি কবিতা তিন চার বারেরও বেশি করেছি। শেষ পর্যন্ত কোনটা কী রকম হলো সেটা বলার দায়িত্ব আমার নয়। আপাতত একটিই বিনীত বক্তব্য : যাবতীয় শিথিলতার স্পর্শ এবং যোগবিয়োগের প্রলোভন এড়িয়ে প্রেভেরকে বাংলায় অধিকতর বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলাই হোক সবার উদ্দেশ্য।

উপসংহার

একজন কবিকে কখনো একটি প্রবন্ধে বা একটি বইতে কি পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়? না, যায় না। কবিতা কী? কী ধরনের কবিতা তিনি লিখতেন তাও হয়তো জানা যাবে না। তবে ফরাশি সমালোচনার ধারায় উল্লেখ আছে যে একমাত্র কবিদেরই অধিকার আছে "সব কিছু বলতে পারার"।[৯] কেননা একমাত্র কবিতায় মিলতে পারে সবকিছুর উত্তর। অবশ্য কেউ যদি শুধু কবিতা শোনেন বা পড়েন। কবিতাই কেবল জানে কবিতা কী। জিজ্ঞেস করে নিলেই হলো। জাক প্রেভের-এর ক্ষেত্রে তাই সই। তাঁর কাছেই সবকিছু না হোক, আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর অনেক প্রশ্নের জবাব ছিলো নিহিত। আসুন, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি। দুটি শব্দের ফাঁকে, দুটি পঙক্তির মাঝখানে আরো কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখি। প্রেভের-বিশ্ব একবিংশ শতাব্দীর যাত্রাপথে কিছু পাথেয়স্বরূপ সঞ্চিত রাখুক, এই প্রত্যাশা।[১০]

তথ্যসংকেত:

1. অরুণ মিত্র. *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে*, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী; ১৯৮৫
2. মাহমুদ শাহ কোরেশী অনূদিত *চাঁদের অপেরা* বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
3. শহীদ কাদরী, "উত্তর ভাষণ" *রবিবাসরীয় ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৮ বৈশাখ,

১৩৮৪, পৃ. ৯

4. ঐ

5. Georges Jean, *La poèsie;* Paris, Editions du capeuil, 1966, pp. 11-12.

6. Collage/ কোলাজ-কর্মের বিষয়টি আগে প্রায়ই অপরিজ্ঞাত ছিলো। ১৯৮২ সালের প্রথমদিকে প্যারিসে প্রেভের-এর কোলাজসমূহের এক প্রদর্শনী হয়। কবিকৃত ১৬৬টি কোলাজ এতে স্থান পায়। প্রেভের-পত্নী জানিন অতি যত্নে এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। বেশির ভাগই তিনি সরকারি সংগ্রহশালা *কাবিনে দে* স্তঁপ-এ দান করেছেন। প্রদর্শিত কোলাজ ফরমে প্রেভের এর ওপর ননকনফরমিস্ট এবং স্যুররেয়ালিস্ত ভাবধারা যে কতো গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ বিদ্যমান। তথ্যসূত্র: *নুভেল দ্য ফ্রঁস*, প্যারিস, ফেব্রুয়ারি ১, ১৯৮২

7. শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত *একক*, কলকাতা, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৭, পৃ. ৫০-৫১

8. অরুণ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

9. Georges Jean, *op. cit. p. 193*

10. বক্ষ্যমান আলোচনা ও সংগ্রহে প্রেভের প্রকাশিত বহু বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যে ছোট্ট বইটি সবচে বেশি কাজে এসেছে এবং তরুণ প্রেভের অনুরাগীরা যা সহজে যোগাড় করে নিতে পারেন, তা হলো : *Anthologie Prévert,* Mathuen's Twentieth Century Texts. Edited by Christiane Mortelier (Senior Lecturer in French, Victoria University of Wellington, New Zeland); London, 1981.

আলজেরীয় কবি ও কথাশিল্পী মোহামেদ দিব

এ বছরের দোসরা মে শুক্রবার, প্যারিসে নিজ বাসভবনে, তিরাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন মোহামেদ দিব। আলজেরিয়ার এই অনন্য কবি ও কথাশিল্পী ছিলেন লেওপোল্দ সেদার সঁঘর-এর পর অফরাশিদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে সমাদৃত ফরাশি ভাষার লেখক। ১৯৫২ সালে যখন তাঁর উপন্যাস লা গ্রঁদ মেজৌ (বড় বাড়ি) বেরুলো তখন অঁদ্রে মাল্‌রো তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সমালোচক মোরিস নাদো লিখেছিলেন, 'আফ্রিকার যাবতীয় লেখকদের মধ্যে ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ'। আরাগোঁ বলেছিলেন, 'ইনি এমন এক দেশের মানুষ যাঁর সঙ্গে আমার জানালার পাশের বৃক্ষটির তীর বেয়ে যে নদী বয়ে চলেছে তার, কিংবা আমাদের ক্যাথিড্রালের পাথরগুলোর, কোনো সম্পর্কই নেই (অথচ) তিনি কথা বলেন (ফরাশি কবি) ভিয়োঁ এবং পেগিইর ভাষায়। অত্যন্ত প্রভাবশালী কবি, কথাশিল্পী ও সম্পাদক লুই আরাগোঁ তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখা ছাড়াও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাঁর উপন্যাসের ওপর। 'বড়বাড়ি' তাঁর জন্মভূমি ওলেম্‌চন শহরকে কেন্দ্রে করে লেখা ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। কিন্তু মোহামেদ দিব হলেন সেই ধরনের লেখক, যিনি জাতীয় পরিচিতিকেও বৈশ্বিক ধারণায় পরিণত করতে পারঙ্গম এবং এই ধারণার পরিপোষকরূপে তিনি পেয়েছেন ফরাশি ভাষাকে।

পশ্চিম আলজেরিয়ায় ১৯২০ সালের ২১ জুলাই জন্ম পিতৃহীন শিশু দিবের। অল্প বয়সেই তিনি পেলেন এক উপযুক্ত শিক্ষক রজে বেলিসঁ। সক্রিয় কম্যুনিস্ট বেলিসঁ দিবকে ফরাশি সংস্কৃতিতে দীক্ষা দান করেন। ১৯৩৮-১৯৪০ দু'বছর তিনি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর ছিলেন 'প্রজাতন্ত্রী আলজেরিয়া' পত্রিকায় হিসাবরক্ষক, অনুবাদক ও সাংবাদিকের দায়িত্বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ শেষে ভর্তি হলেন আলজের বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে। প্যারিসের প্রখ্যাত প্রকাশনালয় ল সই থেকে তাঁর 'বড় বাড়ি' বেরুবার পর তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় এই ত্রয়ী উপন্যাসর পরবর্তী দুখণ্ড, ল্যাসঁদি (অগ্নিকাণ্ড) ও ল্য মেতিয়ে আ তিসে (বুননশিল্প)'। এই

উপন্যাসগুলোতে তিনি বিগত শতাব্দীর বিশের দশকের শেষের দিক থেকে গ্রামীণ আলজেরিয়ার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। এতে বিদ্রোহ ও আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে খুবই সংযতভাবে। ফরাশি ভাষায় লেখার ব্যাপারে তাঁর কিছু নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে। দু'বছর আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'এর মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম... এটা ছিল এক দীর্ঘ পদযাত্রা। নতুন পরিবেশের ধাক্কা সামলানো মুশকিলের ব্যাপার বইকি! 'একটি ভাষায় অভিযাত্রা পুরোপুরি আত্ম-অনুসন্ধান। এই দিগন্তের দিকে আমার যাত্রা অব্যাহত ছিল সর্বদা। এক-একটি বই যেন নতুন ভুবনে এক-একটি নতুন পদক্ষেপ।' আরেকটি সাক্ষাৎকারে ল্য মোঁদ-এর এক সাংবাদিককে তিনি অবশ্য বলেছিলেন, আমার মানস প্রতিচ্ছবি গড়ে ওঠে কথ্য আরবীকে কেন্দ্রে করে, সেটা আমার মাতৃভাষা। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের অবিমিশ্র ধারাবাহিকতা। ফরাশিকে বাইরের ভাষা মনে হতে পারে। কিন্তু এই ভাষাতেই তো আমি পড়তে শিখেছি। এবং এর ভেতর থেকেই আমি আমার লেখার ভাষা সৃষ্টি করেছি... আমি যেন কায়দা করে একটু দূরত্বও বজায় রেখেছি যাতে নিস্পৃহ অনুসন্ধানের সুযোগ করে নিতে পারি। ১৯৫১ সালে তিনি এক ফরাশি মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য থাকেন। ১৯৫৯ সালে ঘটলো বড় ঘটনা। মোহামেদ দিবকে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার আলজেরিয়া থেকে বহিষ্কার করে। অঁদ্রে মাল্‌রো, আলবের কাম্যু প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় ফরাশি বুদ্ধিজীবী তাঁকে ফ্রান্সে বসবাসের সুযোগ দেবার পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন। কষ্টকর জীবনকে তিনি লেখকের জন্য অনিবার্যরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রচুর লিখতে শুরু করেন : উপন্যাস ছোটগল্প, নাটক, শিশু সাহিত্য এবং বিশেষ করে-কবিতা।

১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় মোহামেদ দিবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, ওঁব্‌র গার্দিয়েন (রক্ষাকারী ছায়া)। 'মূলত আমি একজন কবি এবং কবিতা থেকেই আমি এসেছি উপন্যাসে, উল্‌টো পথে নয়', তাঁর বক্তব্য। বস্তুত তিনি সবসময় কবিই রয়ে গেছেন। যদিও বেশি লিখেছেন উপন্যাস। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্রই কবি প্রথম চারটি উপন্যাসে গানের আসর সুচিহ্নিত। পরবর্তীগুলোর কাহিনি নির্মাণেও কাব্যিক পরিবেশ, স্বপ্ন ও কল্পনার দিগন্ত সুবিস্তৃত। অল্পবয়সে ভার্জিনিয়া উলফের দুটি উপন্যাস-পাঠ তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত কল্পনার তাৎপর্য নির্মাণে তিনি দার্শনিক গাস্তোঁ বাশলার কর্তৃক উদ্বুদ্ধও হয়ে থাকবেন। একদিকে দেশমাতৃকা আলজেরিয়া সদা অন্তরে জাগরুক, অন্যদিকে অভ্যন্তরে নির্বাসনের বাস্তবতা তাঁকে করে উন্মনা : 'যে আমি কথা বলছি, আলজেরিয়ায় হয়তো বা আমি নেই, তুমি অতিসাধারণ মেয়েদের কেউ একজন কিন্তু কণ্ঠস্বর আমার থামবে না কখনো, জোর গলায় আহ্বান করতে মাঠ ও পাহাড় থেকে আমি নাবছি, ওরেশ থেকে, দরোজা তোমার খোলো সদয় গৃহবধূরা, আমাকে একটু ঠাণ্ডা পানি দাও, দাও একটু মধু আর সির্জের রুটি। তোমাকে দেখতে এসেছি আমি। তোমার সুখ কামনা করে তোমার ছোট্ট নবজাতকরা যেন বড় হয়ে ওঠে। শস্যক্ষেত্রে বেড়ে উঠুক গম রুটিও তৈরি হতে থাকুক। কিছুই যেন ভ্রান্তিতে না ফেলে-সুখে থাক

তুমি।

নক্ষত্র বিহারী, সমুদ্র অভিসারী কবি রজনী গভীরে শোনেন 'অন্ধ শিশুর ক্রন্দন'। 'একেবারে ভরদুপুরে সহসা মনে হলো যেন রাত হয়ে এলো। স্বপ্ন দেখি, একটি ছায়া আমাকে আলিঙ্গন করছে এবং জীবন আমার হালকা হয়ে আসছে তারপর অকস্মাৎ জেগে উঠলাম। কিন্তু চারপাশে আমার কেবল কথার ফানুস। মনোহারী পাখা নিয়ে একটি প্রজাপতি আস্তে আস্তে সে বৃত্ত তৈরি করে শাদা-হলুদ নার্সিসাস ফুলের ওপরে এবং আলো বড় করে তোলে নিস্তব্ধতাকে।'

মগ্ন চৈতন্যের গভীরে ডুব দেয়া নিয়ে স্বদেশি সহযাত্রী কাতেব ইয়াসিনের সাথে তুলনা করা হয় দিবকে। আলো-আঁধারের রহস্যে নিমজ্জমান এই দুই কবি আরবী ঐতিহ্যসিদ্ধ কবিতার অনুসরণে প্রবাদ, চরণ ও স্বচ্ছতার মধ্যে বস্তু ও সত্তাকে চিহ্নিতকরণ তাঁদের কবিতার বৈশিষ্ট্য। অনেকগুলো সংকলনে অন্তরঙ্গ আবেদনে তাঁদের এই প্রকাশভঙ্গি স্বতঃস্ফূর্ত। তবে কাতেব-এর মতো তিনি উচ্চকণ্ঠ নন। কিন্তু তাতে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার গভীরতা, পরাধীনতার অবমাননা ও দুঃখ-দুর্দশা বিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্যযোগ্য।

তুর্কী কবি নাজিম হিকমেত বলতেন, নির্বাসন বড় কঠিন অবস্থান। মোহামেদ দিব তাঁকে অভ্যন্তরীণ করে ফেলেছেন গভীরভাবে, বোদলের-এর 'আলবাত্রোস'-এর মতো অনেকটা। আলোকিত আনন্দময় নগরী প্যারিসে তাঁর অভিজ্ঞতা: 'প্যারিসের মোলায়েম সন্ধ্যা তবে আমার কাছে একটু অসহনীয় নির্বাসিতের জন্য অন্ধকার প্যারিস এক নরক যেন নদীর ওপর উদাত্ত আর গোলাপী আকাশ যখন বিশ্রাম নেয়, কেঁপে ওঠে তার রক্তাক্ত, কান্নাভরা হৃদয়। এমন কে বিদেশি এখানে আছে যে, তাকে ভাবে না তার আপন আলয়? কিন্তু রাত পড়ে এলে আপনাকে এমনই মনে হয় এত বড় শহরে কোথাও নেই তার অবস্থান, মনে হয়, এভাবেই শুরু হয় দুঃখের স্বপন।'

মোহামেদ দিবকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে আরো গভীরভাবে অন্তর্মুখী দেখা যায়। তবে মানব সত্তার নানাবিধ রহস্য আবিষ্কারে তিনি যেন অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ফরাশি একাডেমীর গ্র্যান্ড প্রাইজ এবং ১৯৯৮ সালে মালার্মে পুরস্কারে ভূষিত হন। দিব শিশুতোষ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। ১৯৭৬-৭৭ সালে তিনি কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোস এঞ্জেলস শাখায় 'রিজেন্ট প্রফেসর' পদে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর মার্কিনী অভিজ্ঞতা *এল এ ট্রিপ* (২০০৩) গ্রন্থে বিধৃত। ১৯৮৩ থেকে ৮৬ অবধি তিনি প্যারিসের সর্বনে অধ্যাপনা করেন। মোহামেদ দিব-এর আরেকটি বড় সাহিত্যকীর্তি ফিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে রচিত ত্রয়ী উপন্যাস। ভ্রমণপ্রিয় দিব বহির্বিশ্বকে এক গভীর আত্মীয়তায় আবদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। নির্বাসিত হয়েও তিনি মুক্ত মানুষের মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ, সিমর্গ তাঁকে আবার শৈশব রোমন্থনে উদ্বুদ্ধ করে ফিরিয়ে নিয়ে যায় স্বদেশভূমি আলজেরিয়ায়।

এওজেন গিল্‌ভিক

১৯৭৭ সালে প্যারিসের পোঁপিদু যাদুঘরে এক কবিতা পাঠের আসরে এওজেন গিলভিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে চট্টগ্রাম আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ থেকে প্রকাশিত *সমান্তরাল/ Parallèle* বইটি উপহার দিই। পরে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানান এবং আমাদের অনুবাদ কর্মের প্রশংসা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভূমিকায় উল্লেখিত একটি ভুলও ধরিয়ে দেন। ভুলটি হলো: আমি লিখেছিলাম ১৯৭৬ সালে তিনি মালার্মে আকাদেমির গ্রঁ প্রি পেয়েছেন। আসলে তিনি ঐ বড় পুরস্কারটি (২৫,০০০ ফ্রঁ) পেয়েছিলেন ফরাশি আকাদেমি থেকে এবং মালার্মে আকাদেমির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি।

গিল্‌ভিকের জন্ম কারনাকে, ১৯০৭ সালের ৫ আগস্ট। অল্প বয়স থেকে তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে প্রথমে ব্রতাইঁন, পরে আলজাসে। সামরিক কর্মকর্তার সন্তানরূপে তিনি নিসর্গধন্য আবাসস্থলে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার চাপে বিশুদ্ধ ফরাশি আয়ত্বে আনায় কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন তিনি। অবশ্য ৮/৯ বছর বয়স থেকে প্রথমত লা ফোঁতেন-এর অনুকরণে তিনি ছড়া লিখতে শুরু করেন। পরে সমকালীন বহু কবির সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য জন্মে। এক পর্যায়ে এল্যুয়ার এবং পিকাসোর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর কবিতা পরিমিত শব্দ ব্যবহারে ঔদার্য ও সৌভ্রাতৃত্বের স্মারক। গিল্‌ভিকের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম: *Terraque, Carnac, Sphere, Euclidiennes* ইত্যাদি। গিলভিক বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তিনি ইউনেস্কোর ফ্রেঞ্চ কমিশনের নির্বাচিত সদস্যও ছিলেন।

যাপিত জীবনে তিনি প্রশাসনে কর্মরত থাকেন। আইন ও অর্থনীতির বিষয়ই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে।

তাঁর একটি কবিতা

কাঠমিস্ত্রির কাজ

কাঠের কিছু অংশ কাটতে
আমি দেখেছি কাঠমিস্ত্রিকে
বেশ ক'টা তক্তা
মিলিয়ে দেখতেও দেখেছি তাকে
সবচে সুন্দর অংশটিকে
জড়িয়ে ধরতে দেখেছি তাকে
তার যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে
ঠিকঠিক অবস্থায় নিয়ে আসতে
আমি দেখেছি কাঠমিস্ত্রিকে।
তুমি তো গান ধরেছিলে, মিস্ত্রি
আলমারি বানাতে গিয়ে
তোমার সেই ছবি আর
কাঠের গন্ধ আমার কাছে একাকার
আমিও তো শব্দ দিয়ে একটা কিছু বানাই
আর সেটাও প্রায় একই রকম।

ফ্রান্সে ইসলাম চর্চা

ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক বহুদিক থেকে ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যমণি। ক্যাথলিক মতবাদ ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে কট্টর প্রাধান্য বিস্তার করলেও কেবল ফ্রান্সেই দেখা যায় তার সুষম রূপ। বর্তমানে ফ্রান্সে প্রোটেস্টান্ট, গ্রীক অর্থডক্স, ইহুদীবাদসহ বহু ধর্মীয় মতবাদের সমাবেশ থাকলেও ক্যাথলিকদের পর সংখ্যাধিক্য রয়েছে ইসলামপন্থিদের। এর সঙ্গে নাপোলেওঁর কায়রো অভিযানের একটা দূরান্বয়ী সম্পর্ক হয়তো রয়েছে তবে দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহ হতে সৈনিক ও শ্রমিক আমদানিই এই সংখ্যাধিক্যের মূল কারণ। বর্তমানে মুসলমানরা দ্বিতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়রূপে গড়ে তুলছে বহু মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষালয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ফ্রান্সে মুসলমানদের প্রভূত সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে। সম্ভবত লন্ডনে ক্যান্ত্রিজে সে প্রভাব কিছু বেশি। তবে দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সে চলে আসছে ইসলাম চর্চা। ইসলাম তত্ত্ব '(ইসলামোলজি)', মুসলিম রাষ্ট্র, জনগোষ্ঠি ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যয়ন ('এত্যুদ্ ইসলামিক্/ মুজুলমান্') উনবিংশ শতাব্দী থেকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সরবন ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে।

বেশ ক'জন নামী ফরাশি ব্যক্তিত্ব ইতোমধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবী রজে গারোদি-র কথা প্রথমেই উল্লেখ্য। অতঃপর প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক ও বর্তমানে ইসলাম-তত্ত্ববিদ অধ্যাপক মিশেল শোদকিভিচ, ইকবাল অনুবাদ ও ইসলাম ব্যাখ্যায় সুনামের অধিকারী অধ্যাপিকা এভা দ্য ভিত্রে-মেয়েরোভিচ-এর নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

বিষয়টি নিয়ে বর্তমান মুহূর্তে গভীর গবেষণার অবকাশ না থাকলেও ইসলাম সম্পর্কিত কিছু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে অল্পবিস্তর তথ্য পরিবেশিত হলো। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আগ্রহী উপযুক্ত ফরাশিনবীশ গবেষণাকর্মী আমাদের অধিকতর তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ উপহার দেবেন।

সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সেরা ফরাশি ইসলাম তত্ত্ববিদ হলেন লুই মাসিইঁনো। তিনি

পঞ্চাশের দশকে অল পাকিস্তান হিস্টরি কন্‌ফারেন্স'-এ যোগদানের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন বলে আমাদের ধারণা। মুসলিম মরমীবাদ সম্পর্কে তিনি বিশ্বনন্দিত বিশেষজ্ঞ। তাঁর যে গ্রন্থের উল্লেখ সর্বত্র তার বাংলা শিরোনাম হবে 'মুসলিম মরমীবাদের বিশেষায়িত শব্দ ভাণ্ডারের উৎস সম্পর্কে প্রবন্ধ'। গ্রন্থটি প্রথম ছাপাখানায় যায় ১৯১৪ সালে। জর্মন সৈন্যরা প্রেসে আগুন ধরিয়ে দিলে পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পুড়ে যায়। সাত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখক তা পুনর্লিখনে সফল হন। ১৯২২ সালে এটি প্রকাশিত হলে গ্রন্থকারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কায়রোর পণ্ডিতেরাও তাঁকে 'শেখ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরিমার্জিত পরিবর্ধিত গ্রন্থটি ১৯৫৪ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়। রয়াল সাইজে ৪৫৬ পৃষ্ঠার বই, অতিরিক্ত ৭টি পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি। মনসুর হাল্লাজের মতবাদের উৎস ও সাংকেতিক শব্দাবলীর বৈশিষ্ট্য, কুরআন, গ্রীক, হিব্রু-খ্রিস্টান, হিন্দু ও বহুত্ববাদের অন্তঃসম্পর্ক গ্রন্থটির প্রথম দুই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামে মরমীবাদের স্থান নিয়ে গভীর তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে মরমীবাদের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে ছ'টি উপ-অধ্যায়ে রয়েছে বিস্তৃত আলোচনা : ১ কুরআনের সূত্র ২. প্রথম দুই শতাব্দীর মরমীবৃন্দ ৩. হাসান বসরী ৪. ইমাম জাফর-এর নামে প্রচলিত তফসির ৫. বসরা 'স্কুলের' শেষ মরমীবৃন্দ ৬. বাগদাদ 'স্কুলের' প্রতিষ্ঠা। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর 'স্কুল' সমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ : ১. মোহাসিবি কর্তৃক প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ : ২. ইবনে জারামের খোরাসানীয় 'স্কুল' ৩. দুই প্রান্তিক : বিস্তামী ও তিরমিজি ; ৪. সাহ্‌ল তোস্তারির সালিমিয়া স্কুল ; ৫. খারবাজ ও জোনায়েদ ; ৬. হাল্লাজীয় সংশ্লেষণ ও পরবর্তী ব্যাখ্যা। সংযোজন ও নির্ঘণ্টসহ রয়েছে মনসুর হাল্লাজের মূল রচনা।

লুই মাসিইঁনো একবার বলেছিলেন : "ইসলাম এবং ফ্রান্স পরস্পর পরস্পরের প্রতি (সখ্যতায়) অঙ্গীকারাবদ্ধ।" তাই তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য অনেকেই বহু বিখ্যাত গবেষণা কর্ম রেখে গেছেন। প্রথমে লুই গার্দে-র দুটি গ্রন্থের কথা বলি ; একটি হলো : 'ইবনে সিনার ধর্মচিন্তা (১৯৫১), অন্যটি (এমএম আনাওয়াতি-র সঙ্গে) 'মুসলিম ধর্মতত্ত্বের ভূমিকা' (১৯৪৮), দুটি বই-ই পণ্ডিত মহলে উচ্চ প্রশংসিত।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে মিল অথচ দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে ভিন্নতর বই হলো অঁরি করব্যাঁ-র : 'ইসলামিক দর্শনের ইতিহাস, ১ শুরু থেকে ইবনে রুশদের ইন্তেকাল (১১৯৮) অবধি'। সৈয়দ হোসায়েন নাসর ও ওসমান ইয়াহিয়া-র সহযোগে গ্রন্থটি রচিত। প্যারিসের বিখ্যাত প্রকাশক গালিমার ১৯৬৪ সালে সরাসরি পকেট বুক সংস্করণে (কলেকসিয়োঁ ইদে, ৩৮৪ পৃ) এটি বেরোয়। আটটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিচ্ছি। প্রথমত দর্শনচিন্তার উৎস : কোরআন ও অনুবাদের ওপর ২টি উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সুন্নী কালাম। ৩টি উপ-অধ্যায়ে রয়েছে ১. মুতাজিলা ২. আবুল হাসান আল-আশ্'আরি ৩. আশ্'আরি মতবাদ প্রসঙ্গ। চতুর্থ অধ্যায়ে দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আল-আমিরি, ইবনে সিনা, ইবনে মুসকুইয়ে,

ইবনে ফাতিক ইবনে-হিন্দ, আবুল বারাজাত আল বাগদাদী, ইবনে হামিদ গাজ্জালীর দর্শন সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা ও সমালোচনার ওপর। ষষ্ঠ অধ্যায় শুধুমাত্র সুফী মতবাদের ওপর। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের পর আবু ইয়াজিদ বোস্তামী, জোনায়েদ, হাকিম তিরমিজি, হাল্লাজ ও আহমদ গাজ্জালী (এবং "পবিত্র প্রেম") সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ আলোচনা। সপ্তম অধ্যায় আমরা পাই সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং 'আলোকের দর্শন" বিষয়ে বক্তব্য। অষ্টম অধ্যায়ে নিবেদিত হয়েছে আন্দালুসিয়ার দার্শনিকদের নিয়ে। ইবনে মাসারা, ইবনে হাজম, ইবনে বাজ্জা, ইবনে আল-সিদ, ইবনে তোফায়েল এবং ইবনে রুশদ প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ক্রান্তিকালের বিশ্লেষণ আছে এবং ইসলামিক দর্শন যে দর্শনের সাধারণ ইতিহাস থেকে বাদ ছিলো সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতিমূলক একটি গ্রন্থও আমাদের বিবেচনায় আসতে পারে। গ্রন্থটি একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত এবং ইউনিভার্সিটি প্রেসেস অব ফ্রান্স কর্তৃক একটি বিশেষ সিরিজে ("কসেজ" =আমি কী জানি?) প্রকাশিত। গ্রন্থকার দামিনিক সুরদেল একজন ডি. লিট্ এবং দামেশকস্থ ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটের ফেলো। মধ্যপ্রাচ্যের ধূসর অতীত নিয়ে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে, যথা 'আব্বাসী উজিরাদ : ৭৪৯ থেকে ৯৩৬ (দামেশক, ১৯৫৯-৬০)'। যাহোক, তাঁর 'ইসলাম' বইটি ক্ষুদ্রকায় (১২৮ পৃ.) হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে 'মুহাম্মদ (সা.)-এর কুরআন ও দ্বিতীয় 'ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস' বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় ইসলামিক আইন প্রসঙ্গে। চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে উপদলগত আন্দোলন তথা কোন্দল : ১ খারিজি মতবাদ ২. শিশয়া মতবাদ। পঞ্চম অধ্যায়ে সুফীবাদ এবং দর্শন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়টি বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে। এতে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বিবিধ শিল্প প্রসঙ্গে মনোজ্ঞ উপস্থাপনা রয়েছে। সপ্তম অধ্যায়টির শিরোনাম "আধুনিক ইসলাম"। তিনটি উপ-অধ্যায়ে : ১. আধুনিক কালে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস: ২. মুসলিম বিশ্বের যথার্থ অবস্থান ৩. ইসলামের বাস্তব অবস্থা। গ্রন্থকার ১৯৫৯ সাল অবধি (গ্রন্থটির প্রকাশকাল) ইসলাম অনুসারীদের (সে সময়ে ৩৬৫ মিলিয়ন, সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশি) অগ্রগতি বিশ্ববাপী কী কী সূত্রে সৃজিত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া ড. সুরদেল লক্ষ্য করেছেন যে, বহু বিভক্তি সত্ত্বেও মুসলমানরা তাঁদের প্রাথমিক উৎস কুরআনে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন যা তাঁদের শক্তির মূল কারণ এবং সেখানেই তাঁরা আধুনিকতার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পান।

এখানে একজন বিখ্যাত আরবী বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি, শার্ল পেলা, সরবনের অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজের পরিচালক এবং বর্তমান প্রবন্ধকারের গবেষণা কর্মের (১৯৫৯-৬৫) অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অল-পাকিস্তান হিস্টরি কনফারেন্স উপলক্ষে পেলা পঞ্চাশের দশকে দুবার ঢাকা ও রাজশাহী এসেছেন। তিনি ছিলেন হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত *এনসাইক্লোপেডিয়া অব*

ইসলামের অন্যতম সম্পাদক। কয়েক বছর আগে পরলোকগত পেলার দুটি গ্রন্থ খুবই বিখ্যাত : 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৫২) এবং 'বসরীয় মিলিউ (পরিবেশ) এবং গাহিজের প্রস্তুতি পর্ব' (১৯৫৩)।

সবশেষে যে গ্রন্থটির পরিচয় দেবার প্রয়াস পাবো, তা হলো এমিল দেরমঁগেম রচিত 'মুহাম্মদ (দ.) ও ইসলামী ঐতিহ্য'। এটি একটি বহু চিত্র ও উপাদান সমৃদ্ধ সুশোভন গ্রন্থ। এমিল এর আগে 'মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী' প্রকাশ করেছিলেন (১৯২৯, ১৯৫০), তাছাড়া লিখেছেন 'মুসলিম সন্তদের জীবনী' (১৯৪২), 'সবচেয়ে সুন্দর আরবী রচনা' (১৯৫১) এবং মাগরেবী ইসলামে সন্ত ঘরানা' (১৯৫৪)। বর্তমান গ্রন্থে অধ্যায় বিভাজন ভিন্ন ধরনের। তিনভাগে বিভক্ত বইটির প্রথম ভাগ মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর : উৎস, ষষ্ঠ শতাব্দীতে মক্কা ও আরবদেশ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা, মুহাম্মদ (সা.) এর যৌবন, নবীর মিশন, নিপীড়ন, কুরআন, শোকের বছর, হিজরত, ধর্মযুদ্ধ, হরেম, মক্কা দখল বিজয় এবং ইন্তেকাল।

দ্বিতীয় ভাগে 'ইসলামিক ঐতিহ্য' যার অনুষঙ্গ হলো গৃহযুদ্ধ ও রাজ্যাধিকার, মঞ্চ কাঠামো, আচরণ বিধি তরিকাসমূহ, স্কুল, ভাবনা চিন্তা, রনেসঁস-মানবতাবাদ ও "উন্মুক্ত" ধর্ম।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে বিভিন্ন পাঠ্য গ্রন্থ ও অন্যান্য মূল্যবান রচনাংশ কুরআন, হাদীস, আইন, আধ্যাত্মিক জীবন, প্রবচন, উপদেশাত্মক গল্প কবিতা।

এছাড়া রয়েছে কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী, চিত্রপঞ্জী।

রসূলে খোদা (সা.) কে কেন্দ্রে রেখে লেখা এই গ্রন্থের সাথে আরো বহু বইয়ের কথা বলা যেত। এখানে শুধু একটির নাম উল্লেখ করতে চাই। বইটি হলো রেজি ব্লাশের রচিত 'মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ক জটিলতা' (১৯৫৩)।

প্রবন্ধে উল্লেখিত ফরাশি শব্দ ও নাম

ISLAMOLOGIE
ETUDES ISLAMIQUE/MUSULMANE
SORBONNE (LA): UNIVERSITE DE PARIS
ROGER GARAUDI
MICHEL CHODKIWICZ
EVA DE VITRAY-MAYEROVITCH

LOUIS MASSIGNON:
ESSAI SUR LES ORIGINES DE LEXIQUE TECHNIQUE DE LA MYSTIQUE MUSULMANE.

LOUIS GARDET:
LA PENSEE RELIGIEUSE D'AVICENNE;

LOUIS GARDET & M.M. ANAWATI:
INTRODUCTION A LA THEOLOGIE MUSULMANE

HENRI CORBIN:
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ISLAMIQUE : DES ORIGINES JUSQU' A LA MORT D' AVERROES (1198)

GALLIMARD : COLLECTION IDEES PRESSES, UNIVERSITAIRES DE FRANCE: QUE SAIS JE?
DOMINIQUE SOURDEL, ANCIEN PENSIONNAIRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE DAMAS, DOCTEUR ES LETTRES:

L'ISLAM:
LE VIZIRAT ABBASIDE DE 749 A 936.

CHARLES PELLAT:
LANGUE ET LITTERATURE ARABES ; LE MILIEU BASRIEN ET LA FORMATION DE GAHIZ

EMILE DERMENGHEM
MAHOMET ET LA TRADITION ISLAMIQUE

REGIS BLACHERE:
LE PROBLEME DE MAHOMET.

ইন্ডোলজির শেষ সেরা পুরোহিত: লুই রনু

মাদ্রিদ শহরে মধ্যহ্নভোজনের পর ফরাশি দৈনিক ল্য মোঁদ-এর একটি সাম্প্রতিক সংখ্যা (২১-২২ আগস্ট, ১৯৬৬) নিয়ে বসেছি কফি শপে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ১৩ পৃষ্ঠায় এসে চোখ ছানাবড়া। হায়রে, আমার গবেষণা-পরিচালক অধ্যাপক লুই রনুর মৃত্যুতে শোক সংবাদ! যতদুর মনে পড়ে, তাঁর স্ত্রী মাদাম রনুর একটি বই ছিল ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে। কন্যা কৃষ্ণা এবং দুই পুত্র থিয়েরি ও লরঁ। প্রকাশ্যে লুই রনুর তিনটি পরিচয় : ইনস্টিটিউটের সদস্য (এই ইনস্টিটিউট হচ্ছে ফরাশি আকাদেমির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান; ১৯৫৮ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন), সর্বনের অধ্যাপক এবং ইনিস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনের পরিচালক।

আসলে দীর্ঘদিন সমগ্র বিশ্বে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে খ্যাত লুই রনুর জন্ম প্যারিসে, ২ অক্টোবর ১৮৯৬ সালে। 'আগ্রেজে দ্য গ্রামের' পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং অতি উচ্চ সম্মানের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৫-১৯২৮ সালে তিনি লেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। এসময়ে সিলভ্যাঁ লেভি এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠ গ্রহণের জন্য সর্বনে আসতেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৯২৬-২৮ সালে একই বিষয়ে অধ্যয়নরত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

১৯৫৯ সালের নভেম্বরে লুই রনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে আমি তাঁকে জানাই যে আমি ড. শহীদুল্লাহ্‌র ছাত্র এবং প্যারিসে আসার আগে, মাত্র কয়েকদিন পূর্বে করাচীতে স্যারের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। রনু আমাকে শহীদুল্লাহ্ সাহেব কেমন আছেন এবং কী করছেন জানতে চান। ভালো আছেন, এবং ইদানীং উর্দু ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন বলে তাঁকে জানাই। রনু খুবই খুশি হন এবং আমাকে ডক্টরেটের ছাত্ররূপে গ্রহণ করতে প্রাথমিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তবে আমার প্রস্তাবিত কয়েকটি বিষয়ে তিনি ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের এখানে তোমাদের ভূখণ্ড থেকে যারা এসেছেন তাঁরা হিন্দুদের বিষয়ে কাজ

করেছেন। বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের ওপর থিসিস লিখেছেন। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। অতএব, তুমি সে ধরনের একটা বিষয়ের কথা ভেবে দেখ।' শেষ অবধি আমার প্রস্তাবিত : *ETUDE SUR L'EVOLUTION INTELLECTUELLE CHEZ LES MUSULMANS DU BENGALE, 1857-1947* (একই শিরোনামে ফরাশি গবেষণা গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে (PARIS & THE HAGUE, MOUTON) প্রকাশিত হলেও তার ইংরেজি অনুবাদ বেরুলো সম্প্রতি ভিন্ন শিরনামে : *CRESCENT AND LOTUS : A STUDY ON THE INTELLECTUAL HISTORY OF THE MUSLIMS OF BENGAL, UPTO 1947*; DHAKA, 2016, ANDRE MALRAUX INSTITUTE OF CULTURE & AHMED PUBLISHING HOUSE) লুই রনুর তত্ত্বাবধানে জুন ১৫, ১৯৬৫ সালে আমি অতি উচ্চ সম্মানের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করি। উল্লেখ্য যে, তাঁর পরামর্শে আমি প্রফেসর শার্ল পেল্লাকে সহ-তত্ত্বাবধায়ক হতে রাজী করাই। পেল্লা আরবী ও ইসলাম তত্ত্ববিদ *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের* অন্যতম সম্পাদক; ইতিহাস সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা ও রাজশাহী এসেছিলেন। দু'বছর পর পেল্লা সর্বনের নিয়মমাফিক আমার মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা নিয়েছিলেন।

লুই রনু ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। পরিবারের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে কাছে ছিলেন না। অল্প বয়সে মাকে হারান তিনি। ১৯১৭ সালে যুদ্ধবন্দী ছিলেন রনু। পরে প্রখ্যাত পণ্ডিত এমিল বেনভেনিস্তের প্রভাবে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নে এগিয়ে আসেন। ১৯২৯ সনে সর্বন সংলগ্ন একোল দে ওৎ এত্যুদ এবং ১৯৩৬ সাল থেকে সরাসরি সর্বনে অধ্যাপনার পদ লাভ করেন।

গভীর মনোযোগী পাঠক ও গবেষক লুই রনুর গ্রন্থসংখ্যা ৪০-এর বেশি। ১৫টির ওপর আছে বেশ মোটাসোটা বেদ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক ব্যাখ্যা ও অনুবাদ। বহুলভাবে প্রশংসিত ও অধীত এই গ্রন্থসমূহ যথার্থই তুলনারহিত।

কৈশোরের বন্ধু দানীয়েল লেভি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূতরূপে জাপানে কর্মরত থাকাকালীন লুই রনুকে টোকিওর Maison Franco- Japonaise এর ডিরেক্টররূপে পান এবং তাঁকে দিয়ে বহু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করান। তাছাড়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু অধ্যাপক রনুর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করাতে তিনি সে ব্যবস্থা করেন। পরে নেহেরু তাঁকে রনু সম্পর্কে খুব প্রশংসাসূচক অভিমত প্রকাশ করেন। বস্তুত, লুই রনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করে। (LOUIS RENOU IN MEMORIAM PARIS, 1967, pp. 35-36)

ব্যক্তিগতভাবে ছয় বছর ধরে আমি তাঁর অধীনে গবেষণারত ছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য যে সরাসরি সংস্কৃত অধ্যয়নে যুক্ত ছিলাম না। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর দেশে ফিরে বেঙ্গলি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের প্রধান পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। একথা-সেকথার পর তিনি আমাকে বলেন, আপনি প্যারিসে গিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করুন। তখন আমি সেখানে বাংলা ও উপমহাদেশের

ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করি। কর্মকাণ্ড তিনদিনে শেষ। অতএব, আমি অধ্যাপকের কাছে শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনে যাই। কিন্তু জানতে পারি সে বছর থেকে রনু ঐ প্রাথমিক কোর্সটি পড়াবেন না। কি দুর্ভাগ্য! আগে-ভাগে সংগ্রহ করা তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের কপিটি আমার কাছে এখনও রয়েছে। তাছাড়া আছে ভারতীয় সাহিত্য ও হিন্দু ধর্মের ওপর দুটি ছোট্ট কিন্তু অসাধারণ বই। একটি পুস্তিকা রয়েছে মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা : ফরাশি সাহিত্যের ওপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব। এছাড়া আছে রনু ও ফিলিওজা কর্তৃক যৌথভাবে সম্পাদিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্লাসিক ইন্ডিয়া' ১ম খণ্ড।

সর্বনের সুবিশাল হল ঘরে রবীন্দ্র স্মরণসভায় কথা মনে পড়ে। তিনি সভাপতি। হুমায়ুন কবির প্রধান বক্তা। এক পর্যায়ে বন্ধু দীপ্তেন্দু বসুর পরিচালনায় আমরা ক'জন এবং রাজেশ্বরী দত্ত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করলাম (আলোকচিত্র ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী সংবর্ধনা গ্রন্থ ২০০১)। তার অল্প কদিন আগে তিনি পৌরহিত্য করেন সর্বনে তাঁর ইনস্টিটিউটে বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতা সভায়।

অর্ধশতাব্দী পূর্বের স্মৃতি স্মরণ করে আমি এই মহামানবের প্রতি আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

SOME WORKS OF PROFESSOR LOUIS RENOU:

LA VALEUR DU PARFAIT DANS LES HYMNES VEDIQUES;
RAGHUVAMSA;
LA GEOGRAPHIE DE PTOLEMEE;
LES MAITRES DE LA PHILOLOGIE VEDIQUE; 1928
HYMNES ET PRIERES DU VEDA; 1938
LA POESIE RELIGIEUSE DE L'INDE ANTIQUE; 1942
LA CIVILISATION DE L'INDE ANCIENNE; 1950
SANSKRIT ET CULTURE; 1950
PROLEGOMENES AU VEDANTA, 1951
HYMNES SPECULATIFS; UNESCO, 1960
TERMINOLOGIE GRAMMATICALE DU SANSKRIT
RELIGIONS OF ANCIENT INDIA; LONDON, SOAS; 1953
ETUDES VEDIQUES ET PANINEENNES; 15 volumes
INDES CLASSIQUES (EDITED WITH JEAN FILLIOZAT)- 2 vols.
THE INFLUENCE OF INDIAN THOUGHT ON FRENCH LITERATURE; MADRAS, 1948
LES LITTERATURE DE L'INDE; 1951
L'HINDOUISME; 1961

LE MONDE — 21-22 août 1966 — Page 13

LE CARNET DU "MONDE"

Naissances

— M. et Mme Jean-Claude Mourei ont la joie d'annoncer la naissance d'Emmanuelle.
Paris, le 13 août 1966.
14, rue du Jura (13e).

Nécrologie

LOUIS RENOU

Mme Louis Renou,
Mlle Krishna Renou,
MM. Thierry et Laurent Renou,
ont la douleur de faire part du décès de
Louis RENOU,
membre de l'Institut,
professeur à la Sorbonne,
directeur
de l'Institut de civilisation indienne
de l'Université de Paris,
survenu le 18 août 1966 à 27-Vernon.
L'inhumation religieuse a eu lieu le samedi 20 août à 92-Bray.
4, rue de Musset, Paris-16e.

[Maître incontesté et de rayonnement international en matière de langue et de littérature sanscrites, Louis Renou était né à Paris le 28 octobre 1896. Agrégé de grammaire, docteur ès lettres, il enseigna à la faculté des lettres de Lyon (1925-1928), avant de venir à Paris, où, à partir de 1929, il fut directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur à la Sorbonne — où il était directeur de l'Institut de civilisation indienne.

L'exégèse védique a occupé une partie de son activité. Non seulement Louis Renou a résumé et analysé les œuvres de ses prédécesseurs, mais il a donné lui-même un volumineux index védique. En 1938, il a commencé la publication d'une traduction complète — la première qui soit faite directement sur les textes sanscrits — des hymnes des rites védiques, traduction à laquelle il travaillait encore au moment de sa mort.

On lui doit encore, parmi de très nombreux ouvrages et travaux disséminés dans des publications savantes, une grammaire sanscrite (védique et classique) et un dictionnaire sanscrit-français, pour lesquels il n'a eu, en France, aucun précurseur ; « Poésies religieuses de l'Inde », « les Écoles védiques », « Civilisation de l'Inde ancienne », etc.

Il avait entrepris, avec M. Jean Filliozat, le « Manuel des études indiennes (Inde classique) ».

Louis Renou avait été élu en mai 1946 membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (dont il fut président en 1958) et, le 12 avril 1955, membre de l'Académie du Japon.

Ses amis, élèves, disciples et admirateurs étaient en train de préparer, pour célébrer son soixante-dixième anniversaire, un important recueil d'études indianistes, auquel devaient collaborer des savants du monde entier. Ce recueil deviendra un hommage posthume, au cours de l'automne prochain.

Louis Renou était chevalier de la Légion d'honneur.]

— On nous prie d'annoncer la mort de [illegible]

Archéologie

Remerciements

— M. et Mme Georges Barre,
Mlle Josée Barre,
M. et Mme André Chavarot,
Mlle Marie-Hélène Barre,
Mme Georges-Samuel Barre,
Et toute la famille,
très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées dans leur douloureuse épreuve, expriment leurs sincères remerciements.

Anniversaires

— Pour le premier anniversaire de la mort de
M. Octave-Germain de MONTAUZAN,
un souvenir et une prière sont demandés à ceux qui l'ont connu, en union avec des messes qui seront célébrées à son intention.

VISITES ET CONFÉRENCES

MARDI 23 AOUT
Visites guidées et Promenades-Conférences

Monuments historiques, 14 h. 30, rue Berbier-du-Mets, 1, Mme Labrie : « Exposition tapisseries du dix-septième siècle à nos jours ». — 15 heures, Saint-Denis, rue Ambroise-Croizat, 112, Mme Bonnefous [illegible]

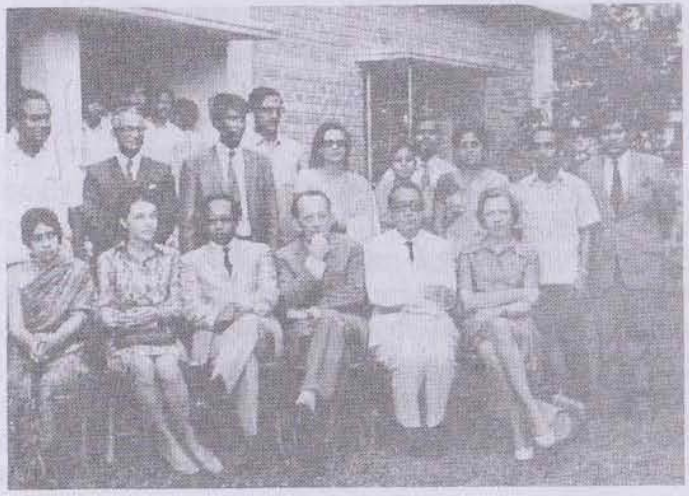

চট্টগ্রাম আলিয়াঁস ফ্রঁসেজ এর নির্বাহী সদস্য বৃন্দসহ ফরাশি মনীষী অঁদ্রে মালরো: চেয়ারে: আনী (রশীদ) চৌধুরী (ফরাশি ভাষা শিক্ষক), রাষ্ট্রদূত পত্নী, ড. কোরেশী (সভাপতি ও দোভাষী), মালরো, রাষ্ট্রদূত, সদি দ্য ভিলমোরাঁ (মালরোর শেষ সঙ্গীনী)। দাঁড়ানো: শামসুল আলম (চ.বি গ্রন্থাগারিক), ফিরোজ কবির (কোষাধ্যক্ষ), শিল্পী রশীদ চৌধুরী, জুনেদ চৌধুরী (সেক্রেটারী), ফরাশি শিক্ষক, একজন সদস্য ও তাঁর স্ত্রী, মিসেস জুনেদ চৌধুরী, অমল নাগ ও রসুল নিজাম (ফ্রান্সের অনারারি কন্সাল)।

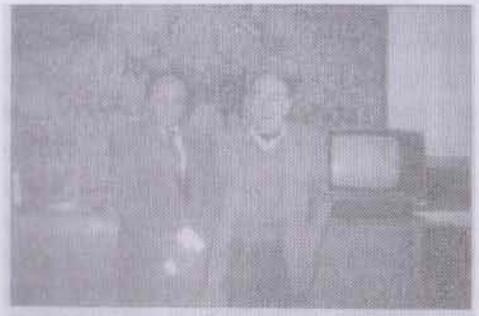

লুই দ্যুমোঁ : বাংলাদেশের বন্ধু

লুই দ্যুমোঁ (Louis Dumont) নামটি ছোট। কিন্তু মানুষটি বড়। প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী তথা নৃতত্ত্ববিদ দ্যুমো সর্বন, অক্সফোর্ড ছাড়াও উত্তর আমেরিকায় অধ্যাপনা করেছেন বহু বছর। তাঁর বিখ্যাত বই, *Homo Hierarchicus, Homo Aequalis, Essays on Individualism- an Anthropological perspective on modern ideology,* প্রভৃতি নিয়ে উন্নত বিশ্বে বহু সেমিনার বা গবেষণা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অশীতিপর এই মনীষী প্যারিসে তাঁর এপার্টমেন্টে একা জীবন যাপন করেন। ষাটের দশকে বেশ কিছু সময় (১৯৬৩) তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করি বন্ধু ফ্রঁসোয়া গ্রো-র সৌজন্যে। গ্রো পরে বড় মাপের ভারততত্ত্ববিদরূপে প্রখ্যাত হন, কলেজ দ্য ফ্রঁসের প্রফেসর হন।

১৯৬৯/৭০ সালে লুই দ্যুমোঁ একবার খুব সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন। শিল্পী রশীদ চৌধুরী তখন তাঁর দেখাশোনা করেন। রশীদের শ্বশুর বাড়ি তথা শ্বশুরের গ্রামের বাড়ি আর দ্যুমোঁর গ্রামের বাড়ি পাশাপাশি। প্যারিসীয় বুর্জোয়াদের (স্বচ্ছল মধ্যবিত্তদের) এটা যেন থাকতেই হয়, এই 'মেজোঁ দ কঁপাইন'। ১৯৭৩ সালের গ্রীষ্মে গিয়েছিলাম সেখানে, রশীদ চৌধুরীর শ্বশুরের আমন্ত্রণে। কিন্তু দ্যুমোঁ ছিলেন না। তিনি তখন বিদেশে। অবশেষে ১১-৭-৯২ তারিখে ফরাশি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো তাঁর প্যারিসীয় এপার্টমেন্ট ১১ রু লা গ্রঁজ, কার্তিয়ে লাত্যাঁয় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়। বহু বছর আগে বহুবার গিয়েছি সেখানে। তখন মাদাম জেনি দ্যুমোঁ চা আর তাঁর নিজের তৈরি ফরাশি পিঠা খেতে দিয়েছেন। এখন তিনি নেই, দ্যুমোঁ বড় নিঃসঙ্গ। আমাকে প্রথমে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। পরে ধীরে ধীরে মনে পড়লো বুঝি...। শুরু হলো পুরানো দিনের কথা। বহুকাল পর দেখা।

এক পর্যায়ে একাত্তর সালে বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর পত্র-প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাই। ১৬ আগস্ট তাঁর লেখাটি বিখ্যাত 'ল্য মোঁদ' পত্রিকায় ছাপা হয়। একই

সাথে আরো ছিলো: ওয়াশিংটনে চৌদ্দজন বাঙালি পাকিস্তানি দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের জবর খবর। ১৮ আগস্ট এটি আমার হস্তগত হয় বৈরুতে। প্রবাসী সরকারের বিশেষ রাষ্ট্রদূত মোল্লা জালাল আর আমার তখন মাথার চুল-ছেঁড়ার অবস্থা। কেননা বৈরুতের দায়িত্বে গিয়ে আমরা দেখছি সেখানকার রাষ্ট্রদূত ও বড় কর্মকর্তা দুই বাঙালি, এ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত বাঙালিরা কেউ 'ডিফেক্ট' করতে আগ্রহ প্রদর্শন করছেন না। অবশ্য আমরা মাত্র ক'দিন আগে এসেছি লেবাননে। অন্যদিকে খুব সুবিধার ছিলো না আমাদের অবস্থান। প্যারিসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জিল ফিলিবের এবং আরো দু'চার জনকে নিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করছেন। দিল্লী থেকে 'ল মোঁদ' প্রতিনিধি জেরার ভিরাতেল বড় বড় ডেসপাচ পাঠাচ্ছেন। বৈরুত যাবার আগে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষে বেশ কিছু নিবন্ধ লিখিয়েছি। কিন্তু স্বাধীনভাবে লুই দ্যুমোঁর মতো বড় ব্যক্তিত্ব আর কেউ আমাদের পক্ষে কলম হাতে নেননি তখনো। তার আরো কিছু পরে একজন তা নিয়েছিলেন' তিনি স্বয়ং অঁদ্রে মালরো। এবং তিনি শুধু কলম নয়, অস্ত্র হাতে নিতে চেয়েছিলেন। এবং তাতে তোলপাড় ঘটে সমগ্র বিশ্বে।

যাহোক, ১৯৯২ সালের শীত শুরুর এই চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে দ্যুমোঁ আমাকে চমকে দিলেন। শুধু বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি ক্ষান্ত হননি সে সময়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জঁ-পোল সার্ত্র, রজে কাইওয়া এবং ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদেরও তিনি দলে টানবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতোকাল পরেও যেন ক্ষোভ যায়নি তাঁর:

"দুঃখের কথা কী বলব, এক-একজন এক-এক অজুহাত দেখালেন। যেখানে মানবতার প্রশ্ন, সেখানে কিসের এসব ফালতু অজুহাত। সার্ত্র চীনের অবস্থান নিয়ে চিন্তিত, কাইওয়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোতে কর্মরত তাই কোনো বিবৃতিদান নাকি তাঁদের নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আমার দুঃখ লেভি স্ত্রাউস এবং আরও কিছু সহকর্মী যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা মুক্ত হাওয়ার মানুষ তাঁরাই বা কেন বাংলাদেশের পক্ষে কলম ধরলেন না?"

দ্যুমোঁর কলম বড় শক্ত। ছাত্রদের তিনি প্রথমেই বলতেন: 'আমি বাবা খুব কট্টর লোক, হাবিজাবি পছন্দ করি না, চিন্তার জগতে কোনো ফাঁকিঝুঁকি কাজ দেয় না কখনো।' তাঁর বইগুলিতে যেমন একটা গোছানো পারফেকশনিস্ট ভাব দেখা যায় তেমনি তাঁর এই পত্র-প্রবন্ধেও তাই লক্ষ্যগোচর হবে। দুই কলামের শতাধিক পঙক্তিতে সহস্রাধিক শব্দে তিনি বাংলাদেশের সমস্যা সবদিক থেকে বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন ফরাশিদের। প্রবন্ধের নাম "QUE VIVE LE BANGLADESH !" ক ভিভ্ ল... বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বা যেন বেঁচে থাকে বাংলাদেশ । কিছু অংশের অনুবাদ তুলে ধরছি:

"পূর্ব বাংলার আত্মোৎসর্গের বিপরীতে ফরাশিরা প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলের সঙ্গে কিছু পরিচিত যে-কেউ মূল প্রতিবাদের বিষয়ে অবশ্যই দ্বিধাহীন সাক্ষ্যদান করবে।

LE MONDE — 6 août 1971 . . .

LA SITUATION EN

Pakistan

Quatorze membres de l'ambassade à Washington se rallient au Bangla-Desh

Libres opinions

QUE VIVE LE BANGLA-DESH !

Par LOUIS DUMONT *

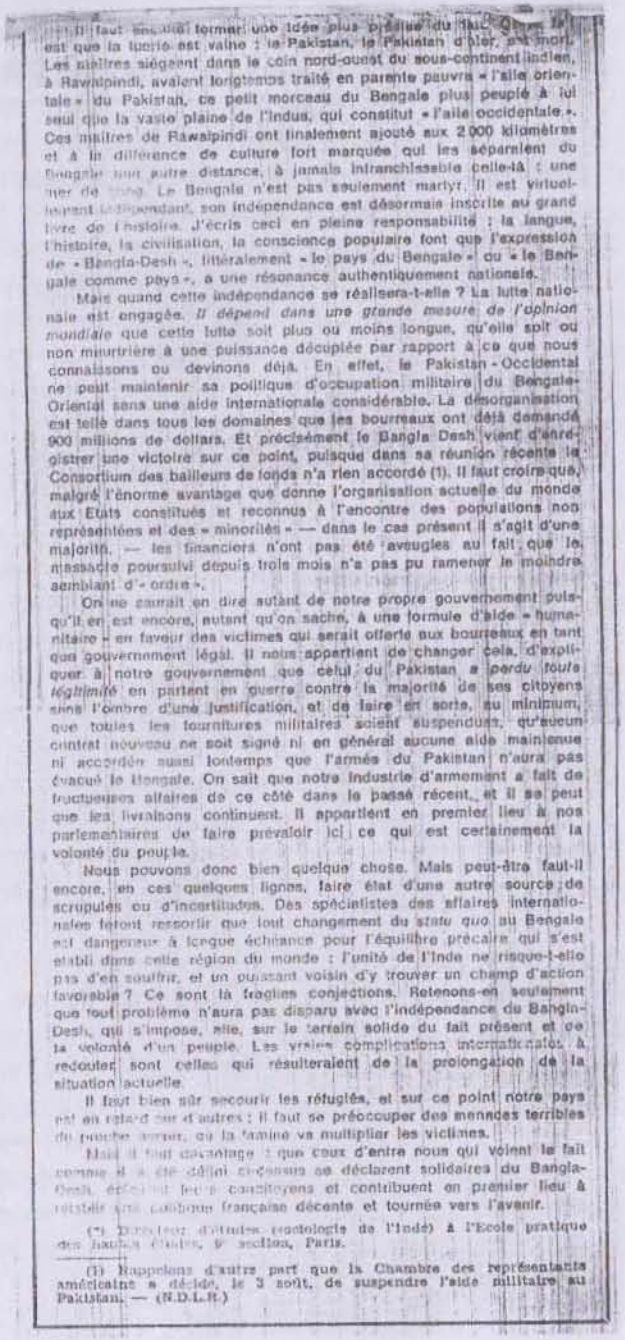

Il faut encore se former une idée plus précise du fait. Quel est-il? C'est que la lutte est vaine : le Pakistan, le Pakistan d'hier, est mort. Les maîtres siégeant dans le coin nord-ouest du sous-continent indien, à Rawalpindi, avaient longtemps traité en parente pauvre « l'aile orientale » du Pakistan, ce petit morceau du Bengale plus peuplé à lui seul que la vaste plaine de l'Indus, qui constitue « l'aile occidentale ». Ces maîtres de Rawalpindi ont finalement ajouté aux 2 000 kilomètres et à la différence de culture fort marquée qui les séparaient du Bengale une autre distance, à jamais infranchissable celle-là : une mer de sang. Le Bengale n'est pas seulement martyr, il est virtuellement indépendant, son indépendance est désormais inscrite au grand livre de l'histoire. J'écris ceci en pleine responsabilité : la langue, l'histoire, la civilisation, la conscience populaire font que l'expression de « Bangla-Desh », littéralement « le pays du Bengale » ou « le Bengale comme pays », a une résonance authentiquement nationale.

Mais quand cette indépendance se réalisera-t-elle ? La lutte nationale est engagée. *Il dépend dans une grande mesure de l'opinion mondiale* que cette lutte soit plus ou moins longue, qu'elle soit ou non meurtrière à une puissance décuplée par rapport à ce que nous connaissons ou devinons déjà. En effet, le Pakistan-Occidental ne peut maintenir sa politique d'occupation militaire du Bengale-Oriental sans une aide internationale considérable. La désorganisation est telle dans tous les domaines que les bourreaux ont déjà demandé 900 millions de dollars. Et précisément le Bangla Desh vient d'enregistrer une victoire sur ce point, puisque dans sa réunion récente le Consortium des bailleurs de fonds n'a rien accordé (1). Il faut croire que, malgré l'énorme avantage que donne l'organisation actuelle du monde aux États constitués et reconnus à l'encontre des populations non représentées et des « minorités » — dans le cas présent il s'agit d'une majorité — les financiers n'ont pas été aveugles au fait que le massacre poursuivi depuis trois mois n'a pas pu ramener le moindre semblant d'« ordre ».

On ne saurait en dire autant de notre propre gouvernement puisqu'il en est encore, autant qu'on sache, à une formule d'aide « humanitaire » en faveur des victimes qui serait offerte aux bourreaux en tant que gouvernement légal. Il nous appartient de changer cela, d'expliquer à notre gouvernement que celui du Pakistan *a perdu toute légitimité* en partant en guerre contre la majorité de ses citoyens sans l'ombre d'une justification, et de faire en sorte, au minimum, que toutes les fournitures militaires soient suspendues, qu'aucun contrat nouveau ne soit signé ni en général aucune aide maintenue ni accordée aussi lontemps que l'armée du Pakistan n'aura pas évacué le Bengale. On sait que notre industrie d'armement a fait de fructueuses affaires de ce côté dans le passé récent, et il se peut que les livraisons continuent. Il appartient en premier lieu à nos parlementaires de faire prévaloir ici ce qui est certainement la volonté du peuple.

Nous pouvons donc bien quelque chose. Mais peut-être faut-il encore, en ces quelques lignes, faire état d'une autre source de scrupules ou d'incertitudes. Des spécialistes des affaires internationales feront ressortir que tout changement du *statu quo* au Bengale est dangereux à longue échéance pour l'équilibre précaire qui s'est établi dans cette région du monde : l'unité de l'Inde ne risque-t-elle pas d'en souffrir, et un puissant voisin d'y trouver un champ d'action favorable ? Ce sont là fragiles conjectures. Retenons-en seulement que tout problème n'aura pas disparu avec l'indépendance du Bangla-Desh, qui s'impose, elle, sur le terrain solide du fait présent et de la volonté d'un peuple. Les vraies complications internationales à redouter sont celles qui résulteraient de la prolongation de la situation actuelle.

Il faut bien sûr secourir les réfugiés, et sur ce point notre pays est en retard sur d'autres ; il faut se préoccuper des menaces terribles du proche avenir, où la famine va multiplier les victimes.

Mais il faut davantage : que ceux d'entre nous qui voient le fait comme il a été défini ci-dessus se déclarent solidaires du Bangla-Desh, éclairent leurs concitoyens et contribuent en premier lieu à rétablir une conduite française décente et tournée vers l'avenir.

(*) Directeur d'études (sociologie de l'Inde) à l'École pratique des hautes études, 6e section, Paris.

(1) Rappelons d'autre part que la Chambre des représentants américaine a décidé, le 3 août, de suspendre l'aide militaire au Pakistan. — (N.D.L.R.)

"বিগত ২৫ শে মার্চ থেকে যেসব ঘটনাবলী বাংলাকে রক্তাক্ত করেছে ফরাশি জনমত তাকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেনি। ফরাশিরা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সাড়ে সাত কোটি মানুষের দুঃখে একাত্ম। একই জাতীয়তার অংশীভূত বলে যে প্রতারণাকারী সৈন্যদল, যারা নিজেদের চিরতরে বিদেশি বানিয়ে ফেলেছে তাদেরই আক্রমণে সৃষ্টি হয়েছে এই দুঃখ-দুর্দশা। এই যে একটি দলিল: সেনাবাহিনীর প্রথমাদিকে একটি লক্ষ্যবস্তু ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৬ শে মার্চ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনানায়কের সঙ্গে অন্য কর্মকর্তার ওয়ারলেস কথাবার্তা বাণীবদ্ধ হয়েছে (কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে) : মোট কতো হবে মৃত্যের সংখ্যা? কমপক্ষে তিনশো উত্তম ("ওয়েল ডান") এই চমৎকার কাজের জন্য আমার অভিনন্দন রইলো ("ওয়ান্ডারফুল জব")। এভাবে একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নিজেদের পরিচয় জাহির করলেন গেস্টাপো এবং এসএস এর মতো। এতে আলোকপাত করা যাচ্ছে পরবর্তী নৃশংস কার্যকলাপ কীভাবে সাধিত হয়েছে।..."

দ্যমোঁর অনুরাগী বিশ্বের বহু সমাজবিজ্ঞানী হয়তো জানেন না যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি পাঁচ বছর কাটিয়েছেন জর্মন বন্দীশিবিরে। এখানে তিনি তাই স্মরণ করছিলেন? শোনা যাক তাঁর বক্তব্য:

"এসবের মুখোমুখি ফ্রান্সে আজ অনেকেই বলছেন- কী ভয়ংকর। অর্থাৎ ওর ভেতরের কথা হলো- এ ব্যাপারে আমরা আর কী করতে পারি? এটা মিথ্যা। আমরা অবশ্যই কিছু করতে পারি। বুঝিয়ে বলছি। প্রথমেই পাশবিক শক্তির সামনে নতজানু হবার মনোভাব পরিহার করতে হবে আমাদের। বাঙালিদের তথাকথিত নিষ্ক্রিয়তার অজুহাতে চুপচাপ থাকা চলবে না আমাদের। একথা সত্য যে ২৫ শে মার্চ অবধি তাদের সংগ্রাম ছিলো অহিংস অসহযোগ... কিন্তু এরপর বাঙালিরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে। প্রথমত তাদের সৈন্যরা, পরে যোগ দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এবং তিনমাস যাবৎ ওরা এক অনমনীয় গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে বিপক্ষীয় বাহিনীতে হতাহত হয়েছে দশ হাজার সৈন্য যা কিনা ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ের চাইতে বড় সংখ্যা।

অতঃপর একটি নিশ্চিত ধারণা কবুল করে নিতে হবে এবং সেটি হলো- এই হত্যাকাণ্ড নিরর্থক- পাকিস্তান, গতকালকের পাকিস্তান এখন মৃত। ... বাংলা শুধু শহীদ ভূমি নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে একটি স্বাধীন দেশ। তার স্বাধীনতা এখনই ইতিহাসের বড় বইতে লেখা হয়ে গিয়েছে। পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই আমি লিখছি একথা- ভাষা, ইতিবৃত্ত, সভ্যতা, জনমানস তাকে সত্যই "বাংলাদেশ" (যা আক্ষরিকভাবে "বাংলার দেশ" কিংবা "বাংলার মতো দেশ" কথাটিকে) খাঁটি জাতীয় প্রত্যয়ে পরিণত করেছে কিন্তু কখন বাস্তবায়িত হবে এই স্বাধীনতা? জাতীয় সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধ কত দীর্ঘ হবে, কত মারাত্মক হবে এটা একটু বড়সড় রকমে কার্যকরভাবে নির্ভর করছে বিশ্ব- জনমতের ওপর। পশ্চিম পাকিস্তান ব্যাপক আন্তর্জাতিক সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ববঙ্গে তার দখলদার নীতি চালু রাখতে পারে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এতো বিস্তৃত যে, জল্লাদেরা ইতোমধ্যে নয়শো মিলিয়ন ডলার সাহায্য চেয়েছে। এখানেই বাংলাদেশ একটি যথার্থ বিজয় লাভ করেছে।

কেননা সাহায্যদাতা কনসোটিয়ম তাদের সাম্প্রতিক বৈঠকে কিছুই দেয়নি। (এখানে সম্পাদকীয় একটি পাদটীকা সংযোজিত হয়েছে এই মর্মে যে, মার্কিন হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও ৩রা আগস্ট সমস্ত সামরিক সাহায্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে)...

আমাদের নিজেদের সরকার সম্পর্কে...বড় গলা নিয়ে বেশি বলবার উপায় নেই। কারণ যতদূর জানা যায় তাঁরা এখনো ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে মানবিক সাহায্য তা আইন সঙ্গত সরকাররূপে জল্লাদদের হাতে দেবার কথা বলছেন। এটা পরিবর্তন করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে পাকিস্তানের সরকার তার নাগরিকদের মধ্যে সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে সমস্ত বৈধতা হারিয়েছে... তাছাড়া প্রথমত সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের কাজটি বন্ধ করতে হবে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলা থেকে বের হয়ে না-আসা পর্যন্ত নতুন কোনো চুক্তি করা যাবে না। এটা সর্বজ্ঞাত যে, নিকট-অতীতে আমাদের অস্ত্রশিল্প এই দিকে ভালো ব্যবসা হাতিয়ে নিয়েছিল এবং এখনো হয়তো তার সরবরাহ চলছে। জনগণের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা প্রধানত আমাদের সংসদ-সদস্যদেরই দায়িত্ব।

আমরা তাহলে কিছু একটা করতে পারি...বিষয়টি প্রলম্বিত হলে সমস্যা আরো বাড়তে পারে। শরণার্থীদের জন্য অবশ্যই সাহায্য বাড়াতে হবে, এইদিকে আমরা অন্যদের পেছনে পড়ে আছি। নিকট ভবিষ্যতে একটি দুর্ভিক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই, এখনই এদিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু আরো একটু এগিয়ে আসতে হবে আমাদের। যাঁরা উপযুক্ত ব্যাখ্যায় বিষয়টি দেখছেন তাঁরা যেন বাংলাদেশের পক্ষে তাঁদের নাগরিক- ভাইদের বুঝিয়ে বলেন এবং এভাবে সবার আগে একটি চমৎকার ভবিষ্যৎমুখী ফরাশি পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে অবদান রাখেন।"

লুই দ্যুমোঁর এই লেখা ফরাশি বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর পক্ষে-বিপক্ষে কিছু বিতর্ক হল। তবে দ্যুমোঁ তাঁর বক্তব্য ও নীতিতে ছিলেন অটল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সুদীর্ঘ বিশ বছরে কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন বলে মনে হয় না। ৭৩ ও ৭৭-এ আমি প্যারিসে গিয়েই খোঁজ করেছি। কিন্তু তিনি তখন দেশের বাইরে। এখন তিনি এতো বৃদ্ধ এবং জীবনের একমাত্র সঙ্গী স্ত্রী বিয়োগে এতো কাতর যে বাংলাদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণও গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সম্পাদনায় আইবিএস (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে প্রকাশিত *ট্রাইবাল কালচারস ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থ পেয়ে খুশি হলেন তিনি, আমাকে উপহার দিলেন তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশনা 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী। বইটি ফরাশিতে লেখা। আমাদের বই ছাড়াও বাংলাদেশের আরেকটি মূল্যবান জিনিস তাঁর কাছে আছে। তাঁর গ্রামের বাড়িতে রয়েছে রশীদ চৌধুরীর শিল্পকর্ম যার জন্য তিনি গর্বিত।

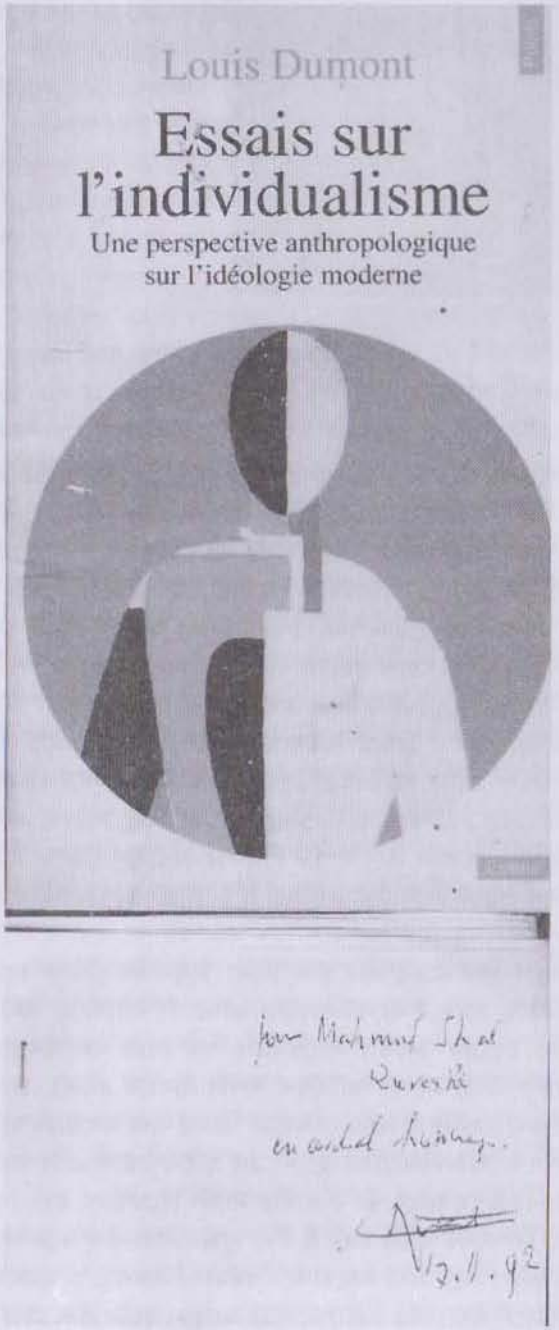

President Jacques Chirac of France is explaining to Professors Takemoto and Qureshi the idea of cultural democracy in Elysee Palace, Paris on November 23, 1996 just before the luncheon party for the Malraux Society

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি

ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে নতুন যুগের সূচনা হলো ১৭ মে, ১৯৯৫ তারিখে। দ্য গোলপন্থী জাক শিরাক প্রেসিডেন্টের আসনে সমাসীন হলেন। দীর্ঘকাল পর ডানপন্থীরা পূর্ণ মর্যাদায় ক্ষমতায় এলো। এর আগে ছিল বামপন্থী রাষ্ট্রপতি ফ্রঁসোয়া মিতর্রঁর অধীনস্থ ডানপন্থী মন্ত্রীসভা। ক্ষমতার কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা চলেছিলো। কিন্তু এবার এলো নিরঙ্কুশ আধিপত্য। শিরাক (৬২) অবশ্য ভোট পেয়েছেন ৫২.৬ শতাংশ। মিতঁর-শাসিত চৌদ্দ বছরের বাম-প্রভাবিত প্রশাসন ও বিশাল বামপন্থী জনগোষ্ঠী নিয়ে গণতন্ত্রের ফলভোগে অভ্যস্ত হতে হবে দ্য গোলপন্থী ও তাঁদের অন্যান্য সহযোগীদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিজয়ী বীর জেনারেল শার্ল দ্য গোল অল্প দিন ফ্রান্সের শাসনভার নিয়ে পরে রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যান। ১৯৪৬ সালের ১৩ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হলো চতুর্থ প্রজাতন্ত্র। ১১ বছর ৭ মাস ১৮ দিন পর ১লা জুন ১৯৫৮ সালে অপারগ জাতীয় সংসদ প্রস্তাব নিলো দ্য গোলের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের। এভাবে ১৯৫৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হলো ৫ম প্রজাতন্ত্র যা এখনো বহাল রয়েছে। বহুকাল ফরাশি প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতি ছিলো টালমাটাল। বলা হতো- কোনো সরকার ক্ষমতায় আছে সকালের খবরের কাগজ না দেখে তা বলা যাবে না। জেনারেল দ্য গোলের ক্ষমতায় আরোহনের পর থেকে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। আমরা ইচ্ছা করেই 'আরোহন' শব্দটা ব্যবহার করেছি, কেননা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে সাধারণ মানুষের প্রায় দ্বিগুণ জেনারেল ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ কোনো সমরনায়কের হঠাৎ সেনা ছাউনী থেকে এসে ক্ষমতা দখলের ব্যাপার নয়। কিন্তু যে আস্থা তাঁকে জাতীয় সংসদ দিয়েছিলো এবং যে মন্ত্রীসভায় তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাতে বিরোধী দল, বুদ্ধিজীবীরা ব্যঙ্গ করে তাঁর সিংহাসন আরোহনের তুলনা দিতে দ্বিধা করতো না। বর্তমান নিবন্ধকার ভাগ্যক্রমে ৫৯ থেকে ৬৮ সাল প্যারিসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সূত্রে অবস্থান করেন এবং অন্য বিদেশিদের

সঙ্গে একমত হয়ে দ্য গোলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তখন এটা স্পষ্ট বোঝা যেত যে, ফরাশি ছাত্র-বুদ্ধিজীবীরা বেশিরভাগই বামপন্থী এবং সরকার-বিরোধী, কিন্তু সাধারণ মানুস সরকার সমর্থক। বিদেশি বসবাসকারীরা উপনিবেশবাদ পরিহার, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি (মার্কিন মতামত উপেক্ষা, চীনকে স্বীকৃতিদান), সার্বিক উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে দ্য গোল সরকারের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন এবং সে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে ছিলেন মুক্তকণ্ঠ। অন্যপক্ষে ফরাশিরা পারতপক্ষে বিদেশিদের সঙ্গে, এমনকি খুব ঘনিষ্ঠ না হলে নিজেদের মধ্যেও রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা পরিহার করতো। জিজ্ঞাসিত হলে একজন সাধারণ ফরাশি বা ফরাশিনী বলতো- 'সান্‌সদিপা' (বলা যাবে না) অর্থাৎ এ বিষয়ে আলোচনায় আমার অনীহা আছে। একবার এক মফস্বল শহরে মধ্যাহ্নভোজে একটু অতিরিক্ত রঙিন সুরা পানের পর একজন পৌর প্রশাসক একটু গর্বভরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং একজন কম্যুনিস্ট এবং ফ্রান্সে প্রতি তিনজনের একজন তাঁর দলভুক্ত। এটা ১৯৬১ সালের জুলাই মাসের কথা। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনীতির অঙ্গনে এই উক্তির প্রতিফলন দেখতে পাইনি। ফ্রঁসোয়া মিতরঁ তখন নির্বাচনে এত হারতেন যে তাঁকে আমরা 'হারু পার্টি' রূপে বিবেচিত করতাম এবং তিনি যে কখনো ক্ষমতায় আসতে পারবেন এটা মনে হতো না। কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অনুকূল পরিস্থিতির কারণে মিতরঁ আশির দশকে সত্যি ক্ষমতায় এলেন এবং সবচে দীর্ঘকাল লেলিজে'তে (রাষ্ট্রপতি ভবনে) অবস্থান করেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট শিরাকই আবার তাঁর কাছে দু'বার হারেন। তিনিও চৌদ্দ বছর ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা দেন। অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার সূত্র নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো ইতিপূর্বে মে, ১৯৬৮ এর ঘটনাবলীতে। পুরো মাসব্যাপী ছাত্র ও শ্রমিকরা প্যারিসে, বিশেষ সূচনা করে ছাত্র-অধ্যুষিত 'লাটিন কোয়ার্টারে', শহরতলীর দু'একটি এলাকা এবং মফঃস্বলের কয়েকটি নগরীতে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আমি তখন থাকতাম 'সর্বন' (বিশ্ববিদ্যালয়) এর সামনের বাড়িটিতে। এক ফরাশি রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছিলেন, আপনি দেখছি প্রথম সারির সোফায় বসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। 'অবহেলিত' বিদেশি শিক্ষকরূপে আমরা দু'একটা মিটিং-সিটিং করে বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাচ্ছিলাম সে সময়ে। কিন্তু দেখা গেল, এক মাস পুলিশকে দর্শকের ভূমিকায় রেখে, সবদিক সাঁটঘাট বেঁধে এমনভাবে দ্য গোল বিদ্রোহ দমন করলেন যে, মনেই হবে না একমাস আগে ফরাশি দেশে এমন এক লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিলো। তবে একটা ব্যাপারে সব ফরাশির মনেই, প্রশ্ন ছিল ঠিক এ সময়টিতে এ নামে একটি বইও লিখেছিলেন ল মোঁদ পত্রিকার প্রখ্যাত বিশ্লেষক পিয়ের ভিয়াসোঁ-পোঁতে। দীর্ঘ প্যারিস-প্রবাস কাটিয়ে ৬৮-র আগস্টে দেশে ফেরার প্রাক্কালে প্রদত্ত এক ইংরেজ বন্ধুর বিদায় উপহার বইটি এখনো হাতের কাছে আছে, 'দ্য গোলের পর কে'? এই চিন্তা ফরাশিদের মনে জন্মাল দু'টি কারণে; একটি হচ্ছে ভালো হোক, মন্দ হোক- এই মহাপুরুষ দশটি বছর তো পার করিয়ে দিলেন,

ফরাশিরা একজনকে এত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় দেখতে আদৌ অভ্যস্ত ছিলো না। দ্য গোল প্রবর্তিত সাত বছর মেয়াদী রাষ্ট্রপতির শাসনেরও তারা কড়া সমালোচক ছিলো সে সময়ে। দ্বিতীয় কারণ হলো- দ্য গোলের বয়সও তখন সাতাত্তর। যা হোক, বছর খানেক পর একটা অজুহাত খুঁজে পেয়ে তিনি নিজেই পদত্যাগ করলেন। ঐ বইতে যাকে উত্তরাধিকারী রূপে গড়ে তোলা হচ্ছিলো বলে উল্লেখিত রয়েছে সেই জর্জ পৌপিদু রাষ্ট্রপতি হলেন। উল্লেখ্য যে, পৌপিদু ছিলেন প্রথম জীবনে সাহিত্যের অধ্যাপক এবং তাঁর দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হচ্ছে: 'অঁদ্রে মালরোর নির্বাচিত রচনা' (১৯৫৫) এবং 'ফরাশি কবিতা সংকলন' (অঁদ্রে মাল্‌রোর ভূমিকা সম্বলিত' ১৯৬১); পরে দ্য গোলের সহকর্মী, রথসিল্ড ব্যাংক পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রধান বা উপ-প্রধান।

বর্তমানে চালু রয়েছে যে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র, তার শাসনতন্ত্রকে দ্য গোল এবং পৌপিদু উপযুক্ত স্থায়িত্ব দিয়ে যান। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ভালেরি জিস্কার দেস্ত্যাঁ (১৯২৬) ছিলেন অর্থব্যবস্থা- বিশারদ। তাঁর বাবাও তাই ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন এরকম আরো অনেকের মধ্যে দু'জনের কথা মনে পড়ছে, বিশেষ করে, তাঁদের সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি, এ কারণে। তাঁদের একজন এখন মৃত, তিনি এদ্‌গার ফোর, আইনের অধ্যাপক, কৃষিমন্ত্রী এবং অসাধারণ বক্তা, ১৯৭৭ সনে স্ত্রাস্‌বুর্গে এক সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম এবং পরিচিত হয়েছিলাম।

অন্যজন, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, প্রসিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় সংসদের সভাপতি, বর্দোর মেয়র, জাক্ শার্ব-দেল্‌মাস্ (১৯১৫)।

১৯৮২ সালের নির্বাচনে ফ্রঁসোয়া মিতরঁ (২৬-১০-১৯১৬) জয়যুক্ত হয়ে রবার্ট ক্রুসের অধ্যবসায়ের উপাখ্যানকে আরেক বার সত্য প্রমাণিত করলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কয়লাখনির কর্মী এবং পরে ভিনিগার প্রস্তুতকারী। পড়াশুনা: আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উচ্চতর ডিগ্রি ছিলো তাঁর। প্রথমদিকে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেন এবং তাঁরও কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে, এর একটি চীনের ওপর (১৯৬১)। মিতরঁ হচ্ছেন যাকে বলে 'রাজনীতির পোকা' - লেগেই আছেন। ১৯৪৭-৫৭ সালের মধ্যে চতুর্থ প্রজাতন্ত্রে তিনি ছয় বছরের বেশি সময় ধরে এগারোটি সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে, পরবর্তীকালে যখন একবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিতলেন, তখন শক্ত করে হাল ধরতে শিখিয়েছে। বিগত চৌদ্দ বছর তিনি রাষ্ট্রপতি। এবং এর জন্যে ফ্রান্সে ও বহির্বিশ্বে নানা ভাঙা-গড়ার মধ্যে, তাঁর নিজের ক্যান্সারজনিত আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও অসম সাহস ও উদ্দীপনায় তাঁর দেশকে পরিচালনা করেছেন। প্যারিসে অত্যাধুনিক স্থাপত্য, যাদুঘর নির্মাণ বা সৌকর্যসাধন, নতুন জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন তাঁর অমরকীর্তি বলে অনেকে বিবেচনা করেন। তাঁর মানবিকতামুখী কর্মকাণ্ড প্রশংসা অর্জন করেছে বিশ্ববাসীর। বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমরা অবশ্যই

মিতরঁর কাছে ঋণী। তাঁর স্ত্রী দানিয়েলও বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অনাথ আশ্রম ও দারিদ্র বিমোচনী সংস্থার পৃষ্ঠপোষক।

ব্যাংক কর্মকর্তার পুত্র জাক শিরাক (জ্যোক, জাকুইস বা জ্যাঁ এবং চিরাক/ সিরাক নয়) আমেরিকার হার্ভার্ডে এবং প্যারিসের জাতীয় লোক প্রশাসন বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তিনি দ্য গোল প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত হন। শক্ত হাতে কর্মসম্পাদনের কৃতিত্বের জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন। বিগত তিন দশকের ওপর তিনি যে পদেই থাকুন না কেন (প্রশাসক, প্রধানমন্ত্রী বা প্যারিসের মেয়র) তাঁর কর্মতৎপরতা সর্বত্র প্রশংসিত। দীর্ঘকাল তিনি 'ওতেল মাতিইঁনোঁ তে বসবাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী রূপে। এবার কাঙ্ক্ষিত 'লেলিজে'তে (রাষ্ট্রপতি ভবন) তাঁর উত্তরণ ঘটলো। এখন প্রশ্ন হলো, প্রেসিডেন্ট শিরাক কী দেবেন ফরাশিদের বা বিশ্ববাসীকে? প্রত্যাশা অনেক, কিন্তু সমস্যাও ততোধিক। প্রথমত, তিনি উদার ফরাশি মানসিকতার আমদানিতে সমর্থ হবেন বলে আশা করা যায়। দ্য গোল, পৌপিদু, মাল্‌রো, জিস্কারের উত্তরাধিকার তাঁকে বইতেই হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিশ্রুত আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানোয়, কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণে, সর্বোপরি বেকার সমস্যা সমাধানে তাঁকে তৎপর হতে হবে। যেহেতু জাতীয় সংসদ থেকে আঞ্চলিক ও পৌর সংস্থাগুলো বেশির ভাগ তাঁর সমর্থনে রয়েছে, তাই তাঁর পক্ষে পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হবে বলে অনেকের ধারণা।

শিরাকের পক্ষে আরো বলার বিষয় এই যে, পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এখন দেখা যাক তিনি তাঁর এই সৌভাগ্যকে কীভাবে কাজে লাগান। ফরাশি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যে পূর্ব-ইউরোপের অমানুষ সার্বদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কেননা তাঁর দেশেরই বেশিসংখ্যক জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীর সদস্য আজ ওদের হাতে জিম্মি। এই সূত্রে বসনিয় সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান সম্ভাব্যতার মধ্যে এলে নিপীড়িত মানবতার কল্যাণ সাধিত হবে। ফরাশি প্রেসিডেন্টের যে প্রধান দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যথাবিহিত তত্ত্বাবধান তারও একটা অগ্নিপরীক্ষা এখন শিরাকের সামনে।